বিবেকানন্দ স্মৃতি

বিশ্বনাথ দে

সাহিত্যম্ | ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
১লা আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
সনাতন সাঁতরা
দি সারদা প্রিণ্টার্স
১৫, কানাই ধর লেন
কলিকাতা-৭০০০৭৩

উৎসর্গ

স্বামীজির গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

VIVEKANANDA SMRITI

Edited By : Biswanath Dey

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত

'স্মৃতি' পর্যায়ে আমাদের অন্যান্য বই

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি	১০'০০
মধুসূদন স্মৃতি	১০'০০
বিদ্যাসাগর স্মৃতি	১০'০০
নিবেদিতা স্মৃতি	১০'০০
শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি	১০'০০
শরৎ স্মৃতি	১০'০০
সুভাষ স্মৃতি	১০'০০
নজরুল স্মৃতি	১০'০০
রবীন্দ্র বিচিত্রা	১০'০০
মানিক বিচিত্রা	১০'০০
সুকান্ত বিচিত্রা	১০'০০
নজরুল-কথা	১০'০০

এই প্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ একজন অসাধারণ পুরুষ ও দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ছিলেন। এই জড়বাদের যুগেও দিব্যজ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। আমেরিকার মতো প্রচণ্ড বস্তুতান্ত্রিক দেশেও তিনি আধ্যাত্মিক প্লাবন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিদগ্ধমণ্ডলীর সামনে তিনি যে মহান সত্য প্রচার করেন, তা তাঁর গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে পেয়েছিলেন। সাধারণের সামনে এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা, কিন্তু সেদিন তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাণীই ছিলো প্রকৃত দিব্যশক্তিপূর্ণ, যা শোনা মাত্রেই সভার শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়-মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো।

স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে সেদিন ঘোষিত হয়েছিলো যে, হিন্দুধর্ম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং এই ধর্ম আমাদের শিক্ষা দান করেছে —আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান, পাপী ও অধার্মিক হয়ে কেউই আমরা জন্মগ্রহণ করিনি।—স্বামীজির এই বক্তব্য সেদিন দৈববাণীর মতো প্রতীয়মান হয়েছিলো এবং শ্রোতারা এক অভিনব দৃষ্টি লাভ করেছিলো।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দুধর্মের প্রথম প্রচারক, নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সুদূর আমেরিকায় পৌঁছে তিনি সত্যের বাণী প্রচার করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বশক্তিই কার্যকরী হয়েছে। হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক এবং পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হলেও স্বামীজি ধর্মের গোঁড়ামিকে কোনোদিন প্রশ্রয় দেননি, মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে দেবতার গলায় মালা পরাতে তিনি শেখেননি, মানুষের মধ্যেই তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

আমাদের জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা শুধুমাত্র একজন হিন্দুধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসীরূপে নয়, তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, ভারতের নবজাগরণের পুরোধা।

'বিবেকানন্দ স্মৃতি'র রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, তাঁর জীবন ও সাধনা, ধ্যান ও ধারণা প্রস্ফুটিত হতে দেখা যাবে। স্বামীজির নিকটসান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছেন, জেনেছেন, এমন ক'জনের রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হলো।

স্বামী বিবেকানন্দের ছিলো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এই গ্রন্থের রচনাগুলি পাঠ করে যদি কিশোর তরুণ বাঙালী পাঠকরা সেই মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর আদর্শ অনুধাবন করতে পারেন, তাহলে এই গ্রন্থের সম্পাদকের চেয়ে বেশী খুশী আর কেউ হবে না।

—বিশ্বনাথ দে

সূচীপত্র

স্মৃতিকথা :

জীবন ও সাধনা :

পশ্চিমের [গঙ্গার দিকে] দরজা দিয়ে নরেন প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকেছিল। দেখলুম নিজের শরীরের দিকে হুঁশ নেই, মাথার চুল উস্কখুস্ক আর সাদামাটা পোশাক। বাইরের কোন জিনিসের উপরই কোন আঁট নেই, যা সাধারণ লোকের থাকে। সবই যেন তার আলগা আলগা। আর তার চোখ দেখে মনে হল, তার মনের অনেকটা ভেতরের দিকে কে যেন সারাক্ষণ জোর করে টেনে রেখেছে। দেখে মনে হল, বিষয়ী লোকের বাস এই কলকাতায়, এতবড় সত্ত্ব গুণের আধার এল কেমন করে !

গান গাইবার কথা জিজ্ঞেস করে জানলুম বাংলা গান দু-চারটে মাত্র শিখেছে। তাই গাইতে বললুম। ও তখন মন চল নিজ নিকেতনে', এই গানটা ধরল। ষোল আনা মন প্রাণ ঢেলে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গাইতে লাগল। শুনে আর সামলাতে পারলুম না। ভাব লেগে গেল।

পরে সে যখন চলে গেল, তাকে দেখবার জন্যে প্রাণের ভেতর চব্বিশঘণ্টা এমন আঁকুপাঁকু করত যে বলবার নয়। সময় সময় এমন যন্ত্রণা হত যেন বুকের ভেতরটা কে গামছা নেংড়ানোর মত জোর করে নেংড়াচ্ছে। তখন আর সইতে পারতুম না। ছুটে বাগানের উত্তরদিকের ঝাউতলায়, যেখানে বড় একটা কেউ যায় না, সেখানে গিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতুম—'ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না।' খানিকটা এমনি কেঁদে তবে নিজেকে সামলাতে পারতুম। পুরো ছ'মাস ওইরকম চলেছিল। আর সব ছেলেরা যারা এখানে এসেছে তাদের কারো কারোর জন্যে মন

কেমন করেছে, কিন্তু নরেনের জন্যে যেমন হয়েছিল তার কাছে সে কিছুই নয়।

* * *

নরেনের মত একটি ছেলে আর দেখতে পেলুম না। যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাতভোর ধ্যান করে। ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। আমার নরেনের ভেতর এতটুকু মেকি নেই। বাজিয়ে দেখ টং টং করছে।······সে ব্রাহ্ম সমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়। কিন্তু আর সব ব্রাহ্মদের মতন নয়। সে সত্যিকারের ব্রহ্ম-জ্ঞানী, ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিঃদর্শন হয়। সাধে নরেনকে এত ভালবাসি।

* * *

দেখলাম কেশবের মধ্যে যেমন একটা শক্তির জোরে তার জগৎ-জোড়া নাম হয়েছে, নরেনের মধ্যে এরকম পুরোপুরি আঠারোটা শক্তি রয়েছে। আবার দেখলুম কেশব ও বিজয়ের ভেতরে দীপশিখার মত জ্ঞানের আলো জ্বলছে। পরে নরেনের দিকে চেয়ে দেখি তার ভেতরে, একেবারে জ্ঞানের সুর্য্যি উঠেছে, মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত সেখান থেকে চলে গেছে।

* * *

নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা, এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নেই।

এক একবার ব'সে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।

অন্যেরা কলসী, ঘটি এসব হ'তে পারে; নরেন্দ্র কিন্তু জালা।

ডোবা পুকুরের মধ্যে নরেন্দ্র হোল বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চোখ-ওলা বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ—পোনা, কাঠি, বাটা, এই সব।

খুব বড় আধার,—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ। নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা, পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে টেনে ছিনিয়ে নেয়।

* * *

তোকে এখন মা সবকিছুই দেখিয়ে দিয়েছেন। দামী গয়নাপত্র যেমন বাক্সয় চাবি দিয়ে রাখে, তুই যেটা পেলি সেটা এখন আমি বাক্সয় চাবি দিয়ে রাখলুম। চাবিটা কিন্তু আমার কাছেই রইল। তোকে এখন অনেক কাজ করতে হবে। যখন তোর কাজ শেষ হবে তখন এই গয়নার বাক্স আবার খোলা হবে। তখন, এখন যেমন জানলি তখন আবার সে জ্ঞান ফিরে আসবে।

* * *

নরেনের ইচ্ছামৃত্যু হবে। সে যেদিন বুঝবে সে কে, সেদিন আর এক মুহূর্ত এ দেহে থাকবে না। এমন সময় আসবে যে সে জগৎকে নাড়া দেবে। নাড়া দিয়ে টলিয়ে দেবে তার বুদ্ধি আর আধ্যাত্মিকতার শক্তিতে। মায়ের কাছে বলছি যেন অদ্বৈত-জ্ঞান নরেনের কাছে পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। ওকে এখন অনেক কাজ করতে হবে। কিন্তু এ-পর্দা এত পাৎলা যে, যে-কোন সময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে।

চাঁপাগাছে উঠে হুটোপুটি করছে কয়েকটি ছেলে। ফুটফুটে রং বাবরি চুল একটি ছেলের ; সে গাছের ডালে পা আঁকড়ে মাথা নীচু করে দোল খাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন পাড়ার এক বৃদ্ধ। পাছে ছেলেগুলি হাত-পা ভাঙে, তিনি তাদের গাছ থেকে নামাবার চেষ্টা করেন। ভয় দেখান, গাছে একটা ব্রহ্মদৈত্য আছে, ওকে বিরক্ত করলে ঘাড় মটকাবে। ভয়ে জড়সড় কয়েকটি ছেলে গাছ থেকে নেমে আসে। নিশ্চিন্তমনে বৃদ্ধ চলে যান। বাবরি চুলওয়ালা সর্দার ছেলেটি তখনও গাছে বসে। বৃদ্ধ যেতেই সে খিলখিল ক'রে হেসে বন্ধুদের বলে, 'দূর বোকারা, দৈত্য থাকলে এতদিন ঘাড় মট্‌কাত।' এই দুরন্ত দামাল ছেলেটি পাড়ার ছেলেদের সর্দার। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যুক্তিপ্রবণ মন, পদ্মের পাপড়ির মত চোখ ও হাসিখুশি মুখ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছেলেটি সিমলার বিখ্যাত দত্ত পরিবারের।

পিতা বিশ্বনাথ দত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি। উচ্চশিক্ষিত, উদারচেতা, আনন্দময় পুরুষ বিশ্বনাথ গরীব-দুঃখীর বন্ধু। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমঝদার, হাফেজের কবিতার রসগ্রাহী। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা, স্নেহশীলা ও উচ্চমনা। পুত্রহীনা ভুবনেশ্বরী দেবী কাশীর বীরেশ্বরের কাছে একটি পুত্রের মানত্ করেছিলেন। ভুবনেশ্বরী দেবী একদিন স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর আরাধনায় তুষ্ট মহাদেব পুত্ররূপে তাঁর কোলে আসছেন। স্বপ্ন সার্থক হল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি. বাংলা ১২৬৯ সালের পৌষসংক্রান্তি, দত্তবাড়ি মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে হুলুধ্বনি দিয়ে নবজাতককে অভিনন্দন জানায়। বীরেশ্বর শিবের নাম অনুযায়ী মাতা পুত্রের নাম রাখলেন

বীরেশ্বর। সবাই আদর করে ডাকে বিলে। পরে অন্নপ্রাশনের সময় তার নামকরণ হয় নরেন্দ্রনাথ—মানুষের সেরা। রূপেগুণে ভরপুর হয়ে বাড়তে থাকে দত্তবাড়ির আদরের ধন।

বালকের ধারালো বুদ্ধি। তায় আবার বেজায় দুরন্ত; তার সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়। ভয় দেখিয়ে বা শাসন করে তাকে সামলান যায় না। দামাল ছেলেটিকে সামলাতে বাড়ির মা-দিদিমা হিমসিম খেয়ে যায়। মা ক্ষোভ করে বলেন, 'মহাদেব নিজে না এসে তাঁর এক ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' হঠাৎ একদিন তিনি দুরন্ত ছেলেটিকে শান্ত করার একটি উপায় আবিষ্কার করেন। দুরন্তপনা খুব বেড়ে গেলে তিনি বিলের মাথায় 'শিব' 'শিব' বলে জল ঢেলে দিতেন, বালক শান্তমূর্তি ধারণ করত।

শিশু বিলে রামসীতার মূর্তি বা শিবঠাকুরের মূর্তি সামনে রেখে চোখ বুজে ধ্যান করতো। এর নাম ধ্যান-ধ্যান খেলা। খেলাটি বিলের খুব পিয়। বাড়ির চিলেকোঠায় প্রায়ই বসত এই খেলা। একদিন সঙ্গীদের নিয়ে এরকম ধ্যান-ধ্যান খেলা চলছে, একটি ছেলের নজরে পড়ল ঘরে একটা সাপ। তার চেঁচামেচিতে সঙ্গীরা ভয়ে পালায়, বিলে কিন্তু গভীর ধ্যানে মগ্ন, নিশ্চল হয়ে বসে। টের পায় না সাপের কথা।

বাড়ির টমটমগাড়ির কোচোয়ানের সঙ্গে বিলের খুব ভাব। বড় হলে সে কোচোয়ান হবে। একহাতে ঘোড়ার বলগা ধরে আরেক হাতে চাবুক ঘুরিয়ে সে বুক ফুলিয়ে ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালাবে, দশজনে অবাক হয়ে দেখবে।

মায়ের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান শুনতে ভালবাসে বিলে। রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশ মুখস্থ হয়ে যায়, তার সুললিত কণ্ঠের আবৃত্তি অপরকে মোহিত করে, তার ভাল লাগে মহাবীর হনুমানের চরিত্র। কথক ঠাকুরের কাছে জানতে পারে হনুমান কলাবাগানে থাকে। সরল বিশ্বাসে শিশু সন্ধ্যার অন্ধকারে

এক কলাবাগানে মহাবীরের প্রতীক্ষা করতে থাকে। দেখা না পেয়ে ফিরে আসে বালক, মা অনেক বুঝিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়। তার প্রিয় একটি খেলা রাজা-কোটাল খেলা। পূজামণ্ডপের সিঁড়িতে সবচেয়ে উঁচু ধাপে সে বসবে রাজা সেজে। নীচের ধাপগুলিতে মন্ত্রী ইত্যাদি বসবে। দোষীর বিচার হবে। রাজার শাসন সকলকে মানতে হবেই।

বয়স বাড়ার সঙ্গে বালকের 'কে' 'কি' ও 'কেন' প্রশ্নে বাড়ির প্রধানেরা বিব্রত হয়ে উঠলেন। বালক লক্ষ্য করে পিতার বৈঠকখানায় বিভিন্ন জাতের মক্কেলদের জন্য কয়েকটি হুঁকো। সুযোগ দেখে বালক একদিন একটির পর একটি হুঁকো টেনে চলেছে। সহসা বাবা বিশ্বনাথ সেখানে উপস্থিত। নরেন্দ্রকে হুঁকো টানার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বালক উত্তর দেয়, 'জাতিভেদ না মানলে কি হয় পরীক্ষা করে দেখছিলাম।' বিস্মিত বিশ্বনাথ চিন্তিতমনে পাঠাগারে চলে যান।

সাহসী বালক সঙ্গীদের নিয়ে চড়কের মেলা দেখে ফিরছিল। হাতে ছিল কয়েকটি মাটির মূর্তি। হঠাৎ চোখে পড়ে ছোট একটি শিশু চলন্ত এক ঘোড়ার নীচে চাপা পড়তে যাচ্ছে। নির্ভীক ছয় বছর বয়েসের নরেন্দ্র পলকের মধ্যে শিশুটিকে টেনে নিয়ে আসে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পথচারীরা বালকের সাহসিকতার প্রশংসা করে।

অসাধারণত্ব বালকের আচার-ব্যবহারে, দৈনন্দিন ঘটনায় প্রকাশ হতে থাকে। অল্প বয়স থেকেই নরেন্দ্র ঘুমাবার কিছু পূর্বে প্রতি রাত্রেই দেখে তার ভ্রূ দুটির মধ্যে একটা জ্যোতিঃ। কিছুক্ষণের মধ্যে স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যায়। আনন্দে আচ্ছন্ন বালক ঘুমিয়ে পড়ে। কিশোর মনের ধারণা, সকলেরই বোধ হয় এরকম ঘটে। বড় হয়ে জানতে পারেন, একমাত্র তাঁরই এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।

বাড়িতে গুরুমশায়ের কাছে পড়াশুনা শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে নরেন্দ্র মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হয়।

চঞ্চল বালক দীর্ঘকাল একভাবে বসে থাকতে পারে না, বিদ্যালয়ে তার অবাধ স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে বিরক্ত হয়। কিন্তু অনেক নতুন ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। খেলাধুলায়, গায়ের জোরে, বুদ্ধিতে সব কিছুতে সে অগ্রণী।

চোদ্দ বছর বয়সে একবার নরেন্দ্র অত্যধিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। বায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশ্বনাথ তাকে রায়পুরে নিজের কাছে রাখেন। প্রতিভাবান পুত্রকে তিনি পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের অনেক বইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কিশোরের প্রখর বুদ্ধি, বিচারশীল মন ও জানার আগ্রহ বিশ্বনাথ ও তাঁর মক্কেলদের মুগ্ধ করে। প্রায় দুই বছর পরে নরেন্দ্রনাথ ফিরে আসেন কলকাতায়। দুই বছরের পড়া এক বছরে শেষ করে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। সে বছর তাঁদের বিদ্যালয়ে তিনিই একমাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এর পর জেনারেল এসেম্বলি কলেজ। সঙ্গীত, হাস্যপরিহাসে পটু মেধাবী যুবক সহজেই যুবকদের দলপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। সাহেব অধ্যাপক যুবকের মনীষা দেখে বিস্মিত হন। এই সময়েই অধ্যাপক উইলিয়ম হেষ্টির মুখে প্রথম শুনেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নাম, ঠাকুর দেবতার নামে তাঁর আবেশের কথা।

যুবক নরেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক প্রেরণায়, বলিষ্ঠ দেহ গঠন ও ব্রহ্মচর্যব্রত পালনে বিশেষ যত্নপর ছিলেন। নিরামিষ ও পরিমিত আহার, ভূমিশয্যায় শয়ন ইত্যাদি কঠোরতা তিনি অবলম্বন করতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ধ্যানযোগেই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব। তাঁর ধ্যানপ্রবণ মন সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করেন, আচার্যের উপদেশ মেনে চলেন, কিন্তু তৃপ্তি পান না, মনের অশান্তি দূর হয় না। ছুটে যান একদিন ব্রাহ্মসমাজের শিরোমণি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে, গভীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি ভগবান দেখেছেন?' বিস্মিত মহর্ষি

যুবককে আশ্বাস দেন, তাঁর সুলক্ষণযুক্ত চেহারায় যোগীর চিহ্ন বর্তমান। উত্তর না পেয়ে অশান্ত মনে ফিরে আসেন নরেন্দ্রনাথ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথ সিমলায় সুরেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পান। সেখানেই তিনি প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেন। নরেন্দ্রের সুমধুর কণ্ঠের ভজন ঠাকুরকে ভাবে মাতোয়ারা করে তোলে। তাঁর সপ্রেম আহ্বানে নরেন্দ্র একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। নরেন্দ্রকে একাকী পেয়ে আনন্দে বিগলিত ঠাকুরের ভাবরাশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। তিনি চিনতে পারেন এই যুবক মায়েরই নির্দিষ্ট তাঁর লীলাসহায়ক। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নরঋষি ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর লীলাপরিকররূপে। তিনি নিকট-আত্মীয়ের মত যুবকের সঙ্গে সপ্রেম ব্যবহার করেন। তাঁকে নিজহাতে মিষ্টি খাইয়ে দেন, স্তুতিভরে বলেন তিনি নামি নররূপী নারায়ণ। যুবক বিদায় নেওয়ার সময় তিনি প্রেমভরে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান পুনরায় শীঘ্র আসার জন্য, শিক্ষিত বিচক্ষণ যুবক নরেন্দ্রনাথের সংশয় হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ কি উন্মাদ? তিনি সিমলার দত্তবাড়ির ছেলে, তাঁকে বলেন কিনা নররূপী নারায়ণ! অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর চালচলন কথাবার্তা মিষ্টি ব্যবহারের মধ্যে অসম্বন্ধ কিছু নাই। অদ্ভুতচরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে করতে নরেন্দ্র বাড়ি ফিরেন। দক্ষিণেশ্বরের আকর্ষণে যুবক মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতে থাকেন। লেখাপড়া জানেন না ঠাকুর, কিন্তু তাঁর কথার মধ্য দিয়ে বুদ্ধি ও বোধের দীপ্তি, সরলতা, পবিত্রতা ও প্রেমের মাধুরী ছড়িয়ে পড়ে।

অভাবনীয় একটি ঘটনা। একদিন ঠাকুর ভাবের ঘোরে তাঁর শ্রীপদ দিয়ে নরেন্দ্রনাথের বুক স্পর্শ করেন। লোহার মত শক্ত পেশী, ইস্পাতের মত দৃঢ় শিরা নরেন্দ্রনাথের, তাঁর ভাবান্তর উপস্থিত. তিনি দেখেন আশপাশের দৃশ্যমান সব কিছু তলিয়ে যাচ্ছে, ক্রমে তিনি তাঁর 'আমিত্ব'টুকুও হারিয়ে ফেলেন। আর্তনাদ

করে উঠেন তিনি। ঠাকুর হাত দিয়ে তাঁর বুক স্পর্শ করতেই তিনি স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করেন, দেখেন ঠাকুর সহাস্য বদনে পাশে দাঁড়িয়ে। ঠাকুরের আচরণের সব কিছু মেনে নিতে বা তাঁর উক্তির সব কিছু সমর্থন করতে নরেন্দ্রনাথ পারেন না, কিন্তু দেবমানব ঠাকুরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁর চোখে রামকৃষ্ণ প্রেমের প্রতিমূর্তি, সত্যনিষ্ঠ, সরল, শুদ্ধ, পবিত্র; তিনি বুঝতে পারেন ঠাকুরই তাঁর পথপ্রদর্শক, ঠাকুরও নরেন্দ্রনাথকে কাছে পেতে চান। তিনি আসতে দেরি করলে কলকাতায় লোক পাঠান বা নিজেই যান। ঠাকুর তাঁর কথা শুনতে ভালবাসেন, তাঁর প্রাণমাতানো গানে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন, নরেন্দ্রনাথের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ একদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?' ঠাকুরের দ্বিধাহীন স্পষ্ট উত্তর, 'হাঁ গো, এই যেমন তোমায় দেখছি।' নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হন। ঠাকুর আরও বলেন যে তিনি নরেন্দ্রকেও ঈশ্বর দেখাতে পারেন। তাঁর প্রতি ননেন্দ্রনাথের আকর্ষণ বেড়ে যায়।

নরেন্দ্রনাথ বি. এ. পাস করে আইনের পাঠ শুরু করলেন। ঘটল এক দুর্ঘটনা। পিতা বিশ্বনাথ হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করেন। বিশ্বনাথের আয় ছিল প্রচুর, কিন্তু ব্যয় ততোধিক। পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ দেখেন পিতার ঋণের পরিমাণ প্রচুর। সুযোগ বুঝে আত্মীয়স্বজন তাঁদের বসতবাটী দখলের চক্রান্ত করে। বিপদের ঝঞ্ঝাবাত্যার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ সংগ্রাম করতে থাকেন। চাকুরি জোটে না। চাকুরি একটা জুটলেও স্থায়ী কোন অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা হয় না। আর্থিক অনটন এত প্রবল হয় যে বাড়িতে দু'বেলা হাঁড়ি চাপে না, বীরহৃদয় নরেন্দ্রনাথ দুর্দিনেও সাহস হারান না, বীর সৈনিকের মত অবস্থার সঙ্গে যুঝতে থাকেন। অমিতব্যয়ী পিতাকে পুত্র একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি পুত্রের জন্য কি দিয়ে যাচ্ছেন? পিতা পুত্রকে

বলেন আর্শিতে মুখ দেখতে। আর্শিতে তিনি দেখেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাস-ব্যঞ্জক মুখের প্রতিচ্ছবি। পিতা বুঝিয়ে বলেন নরেন্দ্রনাথের মধ্যে যে আদর্শ চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন সেটাই তাঁর উত্তরাধিকার। ঠাকুর বলতেন, নরেন্দ্র ঈশ্বরকোটি, ঈশ্বরের সমান থাকের। তিনি বলতেন, কেশবচন্দ্রের [সেন] মধ্যে যদি একটা শক্তি থাকে তো সেরকম আঠারোটা শক্তি আছে নরেন্দ্রনাথের। সেই নরেন্দ্রনাথ অবস্থার দুর্বিপাকে কষ্ট পাচ্ছেন, ঠাকুরের প্রাণে লাগে। অভাবে পড়ে নরেন্দ্র অধর্ম করছে রূপ মিথ্যা সংবাদও ঠাকুরের কানে উঠে। অন্তর্দ্রষ্টা ঠাকুর বিশ্বাস করেন না। এদিকে নরেন্দ্রনাথের সংসারত্যাগের সঙ্কল্প হয়। তিনি শ্রীগুরুর শেষ দর্শনের জন্য আসেন। ঠাকুর তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। প্রেমের ঠাকুর প্রেমের ডুরিতে তাঁর মন জয় করেন। শ্রীগুরুর শরীর বর্তমানে সংসারত্যাগ উচিত হবে না। তিনি ঐ সঙ্কল্প আপাতত ত্যাগ করেন।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে অভিজ্ঞ ও ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় অভ্যস্ত নরেন্দ্র ঠাকুরের মত সহজে মেনে নেন না। তিনি মূর্তি উপাসনা বা শুধ্ অদ্বৈত চিন্তাকে বিদ্রূপ করেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার কথা শুনবি না তো এখানে আসিস কেন?' স্পষ্টবাদী নরেন্দ্র উত্তর করেন, 'আপনাকে ভালবাসি বলে।' অবতারবরিষ্ঠ ঠাকুর তাঁর শিষ্য ভক্তদের মন ও বুদ্ধি কাঁচা মাটির তালের মত ভাঙতেন গড়তেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে নরেন্দ্র সাকার উপাসনা স্বীকার করলেন। মা কালীকে মানলেন। ঠাকুরের সেদিন খুব আনন্দ। নরেন্দ্র জগন্মাতা ভবতারিণীর কাছে জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু দারুণ দুর্দিনেও মা-ভাইবোনের জন্য টাকাকড়ি চাইতে পারলেন না, সঙ্কোচ বোধ করলেন। ভবতারিণীর কাছে কি ভাত-কাপড়ের মত সামান্য জিনিস চাওয়া যায়? শেষে কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে

ও মা ভবতারিণীর কৃপায় নরেন্দ্রের বাড়িতে ভাত-কাপড়ের অভাব মিটে গেল।

অন্তর্যামী ঠাকুর জানতেন নরেন্দ্রের নিরাকারের ঘর। খাপখোলা তলোয়ার নরেন্দ্রের মধ্যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত, সেই জ্ঞানাগ্নি সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ঠাকুর তাঁকে অষ্টবক্রসংহিতা প্রভৃতি অদ্বৈত গ্রন্থ পড়াতেন, অদ্বৈত উপদেশ করতেন। ঠাকুরের সকল উপদেশ নরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অনুভূতির কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে গ্রহণ করেছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গলায় ক্যান্সাররোগে আক্রান্ত হন। রোগ প্রবল হলে ভক্তরা কলকাতায় এনে চিকিৎসা করান, বিশেষ কোন উপকার হ'ল না। চিকিৎসকের পরামর্শে কাশীপুরে প্রশস্ত এক বাগানবাড়িতে ঠাকুরকে রেখে চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা চলতে থাকে। গৃহী ভক্তেরা অর্থসংগ্রহ করেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এদিকে নরেন্দ্রের নেতৃত্বে যুবক ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। অসহ্য রোগযন্ত্রণা, কিন্তু সদানন্দ পুরুষ ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের ধর্মজীবন গঠনের শেষ রূপদানে ব্যস্ত। একদিন সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ ধ্যানে সমাসীন, ক্রমে ধ্যান গভীর হয়ে, বহু আকাঙ্ক্ষিত নির্বিকল্প সমাধিতে মন লীন হ'ল। রাত্রি এক প্রহর পরে নরেন্দ্র সহজ অবস্থায় ফিরে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করলেন ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'মা তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। এসব তালাবন্ধ রইল, চাবি আমার হাতে। এখন কাজ আছে। কাজ শেষ হলে আবার চাবি ফেরত পাবি।' অবতারবরিষ্ঠের মর্ত্যলীলার শেষাঙ্ক চলেছে। তাঁর অবর্তমানে তাঁর সন্তানদের পরিচালনার দায়িত্ব নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে গেলেন, ঠাকুর তাঁকে পরিচালনার বুদ্ধি ও পরামর্শ দেন। সাধনালব্ধ সকল শক্তি ঠাকুর সঞ্চার করে দেন নরেন্দ্রনাথের মধ্যে, নিজে ফকির হয়ে যান। সেই মহাশক্তিতে বলীয়ান নরেন্দ্রনাথ 'মায়ের কাজে'র জন্য প্রস্তুত হন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট ঠাকুর মহাসমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। মাস দুয়েকের মধ্যে গৃহস্থ ভক্ত সুরেশচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে বরাহনগরের একটা পোড়ো ভূতুড়ে বাড়িতে ভক্ত যুবকবৃন্দ মিলিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁর আদর্শের বাহক শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই গোড়াপত্তন, নেতা নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে কাশীপুরবাড়িতে সাধন ভজন জমে উঠেছিল, ঠাকুরের তিরোধানের পর তা তীব্রতর হ'ল। সকলেরই পণ 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'; অর্থাভাবে অনাহারে দিন কাটে কিন্তু ধ্যান ভজন আনন্দের শেষ নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদল চিরপবিত্র 'বিরজা হোম' অনুষ্ঠান করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তরুণ যোগীর দল যে দুশ্চর ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন তার কঠোরতার কাহিনী শুনলে, বোধ করি, ভূতও পালিয়ে যায়।

মঠ সংগঠনের প্রাথমিক কাজকর্ম কিঞ্চিৎ গুছিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। হরিদ্বার যাওয়ার পথে হাতরাসে স্টেশনমাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসীর পৌরুষব্যঞ্জক ব্যবহারে আকৃষ্ট শরৎচন্দ্র ঘর-সংসার ছেড়ে স্বামীজিকে অনুসরণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় স্বামী সদানন্দ। চিরকালের আকর্ষণ হিমালয়ের ক্রোড়ে নির্জনে সাধন ভজন করেন স্বামীজি। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি গুরুভাই অখণ্ডানন্দকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়েন। নৈনিতাল হতে বদ্‌রিকাশ্রমের পথে স্বামীজি এক গাছের নীচে গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। পরমতত্ত্ব উদ্ভাসিত হয় নূতন রূপ ধরে। ধ্যান-লভ্য মহীয়ান প্রেমময়কে তিনি প্রত্যক্ষ করেন সর্বভূতে। জীবনের বড় একটি সমস্যার সমাধান হয়। এবার নির্জন ধ্যানের আসন ছেড়ে একাকী বের হন অধ্যাত্ম সাধনার পীঠ ভরেতবর্ষের প্রকৃত রূপটি জানবার জন্য। তিনি পায়ে হেঁটে ভারততীর্থ পরিক্রমা করেন। হিমালয় থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। ভারতের মানুষ,

ভারতের সমাজ ও চিন্তাধারা, ভারতবাসীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ভগবানের উপর নির্ভরশীল স্বামীজি কখনও রাজা-মহারাজার অতিথি, কখনও বা তিনি দীন-দরিদ্রের কুটীরে স্থান পেয়েছেন, কখনও বা গাচতলায় রাত্রি যাপন করেছেন। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ও ধনী-দরিদ্র সকলেই স্বামীজির সান্নিধ্যে শান্তিলাভ করে, তারা আশার আলো দেখতে পায়, দারিদ্র্য অশিক্ষা কুসংস্কারে জর্জরিত সাধারণ মানুষের দুঃখে স্বামীজির বিশাল হৃদয় আলোড়িত হয়। উচ্চবর্ণ, অর্থবান ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দীর্ঘকাল নির্যাতন ও নিষ্পেষণে দেশের অগণিত জনসাধারণ দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হয়েছে। তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, বিশ্বাস করে না যে তারাও মানুষ, তাদেরও বাঁচার পূর্ণ অধিকার। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ব্যগ্র অপরিমিত বিলাসব্যসনে লিপ্ত রাজা-মহারাজাদের দিয়ে দেশের হীন পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। গভীর চিন্তাকুল স্বামীজি কন্যাকুমারীর মন্দিরের অদূরে একটি প্রস্তরখণ্ডে ধ্যানাসীন হলেন। সমস্যা জর্জরিত ভারতবর্ষ পুনরুদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করেন তিনি। ভারতের প্রাণপাখী আধ্যাত্মিকতা, তাকে সবল সজীব করে তুলতে হবে, ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, হতাশায় পূর্ণ হীন পতিত ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধন করতে হবে। শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তিনি মৃতপ্রায় ভারতবাসীর নিকট জাগরণের পূতমন্ত্র বহনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মায়ের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল স্বামীজি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে আমেরিকা যাত্রা করেন। শিকাগো সহরে ধর্মমহাসম্মেলন, গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিহিত স্বামীজি সামান্য অর্থ হাতে শিকাগো সহরে পৌছলেন। অপরিচিত নূতন দেশ। শহরে খোঁজ করে জানতে পারলেন সম্মেলন আরম্ভ হতে মাস দেড়েক দেরি। হাতে যথেষ্ট অর্থ নাই, পরিচিত কোন লোক নাই, হতাশায় ভরে উঠে মন।

কিন্তু ক্ষণিকের হতাশা বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পে কেটে যায়, ঘটনাক্রমে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে স্বামীজির পরিচয় হয়। প্রতিভাধর স্বামীজির জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ অধ্যাপক তাঁর ধর্মসভায় যোগদানের পথ সুগম করে দেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর কউম্বাস হলে সাত হাজার পুরুষ মহিলা শ্রোতা ঠেসাঠেসি করে বসে। সভাবেদীতে সমাসীন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা। বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদি, কনফিউসিয়ান, শিন্টো, ইসলাম, খৃষ্টানধর্মের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ ধর্মের মহিমা প্রচার করতে এসেছেন। হিন্দুভারতের অনাহূত প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ, বয়স তাঁর মাত্র ত্রিশ, তিনি তাঁর ভাষণও প্রস্তুত করে আনেন নাই। বিরাট জনসমাগম দেখে তিনি বুঝিবা একটু ঘাবড়িয়ে গেলেন। তাঁর নাম ডাকা হ'ল। তিনি বাগ্‌দেবীকে স্মরণ করে ভাষণদানে অগ্রসর হন। ঈশ্বরনির্ভর যুবসন্ন্যাসী 'আমেরিকার বোন ও ভাইয়েরা' সম্বোধন করতেই বিস্মিত সম্মোহিত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁকে অধীর উল্লাসে অভিনন্দন জানায়। ভারতীয় ঋষির তপস্যালব্ধ ধর্মসমন্বয়ের শাশ্বত বাণী উল্লেখ করে সকল রকমের ধর্মের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটুক এই আকাঙ্ক্ষা স্বামীজি প্রকাশ করেন। ক্ষুদ্র একটি ভাষণে স্বামীজি আমেরিকাবাসীর মন জয় করলেন। রাস্তাঘাটে স্বামীজির ছবি টাঙ্গানো হল, খবরের কাগজে প্রতিদিন নানা খবর প্রকাশ হতে লাগল। স্বামীজিকে তখন সাদর আহ্বান অনেকেই করে। ধনীর গৃহে অতিথি হয়েও কিন্তু স্বামীজি ভুলতে পারেন না অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্র দেশবাসীর কথা। মহাসভার শেষে তিনি বিভিন্ন সহর পরিভ্রমণ করে ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার, ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রকৃত রূপ পাশ্চাত্ত্যের দরবারে উপস্থিত করলেন। বেদান্তের উদার ও গভীর ভাবরাশি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচার করেন, চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানরাশি পাশ্চাত্ত্যবাসীর করায়ত্ত, তারা ভোগবিলাসে

লিপ্ত, তারা ভুলে গেছে আত্মানুসন্ধান করতে। চিন্তাবিপ্লব আনয়নকারী স্বামীজিকে নাম দেয় ঝঞ্ঝা-সদৃশ হিন্দু। আদর্শ বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন স্বামীজি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষায় সনাতন সত্যকে প্রচার করেন তিনি। জ্ঞানীগুণী উদার আমেরিকাবাসী স্বামীজিকে অভিনন্দন জানায়। গোঁড়া খৃষ্টানরা কিন্তু স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে স্বামীজির বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে, এমন কি তাঁর জীবন সংশয় করতে চেষ্টা করে।

যে আধ্যাত্মিকতার বীজ তিনি আমেরিকাবাসীর হৃদয়ে রোপণ করেন তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বাছাইকরা কয়েকজন অনুরাগীর জীবনগঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে থাউজাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে তিনি দ্বাদশজন অনুরাগীদের নিভৃতে শিক্ষাদান করেন। এদের মধ্যে কয়েকজন স্বামীজির কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। এদিকে পাশ্চাত্যের ভাব-আন্দোলন সাগর পেরিয়ে ভারতবর্ষে পৌছায়। মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় যুবকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। স্বামীজি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তাদের উৎসাহ—অগ্নির ইন্ধন দিতে থাকেন। ভারতবর্ষের জন্য পরিকল্পনা রচনা করেন। কর্মিগণকে প্রাথমিক কাজে নিযুক্ত করে স্বামীজি ভারতবর্ষে সেবাযজ্ঞের প্রস্তুতি গড়তে থাকেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি প্যারিস হয়ে লণ্ডনে যান। বৃটিশ নাগরিকগণ ধীরে ধীরে কিন্তু আন্তরিকভাবে স্বামীজির চিন্তারাশি গ্রহণ করেন। কিছুকালের জন্য স্বামীজি আবার আমেরিকায় যান ও নিউইয়র্কে 'বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। আমেরিকায় কাজে সাহায্যের জন্য গুরুভাই স্বামী সারদানন্দ আসেন, ইংলণ্ডে কাজের জন্য আসেন স্বামী অভেদানন্দ। আমেরিকায় মিসেস বুল, ডাঃ জেমস্, মিস ওয়াল্ডো প্রমুখ কর্মীবৃন্দ ও ইংলণ্ডে মিঃ স্টার্ডি ও মিস মূলার স্বামীজির ভাবধারার পুষ্টিবিধান ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে সেভিয়ার দম্পতি ও

মিস মার্গারেট নোবল [ভগিনী নিবেদিতা] ভারতবর্ষের কাজের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত স্বামীজি কয়েকজন পাশ্চাত্ত্যবাদী অনুরাগীদের সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষে।

উৎসাহের বারুদে ঠাসা সমস্ত দেশ স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করার জন্য মেতে উঠল। সিংহল হতে আলমোড়া পর্যন্ত যে বিপুল সংবর্ধনা স্বামীজিকে দেওয়া হল তার তুলনা পাওয়া যায় না। সন্ন্যাসীপ্রবর বুঝলেন দেশবাসীর এই আনন্দ উচ্ছ্বাস তাঁর চিন্তারাশি ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনাকে দেশ সংগঠনের কাজে পরিচালিত করলেন তিনি। জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও পৌরুষ উদ্বোধনের জন্য শিক্ষিত ত্যাগী যুবকবৃন্দের হৃদয়প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন স্বামীজি। ভারতবর্ষকে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজি তাঁর পরিকল্পনা পেশ করলেন। কর্মীদের শিক্ষাদানে সচেষ্ট হলেন। সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ কর্মীদের স্থায়ীভাবে পরিচালনার জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। 'আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রে সাধনার সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে সংঘের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়।

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব একটি ভাবধারা বিদ্যমান। ভাবধারা জাতিকে পুষ্ট করে সামগ্রিক কল্যাণ বিধান করে। ভারতবর্ষের প্রাণধারা আধ্যাত্মিকতা, দীর্ঘকালের অযত্নে ও অবহেলায় প্রাণস্রোতস্বিনী লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়েছে। কিন্তু ফল্গুধারার মত প্রাণস্রোত জাতির ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই প্রাণস্রোতকে সবল করতে হবে, জাতির দেহের সর্বাঙ্গে প্রাণস্রোতকে পৌঁছে দিতে হবে, তবেই জাতির জীবন ফলে ফুলে ভরে উঠবে, প্রকৃত ধর্মপথের অনুসরণই ভারতের কল্যাণ ও উন্নতির একমাত্র উপায়। নানা ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় ঋষি আবিষ্কৃত তত্ত্ব মুষ্টিমেয় কিছু

লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আচার্য বিবেকানন্দ সেই জাতীয় সম্পদ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। ঋষিপ্রদর্শিত পথে জাতিকে পরিচালনা করতে হবে, সর্বপ্রথম দরিদ্র ও নিপীড়িত ভারতবাসীর খাওয়া-পরার অভাব দূর করতে হবে, প্রয়োজনীয় ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা নিয়োগ করতে হবে, দরকারমত বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু বিদেশ হতে আমদানী করা সব কিছু জাতির প্রাণরসে জারিয়ে নিয়ে স্বাঙ্গীকরণ করতে হবে। স্বদেশের ঐতিহ্যে গর্বিত স্বামীজি বন্ধুভাবে বিদেশের সঙ্গে লেনদেন করতে চাইতেন। বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান ও অর্থের বিনিময়ে ভারতবর্ষ দিবে পাশ্চাত্ত্যের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রকৃত কল্যাণের নিদান, তার আধ্যাত্মিকতা।

এই মহাযজ্ঞ সাধনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মী। উপনিষদের অভীঃ মন্ত্রে স্বামীজি ব্যক্তির জীবন আত্মবিশ্বাস এবং সমাজমানসে প্রকৃত মূল্যবোধ ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, 'যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, দুর্বলতাই সেই পাপ।' সর্বপ্রকারের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে আসতে হবে ত্যাগী যুবকদের, যারা হবে জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। দুঃখযন্ত্রণা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে ব্রতী যুবকদের আশীর্বাদ করে স্বামীজি বলেন, 'সেই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী হন।' স্বামীজি দেশবাসীকে বলেন, 'স্বার্থত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ। এই আদর্শ অনুযায়ী ভারতের সাধনা তীব্রতর কর, তাহলেই বাকি যা কিছু আপনা হ'তে আসবে।' অপরের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করলে নিজেরই অশেষ কল্যাণ। 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করলে চিত্তের মালিন্য দূর হবে, ক্রমে ঐকান্তিক মুক্তি করায়ত্ত হবে।

মহাজাগরণের সূচনা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কিন্তু অত্যধিক

পরিশ্রমে স্বামীজির স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন গুরুভাই তুরীয়ানন্দ ও তাঁর মানস-কন্যা নিবেদিতাকে নিয়ে ইউরোপ যাত্রা করেন। তিনি ছিলেন জীবন্ত বিশ্বকোষ, প্রতিমুহূর্তে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী নূতন পথের সন্ধান দিত। তাঁর প্রতিটি কথা অমিত শক্তি বহন করে শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করত। স্বামীজি বলতেন, 'মানুষ যখন বেঁচে থাকে তখন জ্যান্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা ভাষা কয়।' তাঁর জ্যান্ত ভাষায় প্রকাশিত শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও সামাজিকতত্ত্ব শুনবার জন্য মনীষিগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরে স্বামীজি বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন ৯০০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর। ভগ্ন স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন স্থায়ী উন্নতি হয় না। কিছুদিনের জন্য আসাম ও পূর্ববঙ্গে পরিভ্রমণ করেন। অধিকাংশ সময় তিনি সাদাসিধে-ভাবে মঠে বাস করতেন। স্বামীজি ছিলেন আনন্দের ফোয়ারা। যেখানেই তিনি যান সেখানেই তিনি দশদিক আলো করে থাকেন। মঠে স্বামীজির কয়েকটি পোষা জন্তু ছিল, বিচিত্র তাদের নাম। কুকুরের নাম বাঘা, ছাগলের নাম মটরু, হরিণের নাম হংসী। মঠের জমিতে কাজ করত কয়েকজন সাঁওতাল, স্বামীজি তাদের প্রিয়জন। তিনি একদিন তাদের তৃপ্তিভরে খাইয়ে নারায়ণ সেবা হ'ল জেনে আনন্দ লাভ করলেন।

স্বামীজির মর্ত্যলীলার গোধূলি উপস্থিত। সকলের মন স্বামীজির প্রীতি ভালবাসায় রাঙা হয়ে আছে, গোধূলির রাঙা আলোয় খেয়াল থাকে না গভীর রাত্রি আগতপ্রায়। দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেওয়ার তারিখ স্বামীজি স্থির করেন পঞ্জিকা দেখে, নির্দিষ্ট দিনে তিনি মহাসমাধিযোগে রক্তমাংসের শরীর ত্যাগ করলেন। সেদিন ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ, ভারতের জীবন-মশাল চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে, কিন্তু তার দিব্য স্পর্শে লক্ষ হৃদয়ে যে দীপ জ্বলে উঠেছে তার আলোকেই ভারতের বিবেকানন্দ চির-ভাস্বর হয়ে রয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক কালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলেরই মধ্যে আছে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্র ভাবে, বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েচে, তখনি শক্তি দিয়েচে। সেই শক্তির পথ কেবল এক-ঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ-মনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেচে।

বিবেকানন্দই সেই দুর্ধর্ষ বীর যিনি সারা জগৎকে দুহাতে ধরে নাড়া দিয়ে তাকে বদলাতে চেয়েছিলেন। তাঁর গুরুদেব [শ্রীরামকৃষ্ণ] তাঁকে এর জন্যই গড়ে তুলেছিলেন। বিশ্বকে দেখাবার ও বোঝাবার জন্যে তিনিই হচ্ছেন প্রথম সঙ্কেত, যে ভারতবর্ষে আবার জাগবে, শুধু বাঁচবার জন্যে নয়, বিশ্বজয় করবার জন্যে। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সামগ্রিক সত্তাসম্পন্ন এক বিরাট আত্মা, সত্যকার পুরুষসিংহ বলে যদি কেউ থাকে সে তিনিই। আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রভাব বিপুলভাবে এখনও কাজ করে চলেছে। আমরা ঠিক জানি না, কখন বা কেমন করে বা কোনখানে, তা কাজ করে চলেছে এমন একটা প্রস্তুতির মধ্যে, যা এখনও পুরোপুরি রূপ নেয়নি কিন্তু যা শক্তিশালী ও মহৎ। অন্তর্নিহিত প্রেরণায় আপ্লুত, যুগান্তকারী এক বিরাট সম্ভাবনা, যা ভারতের আত্মায় প্রবেশ করেছে, আর যাকে প্রত্যক্ষ করবার জন্যে আমরা সকলকে ডাক দিচ্ছি। বিবেকানন্দ এখনও বেঁচে রয়েছেন তাঁর সেই মায়ের আত্মার মধ্যে, মায়ের সন্তানদের আত্মার মধ্যে।

* * *

জেলখানায় আমার কাছে গীতা ও উপনিষদ্ ছিল, আমি গীতার যোগ অভ্যাস করতাম এবং উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করতাম ; এই দুইটি গ্রন্থই শুধু আমার পথপ্রদর্শক ছিল। মাঝে মাঝে যখনই কোন প্রশ্ন জেগেছে বা অসুবিধা বোধ করেছি, তখনই আমি আলোর সন্ধান করেছি গীতায় এবং তার থেকেই আমি সাহায্য ও সমাধান লাভ করেছি। একথা সত্য যে জেলখানার নীরব ধ্যানের মধ্যে অবিরাম পনর দিন ধরে আমি বিবেকানন্দর কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম এবং তাঁর উপস্থিতিও অনুভব করেছিলাম। বিশেষ একটি অধ্যাত্ম উপলব্ধির সীমাবদ্ধ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন এবং সে বিষয়ে যা বলার ছিল তা বলা শেষ হওয়ামাত্রই তাঁর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল।

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করিবার এবং তাঁহার চিন্তার বীজ বিশ্বময় বপন করিবার দায়িত্ব তাঁহার যে মহান শিষ্যের উপর পড়িয়াছিল, তিনি ছিলেন দেহ ও মনের দিক হইতে রামকৃষ্ণের ঠিক বিপরীত।

দিব্যাত্মা রামকৃষ্ণ তাঁহার সমগ্র জীবন জগন্মাতার চরণতলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আশৈশব তিনি ছিলেন মহাদেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত; আত্মচেতনা জন্মিবার আগেই তাঁহার এই চেতনা জন্মিয়াছিল যে, তিনি মহাদেবীকে ভালবাসিয়াছেন। মহাদেবীর সহিত পুনর্মিলনের চেষ্টায় তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া বহু বেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তবে তাহা ছিল মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো—সে বেদনা বহনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে তাঁহার পবিত্র প্রেমের উপযুক্ত করিয়া তোলা। সকল জটিল দুর্গম অরণ্য-পথের প্রান্তে একাকী সেই মহাদেবী—সেই বহুরূপিণী বিধাত্রী। রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি অন্যান্য সকল রূপকেও চিনিতে শিখিলেন, এই মহাদেবীর মধ্য দিয়াই তিনি আলিঙ্গন করিলেন সমগ্র বিশ্বকে। বিশ্বানন্দের এই প্রশান্ত পূর্ণতার মধ্যেই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইল। এই বিশ্বানন্দের বন্দনাই বীঠোফেন ও শীলার পাশ্চাত্যের জন্য গাহিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ কিন্তু এই বিশ্বানন্দকে বীঠোফেন ও শীলারের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বীঠোফেনের নিকট উহা ছিল বিবদমান বিশৃঙ্খল মেঘমালার অবকাশে নীলাকাশের ক্ষণিক প্রকাশ মাত্র। কিন্তু ভারতীয় রাজহংস পরমহংস ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিনগুলির

যবনিকা পার হইয়া চিরশাশ্বতের স্বচ্ছ সরোবরে আপনার সুবিশাল শুভ্রপক্ষ বিস্তার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন।

তাঁহাকে অনুকরণ করিবার অধিকার তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যদেরও ছিল না। ইহাদের মধ্যে যিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই বিবেকানন্দও তাঁহার সুবিশাল পক্ষে ভর করিয়া চকিতে কখনো কদাচিৎ মাত্র ঝঞ্ঝা বিক্ষোভের মধ্যে ঊর্ধ্বলোকে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। তাই বিবেকানন্দের কথা ভাবিলে বারে বারে আমার বীঠোফেনের কথা মনে পড়ে। তিনি যে সময়টুকু এই প্রশান্তির বক্ষে বিরাজ করিতেন, তখনও তাঁহার তরণীর পালে সকল দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিয়া লাগিত। পৃথিবীর যুগব্যাপী দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁহার চারিদিকে ক্ষুধিত সামুদ্রিক পক্ষীর মতো অহরহ ডানা ঝাপটাইয়া বেড়াইত। দুর্বলতার নহে—শক্তির আবেগ তাঁহার সিংহ-হৃদয়ের মধ্যে উদ্বেল হইত। তিনি ছিলেন মূর্তিমান শক্তি; কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁহার বাণী। বীঠোফেনের মতো তাঁহার কাছেও সকল সদ্‌গুণের মূল ছিল কর্ম। নিষ্ক্রিয়তাই প্রাচ্যের স্কন্ধে গুরুভার হইয়া চাপিয়া বসিয়াছিল। তাই নিষ্ক্রিয়তার প্রতি তাঁহার ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। তাই ঘৃণা ভরে তিনি বলিয়াছিলেন :

'সর্বোপরি, শক্তিশালী হও। পৌরুষ লাভ করো। দুর্বৃত্ত যতক্ষণ পৌরুষ ও শক্তির পরিচয় দেয়, ততক্ষণ এমন কি তাহাকেও আমি শ্রদ্ধা করি। তাহার শক্তিই একদিন তাহাকে কুপথ ত্যাগ করিতে, এমন কি, সকল স্বার্থ বিসর্জন দিতে বাধ্য করিবে; এইভাবেই একদিন শক্তি তাহাকে সত্যের পথে ফিরিয়া আনিবে।'

বিবেকানন্দের দেহ ছিল মল্লযোদ্ধার মতো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। তাহা রামকৃষ্ণের কোমল ও ক্ষীণ দেহের ছিল ঠিক বিপরীত। বিবেকানন্দের ছিল সুদীর্ঘ দেহ [পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি], প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, সুদৃঢ় গঠন, বলিষ্ঠ পেশল বাহু, শ্যামল চিক্কণ ত্বক্‌, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল, আর অপূর্ব আয়ত

পল্লবভারে অবনত ঘনকৃষ্ণ দুটি চক্ষু। তাঁহার চক্ষু দেখিলে প্রাচীন সাহিত্যের সেই পদ্মপলাশের উপমা মনে পড়িত। বুদ্ধিতে, ব্যঞ্জনায়, পরিহাসে, করুণায় দৃপ্ত প্রখর ছিল সে চক্ষু; ভাবাবেগে ছিল তন্ময়; চেতনার গভীরে তাহার অবলীলায় অবগাহন করিত; রোষে হইয়া উঠিত অগ্নিবর্ষী, সে দৃষ্টির ইন্দ্রজাল হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার রাজকীয়তা। তিনি ছিলেন আজন্ম সম্রাট। কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায়, কোথাও এমন কেহ তাঁহার পাশে আসেন নাই, যিনি তাঁহার নিকট নতশির না হইয়াছেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোতে কার্ডিন্যাল গিবন্‌স ধর্ম সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী সভায়, ত্রিশ বৎসরের এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যুবক যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন সভায় অন্যান্য সভ্যগণের উপস্থিতির কথা মানুষে ভুলিয়া গেল। বিবেকানন্দের দেহের মহিমা, তাঁহার চক্ষের কৃষ্ণাভ দ্যুতি, তাঁহার প্রশান্ত গাম্ভীর্য এবং বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পর হইতে তাঁহার সুগভীর কণ্ঠধ্বনি তাঁহার বর্ণবিদ্বেষী মার্কিন অ্যাংলো-স্যাক্‌সন শ্রোতাদেরও বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল এবং ভারতবর্ষের এই সৈনিক দ্রষ্টার চিন্তাধারা যুক্তরাষ্ট্রের বক্ষে গভীরভাবে রেখাপাত করিল।

তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন, ইহা কল্পনাও করা যায় না। তিনি যেখানেই গিয়াছেন যেখানেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আগেই আমি রামকৃষ্ণের একটি দিব্য দর্শনের বর্ণনা দিয়াছি। সেখানেও রামকৃষ্ণ তাঁহার এই প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে তাঁহার নিজের সম্পর্ককে এক মহর্ষির সঙ্গে এক শিশুর সম্পর্কের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিবেকানন্দ নিজেকে কঠোর-ভাবে বিচার করিয়া সবিনয়ে এই সম্মান লইতে অস্বীকার করিলেও, তাঁহার এই অস্বীকারের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। সকলে প্রথম দর্শনেই তাঁহার মধ্যে ভগবৎপ্রেরিত এক নেতার সাক্ষাৎ

পাইতেন—তাঁহার মধ্যে নির্দেশ দিবার, পরিচালিত করিবার যে শক্তি নিহিত ছিল তাহার চিহ্ন সকলের চোখেই সহজে ধরা পড়িত। হিমালয়ে সহসা এক পর্যটকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পর্যটক তাঁহাকে না চিনিলেও থমকিয়া দাঁড়ান এবং বলিয়া উঠেন, 'শিব!...'

তাঁহার স্বনির্বাচিত দেবতা যেন তাঁহার ললাটে নিজের নামটি দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার ললাটের এই বিশাল উপলখণ্ডের উপর দিয়া বহু মানসিক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছিল। যে প্রশান্ত বায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছ বিস্তারের উপর রামকৃষ্ণের মৃদু হাস্য চমকিত হইত, বিবেকানন্দ তাঁহার নিজের জীবনে তাহা কদাচিৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি শক্তিশালী দেহ, তাঁহার অতি বিরাট মস্তিষ্ক আগে হইতেই তাঁহার বাত্যাব্যাকুলিত আত্মার রণক্ষেত্ররূপে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। সেখানে অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, স্বপ্ন ও কর্ম স্ব-স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। তাঁহার জ্ঞান ও কর্মশক্তি এতই অধিক ছিল যে, তাঁহার নিজের স্বভাবের এক অংশকে বা সত্যের এক অংশকে বিসর্জন দিয়া কোনরূপ সঙ্গতিবিধান তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁহার এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার জন্য তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। যে সংগ্রামে তাঁহার সাহস, এমন কি তাঁহার জীবনও নিঃশেষিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট জীবন ও সংগ্রামের অর্থ ছিল এক। তাঁহার জীবনের দিনগুলিও ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। রামকৃষ্ণের ও তাঁহার এই মহান্ শিষ্যের মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ষোলো বৎসর।...কিন্তু কয়েক বৎসরেই বিবেকানন্দ আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন।...চল্লিশ বৎসরেরও কম বয়সে এই মল্লবীর চিতাশয্যা গ্রহণ করেন।

কিন্তু সে চিতাগ্নি আজও নির্বাপিত হয় নাই। প্রাচীনকালের

ফিনিক্স পক্ষীর মতোই তাঁহার চিতাভস্ম হইতে নূতন করিয়া ভারতের বিবেক—সেই ঐন্দ্রজালিক পক্ষী—উত্থিত হইয়াছে। উত্থিত হইয়াছে ভারতের ঐক্যে এবং তাহার মহান্ বাণীতে মানুষের বিশ্বাস। এই বায়ুর কথা ভারতের প্রাচীন স্বপ্ন-দ্রষ্টারা বৈদিক-যুগ হইতে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন। এই বাণীর হিসাব-নিকাশ আজ ভারতবাসীকে অবশিষ্ট মানবজাতির নিকট দিতে হইবে।

দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইস্টিশনে পা দিলাম, অমনি কে বলিল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে। কেন—তাঁহার তো অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু তুমি কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি জয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে বিলাত যাইব, বিলাতে গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম।

অবশেষে বিলাত গিয়া উক্ষপার (Oxford) ও কামব্রজে (Chambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম। বড় বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বেদান্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঐ অধ্যাপকেরা যে সকল চিঠি আমায় লিখিয়াছেন, তাহা আমি ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঝিতে পারা যাইবে বিলাতে বেদান্তের প্রভাব কিরূপ গভীর হইয়াছিল। আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এত বড় একটা কাজ হইয়া গেল—তাহা আমার কাছে ঠিক একটা স্বপ্নের

মত। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি। তাই অনেক সময় ভাবি বিবেকানন্দ কে। বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্ত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।

আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলিকাতায় হেদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই, চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? এস—এবার কলিকাতা শহরে একটি বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব—তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো। বিবেকানন্দ কাতরস্বরে বলিল—ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না; (তাঁহার তিরোভাবের ঠিক ছয় মাস পূর্বের কথা) যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি—তাহারি জন্য ব্যস্ত আছি—আমার অবসর নাই। সেইদিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে লোকটার হৃদয় বেদনাময় ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা—দেশের জন্য ব্যথা। আর্যজ্ঞান আর্যসভ্যতা বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে যাহা ইতর, যাহা অনার্য তাহাই সূক্ষ্মকে, উদারবস্তুকে, আর্যতত্ত্বকে পরাভূত করিতেছে—আর তোমার সাড়া নাই, ব্যথা নাই—বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল। সেই সাড়া এত গভীর যে উহাতে মার্কিন ও য়ুরোপের চৈতন্য হইয়াছিল। ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনায় কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে? দেশের জন্য ব্যথা কি কখন শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।

এখন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে দুই একটা স্থূল কথা বলি। বিবেকানন্দের পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। নরেন্দ্রের পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ দত্ত। বিশ্বনাথ দত্তের বাটী সিমলা, কলিকাতায়। নরেন্দ্ররা তিন ভাই। নরেন্দ্র জ্যেষ্ঠ—মহেন্দ্র মধ্যম—ভূপেন্দ্র কনিষ্ঠ। মহেন্দ্র

পারস্য, তুর্কীস্থান, আরবিস্থান পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার দুর্দমনীয় তেজ ও বীরত্বের কথা শুনিলে চমকিত হইতে হয়। ভূপেন্দ্র সুবিখ্যাত যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক। ভূপেনের হৃদয় তাহার জ্যেষ্ঠের মতো অনলময়। স্বরাজযজ্ঞে সেই অনল ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিতেছে। উহা নিভিবে না। কারণ ব্রহ্মচর্যের ও স্বার্থত্যাগের আহুতি দ্বারা উহা পরিপুষ্ট। নরেন্দ্র ছেলে বয়সে খুব আমুদে ছিলেন। তাস খেলিতে, ইয়ারকি দিতে, তামাক ফুঁকিতে—গান ও বাজনা করিতে, এমন আর দুটি ছিল না। কিন্তু ঐ আমাদের মধ্যে কোন ইতরামি বা কদর্যতা দেখা যাইত না। প্রাণটা খোলা গড়ের মাঠ, যত মাড়িয়ে যেতে পার মাড়িয়ে যাও। এই যৌবনের আমোদ-প্রমোদের সময়ই তাঁহার এক স্পর্শমণির সঙ্গলাভ হইল। রামকৃষ্ণ সেই স্পর্শমণি। রামকৃষ্ণের লীলা সম্বরণের পর নরেন্দ্র 'বিবেকানন্দ' নাম ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—দশ বৎসর ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া ভারত পর্যটন করিলেন, মার্কিনে গিয়া বেদান্ত প্রচার করিলেন। ভারতের গৌরব দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হইল। নরেন্দ্রের মাতা রত্নগর্ভা। মা অমন রত্ন হারাইয়াছেন। হারাইয়াছেন কি? ব্যবহারত হারাইয়াছেন, পরমার্থত হারান নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ-সুতের চরিত্র-সৌরভে ভারত আমোদিত।

উপাধ্যায় [ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু। দুজনেই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী অথচ উগ্র জাতীয়তাবাদী। দু জনেই বিশ্বাস করতেন, ভারতের এই বেদান্ত ধর্মই ভারতে নব-জাগরণ আনবে। দুজনেই বিশ্বাস করতেন যে, এই বেদান্ত ধর্মকে শুধু ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, ভারতের বাইরে ও পাশ্চাত্ত্যে বেদান্তের বিজয় অভিযানের প্রয়োজন আছে। যৌবনে কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের পন্থা বিবেকানন্দের পন্থা থেকে ভিন্ন ছিল। বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত প্রচার করছিলেন উপাধ্যায় তখন ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার করছিলেন। পরে উপাধ্যায় হিন্দুধর্মের প্রতি গভীরভাবে আস্থাবান হ'য়ে শেষ-জীবনে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীতে পরিণত হন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্মের উদ্‌যাপন করবার জন্য বেদান্ত প্রচারে উদ্যোগী হয়ে তিনি বিলাত যাত্রা করেন।—সম্পাদক।

সেটা বোধ হয় ১৮৯২ সাল। চিকাগোর বিশ্বমেলায় তখনো সেই বহুবিখ্যাত ধর্ম-মহাসম্মেলন হয়নি। বোম্বাই থেকে পুণায় ফিরছি আমি। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে কামরায় এসে উঠলেন একজন সন্ন্যাসী। কয়েকজন গুজরাটি ভদ্রলোক সঙ্গে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে তাঁরা সন্ন্যাসীকে বললেন—পুণায় ক'দিন তিনি আমার বাড়িতেই থাকবেন। আমরা পুণায় পৌছালাম। সন্ন্যাসী আমার বাড়িতেই আট-দশ দিন ছিলেন। নাম জানতে চাইলে তিনি বলতেন, তিনি একজন সন্ন্যাসী, আর কিছু নয়। সভায় কোন বক্তৃতা তিনি এখানে দেননি। অবশ্য বাড়িতে প্রায়ই অদ্বৈতবাদ আর বেদান্ত দর্শনের আলোচনা করতেন। সামাজিক মেলামেশা তিনি এড়িয়ে যেতেন। সন্ন্যাসী ছিলেন একেবারে কপর্দকহীন। একটি মৃগচর্ম, একখানি কি দু'খানি কাপড় আর একটি কমণ্ডলু মাত্র সম্বল। ভ্রমণকালে কেউ না কেউ তাঁকে স্টেশনে টিকিট করে দিত।

মহারাষ্ট্রীয় রমণীদের সম্বন্ধে এক উচ্চ আশা পোষণ করতেন স্বামীজি, তাঁরা পর্দার আড়ালে অন্তরীণ নন বলে তাঁদের মধ্যে কোন কোন সম্ভ্রান্ত বংশের বিধবা রমণী ও পুরাতন বৌদ্ধযুগের সাধিকার মতো নিভৃতে ধর্মে ও অধ্যাত্ম সাধনায় নিজেদের উৎসর্গ করবেন। আমার মতো স্বামীজিও এই ধারণাই পোষণ করতেন যে শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় বৈরাগ্যের বাণী প্রচারিত হয়নি বরং গীতায় রয়েছে ফলের কামনা ত্যাগ করে অনাসক্ত কর্মের প্রেরণা।

হীরাবাগের 'ডেকান ক্লাবের' তখন আমি সভ্য। প্রতি সপ্তাহেই একটা করে আলোচনা চক্রে বসতো সেখানে। এই রকম এক চক্রে স্বামীজি আমার সঙ্গী হন। সেই সন্ধ্যায় দর্শনের একটা বিষয়বস্তুর ওপর ৺কাশীনাথ গোবিন্দনাথ এক অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন।

সকলেই তৃপ্ত, মুগ্ধ। আর কারো মনে কোন সংশয় নেই। কিন্তু স্বামীজি উঠে দাঁড়ালেন এবং ইংরাজিতে অনর্গল সেই বিষয়বস্তুর অন্য আর একদিকও যে আছে, তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আমরা সকলেই সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম কী অসাধারণ শক্তির অধিকারী তিনি। এর দিনকতক পরেই স্বামীজি পুণা ছেড়ে চলে যান।

তারপর বিশ্ব ধর্মসভায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় জাতীয়-জীবন-মানসে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে বিশ্ব-জয়ের মুকুট মাথায় প'রে দু'তিন বৎসর পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন স্বামীজি। এরপর তিনি যেখানেই গিয়েছেন—পেয়েছেন দেশবাসীর অকুণ্ঠ সম্বর্ধনা আর তার উত্তরে দিয়েছেন বিস্ময়কর দীপ্ত বক্তৃতা। এই সময়ে কোন কোন খবরের কাগজে তাঁর ছবি দেখলাম। দেখেই মনে হলো ইনি নিশ্চয় সেই সন্ন্যাসী, তিনি ছাড়া আর কেউ নন—যিনি আমারই বাড়িতে ছিলেন। আমার এই ধারণার সত্যতা নিরূপণের জন্য তাঁকে চিঠি লিখলাম, অনুরোধ জানালাম, কলকাতায় ফেরার পথে তিনি যেন একবার পুণায় আসেন।

আবেগপূর্ণ উত্তর এল। বুঝলাম তিনিই সেই সন্ন্যাসী। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ জানিয়েছেন এখন পুণায় যেতে পারছেন না বলে। সেই চিঠি এখন আর আমার কাছে নেই। 'কেশরী মামলা'র পর সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।

এর পর একবার কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বেলুড় মঠ দেখতে এসেছি। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সহৃদয় অভ্যর্থনা জানালেন। একসঙ্গে বসে চা পান করলাম। আলোচনার মাঝে হঠাৎ একসময়ে স্বামীজি পরিহাসচ্ছলে বলে বসলেন—আমি যদি সংসার ত্যাগ করে বাংলায় এসে তাঁর কাজ করি, আর তিনিও যদি সেইরকম মহারাষ্ট্রে গিয়ে আমার কাজ করতে শুরু করেন তো বেশ হয়। তিনি শেষে বললেন, দূরদেশে প্রভাব বিস্তার করা যত সহজ নিজের দেশে তত নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তিনি দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী ছিলেন। এই জড়বাদের যুগেও তিনি দিব্যজ্ঞানের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন। আমেরিকার ন্যায় বস্তুতান্ত্রিক দেশেও তিনি আধ্যাত্মিক প্লাবন আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত বিদগ্ধমণ্ডলীর সম্মুখে তিনি যে মহান্ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দেবগুরু পরমহংসদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাধারণের মধ্যে ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা, কিন্তু তাঁহার মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাণীই ছিল দিব্য-শক্তিপূর্ণ—যাহার শ্রবণমাত্রেই সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

তাঁহার বক্তব্য ছিল যে, হিন্দুধর্ম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং ইহা এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান, কেহই পাপী বা অধার্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। ইহা তাহাদের নিকট দৈববাণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল এবং তাহারা এক অভিনব দৃষ্টি লাভ করিয়াছিল।

এই মহান্ নেতা স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন উক্ত আন্দোলনের পুরোধা। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন প্রথম হিন্দুধর্মের প্রচারক। তিনি মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র আমেরিকায় সত্যের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

আমাদের মহান্ গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ যে কর্ম প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে, অচিরেই তাহা জাতীয় আন্দোলনরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে এবং সমগ্র জাতিই আজ ইহার প্রতি আস্থাশীল। ব্যক্তিগতভাবে কোন কারণে যদি কেহ

ইহার প্রতি উদাসীন হন অথবা এই কর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন তবে সময় আগতপ্রায় যখন তাঁহারা মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া এই মহৎ কর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত কর্ম হইল আন্তর্জাতিক। আমরা এক্ষণে ইহা অনুভব করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আগামীকল্য বা তৎপরবর্তী-কালেই ইহা অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের বোধগম্য হইবে। সমগ্র হিন্দুজাতি এবং ইহার বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই একমত যে, স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতের একজন দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী।

তাঁহার আদর্শ পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন নহে, বিশ্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত-দর্শনের মূলভিত্তির উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার আদর্শ প্রাচীন ঋষি ও দ্রষ্টা পুরুষগণ-কর্তৃক আবিষ্কৃত বৈদিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব সকল সম্প্রদায়েরই সমবেতভাবে এই মহান্ আন্দোলন যাহা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করিতে চলিয়াছে তাহাতে সাহায্য করা উচিত।

সমগ্র বিশ্ব এক্ষণে বুঝিতে শুরু করিয়াছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ কী অদ্ভুত কর্মই না সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। যে-কেহই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন, তিনিই মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত হইবেন এবং তাঁহার জন্মভূমির প্রকৃত সেবা করিতে তিনি সক্ষম হইবেন ; কারণ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিই তাঁহার মাধ্যমে কার্যকরী হইয়াছিল।

১৮৮১ সালে বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন আমরা জেনারেল এসেম্বলি কলেজে সহপাঠী ছিলাম। আমাদের অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেস্টি একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক ও কবি ছিলেন। বিবেকানন্দ বয়সে আমার চেয়ে এক বছরের বড় ছিল, কিন্তু কলেজে সে আমার চেয়ে এক ক্লাস নীচুতে পড়ত।

নিঃসন্দেহে সে একজন প্রকৃতিদত্ত অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন যুবক ছিল, তায় সামাজিক নিঃসঙ্কোচ এবং সংস্কারমুক্ত আলাপ ব্যবহার তাকে সকলের প্রিয় করে তুলেছিল। সুকণ্ঠ গায়ক ছিল বলে সামাজিক সকল অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল সে। আলাপচারী হলেও তার কথাবার্তা ছিল তীব্র ও তীক্ষ্ণ। বুদ্ধির দীপ্তি ঠিকরে পড়ত তার কথায়, সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে সে পৃথিবীর যাবতীয় মেকি জিনিস আর ভণ্ডামিকে আঘাত করত। কিন্তু লক্ষ্য করতাম যে, সিনিসিজ্‌মের আবরণে তার মধ্যে রয়েছে একটি কোমলতম হৃদয়। মোট কথা, তখনকার বিবেকানন্দ সর্ববিষয়েই একজন পুরোদস্তুর বোহেমিয়ান বা শিথিল-স্বভাবের মানুষ ছিল। কিন্তু এই প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সাধারণত যে জিনিসের অভাব—অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি—নরেনের মধ্যে তা ছিল ষোল আনার উপর আঠার আনা। স্বভাবতঃই সে একজন প্রভুত্বপরায়ণ প্রকৃতির মানুষ ছিল। তার চোখের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যা সকলকে সহজেই বশীভূত করতে পারত।

তার বহিরঙ্গ-প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি সকলের কাছেই সুপরিচিত ছিল, কিন্তু যা অতি অল্প লোকের জানা ছিল তা হ'ল ভিতরকার মানুষটি এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্ব। তার সদা অশান্ত ও শিথিল-স্বভাব আচরণের মধ্যে আত্মায় যে বিক্ষোভ ফুটে উঠত, তার পরিচয়

অনেকেরই জানা ছিল না। তার মানস-জগতের ইতিহাসে সঙ্কট-জনক সময়ের এই ছিল সূচনা। এই কালের মধ্যেই তার মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে এক বিচিত্র আত্মানুভূতি যা ভবিষ্যতের মানুষটির জীবনের ভিত্তি রচনা করে দেয়। জন স্টুয়ার্ট মিলের Three Essays on Religion তার আস্তিক্য বুদ্ধিতে বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছিল যা সে লাভ করেছিল ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে এসে। ...এই সময়ে জনৈক বন্ধুর পরামর্শে সে হিউমের সংশয়বাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তার অবিশ্বাস এক সুনির্দিষ্ট দার্শনিক সংশয়বাদে ঘনীভূত হয়। তার আত্মা হ'য়ে উঠল অশান্ত; এলো তার জীবনে শুষ্কতা; ভক্তিমূলক প্রার্থনায় তার মন আর তৃপ্তি পায় না এখন, এক মানসিক ক্লান্তিতে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল তার সমগ্র সত্তা। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি তার আকর্ষণ বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি তার জীবনের সেই সঙ্কটক্ষণে একমাত্র সঙ্গীতই তাকে উজ্জীবিত রাখত এবং এরই মধ্যে সে যেমন. খুঁজে পেত অদৃশ্য বাস্তবের এক অলৌকিক অপার্থিব অনুভূতি। সঙ্গীত তার চোখ দুটিকে অশ্রুসিক্ত করে তুলত।

এই যখন তার মনের অবস্থা সেই সময় আমাদেরই এক বন্ধুর সঙ্গে নরেন একদিন আমার কাছে এলো। এই বন্ধুটি তাকে হিউম ও হার্বার্ট স্পেন্সার পড়তে বলেছিল। তার আগে আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয় সামান্যই হয়েছিল। কিন্তু এখন সে নিজেকে আমার আছে অবারিত করে দিল, তার সকল সংশয় ও নৈরাশ্যের কথা সে অকপটে আমার কাছে ব্যক্ত করল। Ultimate Reality বা পরব্রহ্মের অস্তিত্বে সন্দিহান যুবক নরেন্দ্রনাথের এই মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। সেই অবস্থায় আস্তিক্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে পারে এমন কি দার্শনিক গ্রন্থ আছে, সে আমার কাছে জানতে চাইল। আমি কতকগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থের উল্লেখ করলাম। কিন্তু আমি বুঝলাম এই জাতীয় নীরস গ্রন্থ পাঠে

তার ধৈর্যের অভাব। পুঁথির কথা নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের প্রতিই তার আগ্রহ। জীবন থেকে জীবনের উজ্জীবন, চিন্তা থেকে চিন্তার উদ্দীপন—এই ছিল তখন তার আকাঙ্ক্ষিত।

আমি গভীরভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম, কারণ আমার মনে হ'ল, এই যে জটিল সমস্যার সম্মুখীন আজ সে হয়েছে, তাকে সে আন্তরিকতার সঙ্গেই আঁকতে থাকবে। আমি প্রথমে তাকে শেলির কবিতা পড়তে বললাম। শেলির Hymn to Intellectual Beauty কবিতাটি, সেই সঙ্গে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের আদর্শ ও ভাবীকালের মানুষের জন্য গৌরবময় স্বর্ণ-যুগের স্বপ্ন নরেনের মধ্যে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করল। দার্শনিকগণের বিজ্ঞ চিন্তা তাকে এতটা আলোড়িত করতে পারেনি। বিশ্বজগৎ তখন তার কাছে আর প্রাণহীন প্রেমহীন যন্ত্রমাত্র বলে প্রতীয়মান হ'ল না। সে যেন এর মধ্যে একটি আত্মিক আদর্শের সংহতি খুঁজে পেল। তখন আমি নরেনকে বললাম যে, শেলি যা কল্পনা করেছেন তার চেয়েও উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্য আছে—তা হোল—The unity of the Para-Brahman as the Universal Reason. আমি নিজেই তখন তিনটি প্রধান বিষয়কে একত্রে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টায় রত ছিলাম, যথা—বেদান্তের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, হেগেলের দার্শনিক মতবাদ আর ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। বিশ্বপ্রকৃতি, জীবন, ইতিহাস – এইসবের ভিতর দিয়েই ক্রমবর্ধমান ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় অপরিবর্তনীয়ের রহস্য। বিশুদ্ধ বিচারে কষ্টি পাথরেই যাচাই করে নিতে হবে সমস্ত নৈতিক, সামাজি ও রাজনৈতিক মতবাদ ও সত্যকে। একজন তরুণ অনভিজ্ঞ স্বাপ্নিকের আগ্রহ নিয়ে আমি প্রবলভাবে বিশ্বাস করতাম যে, এক নূতন বৈপ্লবিক রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার - যার সংকেত বাক্য সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা - ফলে পৃথিবীর মানুষ একদিন যুক্তিহীনতার দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবে। একদিকে বিশ্বজনীন বিচার-বুদ্ধি আর অন্যদিকে negation of the individual as

the principle of moral. এই ভাব নরেনের বুদ্ধিকে সন্তুষ্ট করল এবং এর দ্বারা চালিত হয়ে সে যে তার সংশয়বাদ ও জড়বাদকে জয় করতে সক্ষম হবে, সে-বিষয়ে সে এখন সুনিশ্চিত হ'ল। এর চেয়ে বেশি কথা, সে যেন জীবনের দিগ্‌দর্শন যন্ত্রটি খুঁজে পেল। কিন্তু এতেও তার মনে শান্তি এল না। সংঘাত এখন তাঁর আত্মার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হ'ল, কারণ বিশুদ্ধ বিচারের পথ অনুসরণ করতে গেলে তার বোহেমিয়ান স্বভাব এবং তার শিল্পীজনোচিত সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতাকে দমন করতে হয়। তার মানস-প্রকৃতির গঠন এমনই ছিল যে তা করতে গেলে তার স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিসমূহকে, এমন কি তার আত্মাকে পর্যন্ত বিনষ্ট করতে হয়।

ক্রমে নরেনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব একটি আশঙ্কাজনক পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়াল। একদিকে বিচারবোধ আর অন্যদিকে ভাবোচ্ছ্বাস ও ব্যবহারিক জ্ঞান, এদের মধ্যে কে জয়ী হবে? এখন তার ধারণা হোল যে, ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা বিমোহিত হওয়া অথবা যৌবন-সুলভ সুখভোগে প্রমত্ত হওয়া শুধু ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সামিল নয়, উহা সত্যই স্থূল এবং অপবিত্র। এই সময়টাই ছিল নরেনের জীবনের অগ্নিপরীক্ষার সময়। তার গানের সঙ্গীদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের হাব-ভাব ও শৈথিল্যজনক নৈতিক-আচরণের জন্য নরেন তাদের প্রতি প্রবল ঘৃণার ভাব পোষণ করত। কিন্তু সেই যে তার সদানন্দময় প্রকৃতি, তাই তার সমস্ত সত্তাকে তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কোন কোন সন্ধ্যায় গানের মজলিশে যাবার সময় আমি যখন মাঝে মাঝে তার সঙ্গী হতাম তখন সে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করত।

গোড়া থেকেই আমি তার মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম একটি উন্নত, আগ্রহবান এবং বিশুদ্ধ প্রকৃতি—সে প্রকৃতি গভীরভাবে উত্তেজিত অনুভূতি দ্বারা সর্বদা স্পন্দিত ছিল। তথাকথিত নীতিবাগীশ সে

ছিল না, বা কোন কিছু দ্বারা সহজে প্রভাবিত হবে এমন প্রকৃতির যুবকও সে ছিল না।...কিন্তু তার আত্মার গভীরতম প্রদেশে ভয়ঙ্কর অভিলাষ আর আলেয়ার মতো কল্পনা, এই দুই-এর সংগ্রাম নিয়তই তার সত্তাকে আলোড়িত, মথিত করছিল। এই সংগ্রাম আর দাসত্বের হাত থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে এমন একটি ক্ষমতার সন্ধান দেখার জন্য সে আমাকে বার বার ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করতো। আমি তাকে বিশুদ্ধ বিচার (Pure Reason)-এর শ্রেষ্ঠত্বের দিকেই নির্দেশ করতাম এবং আত্মার সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির একাত্মীয়তা বোধ করতে পারলে যে অনির্বচনীয় শান্তি লাভ করা যায়, বিশেষ জোরের সঙ্গে সে কথা বলতাম।...সে আমার কাছে অকপটে স্বীকার করত যে যদিও সে বিশ্বজনীন-বোধের দ্বারা বুদ্ধিকে জয় করেছে, কিন্তু অহং-ভাব (Individual ego) থেকে সে কিছুতেই মুক্ত হতে পারেনি এবং এর ফলে বিবর্ণ রক্তহীন বিচার-বুদ্ধি তাকে প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না। সে জানতে চাইল আমার ধ্যান-ধারণা তার ব্যবহারিক জ্ঞানকে সন্তুষ্ট করতে পারবে কি না ; অথবা তার মুক্তির জন্য দৃশ্যত মধ্যস্থতা করতে পারবে কি না ; মোট কথা, সে চাইল রক্ত-মাংসের বাস্তবতা, যাকে রূপ ও নামের মধ্যে দেখা যায় ; তার আত্মা যেন আর্তস্বরে ক্রন্দন করে উঠল : কে আছ, আমাকে বাঁচাও, টেনে তোলো, রক্ষা করো। সে আজ সেই শক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল যা তার মনের শূন্যতাকে পূর্ণ করে তুলতে পারবে। সে চাইল বিশুদ্ধতা ও পূর্ণতার আধার এমন একজন গুরু বা আচার্য যিনি তার বিক্ষুব্ধ অশান্ত আত্মার সমস্ত আলোড়নকে শান্ত করে দিতে পারবেন।

আমি এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলাম, এবং ভেবে পেলাম না কি উপায়ে আমি তার এই বিক্ষুব্ধ আত্মার দাবি মেটাতে পারি। নরেন তখন ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ও প্রচারকদের আশ্রয় করল এবং তাদেরও সে জিজ্ঞাসা করতো, প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের গোচরীভূত হয় এমন কোন

আদর্শ আছে কি না, সত্যকে দর্শন করা যায় কি না, তার মুক্তিলাভ হয় এমন কোন ক্ষমতা আছে কি না। তার জিজ্ঞাসার মধ্যে অবশ্য প্রচ্ছন্ন থাকতো সক্রেটিসোচিত পরিহাসের সুর। যাই হোক্, ব্রাহ্ম সমাজ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। অনেক রকম আচার্যের সঙ্গ সে করল, অনেক পন্থার অনুশীলনও করল—কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবশেষে সেই ব্যাকুল আত্মার অভিসার একদিন তাকে নিয়ে এলো দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের কাছে। মন তার তখনো পর্যন্ত সংশয়মুক্ত হয়নি। তিনি এমন গভীর প্রত্যয়ের সুরে তার সঙ্গে কথা বললেন যা পূর্বে কেউ বলেনি এবং তাঁর শক্তি দ্বারা তার মনের ক্ষতস্থানগুলি নিরাময় করে দিলেন। তবু তার বিদ্রোহী সত্তা কিছুতেই তাঁকে আচার্য বলে স্বীকার করতে চাইল না। চিত্তের এই শান্তি—প্রকৃত শান্তি, না বিভ্রম ? এ সন্দেহ জাগল তার মনে। ক্রমে তার মনের সন্দেহ ঘুচে যায়—তার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পরাজিত হয় এক অতীন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা। আমার দৃষ্টিপথেই এই আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছিল। আমার চোখের সামনে আমারই মতন একজন তরুণ, প্রবল বৈদান্তিক তথা হেগেলিয়ান, তথা বিপ্লবী, যখন ধর্মীয় উল্লাস ও কালী আরাধনায় মজে গেল, তার তখনকার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। জন্ম থেকেই যে মূর্তি-পূজার বিরোধী ও স্বাধীনচেতা মানুষ ছিল, সৃজনী প্রতিভা-সম্পন্ন ও অন্যকে যে সহজেই প্রভাবিত করতে পারত, এমন কি, বশেও আনতে সক্ষম ছিল—সেই নরেন্দ্রনাথ কিভাবে দুর্জ্ঞেয়, অতিপ্রাকৃত রহস্যময়তার জালে আটকে পড়ল, তা' আমার কাছে একটি প্রহেলিকা বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, আমার বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে যার কুল-কিনারা আমি পাইনি। যাকে ভালবাসতাম এবং যাকে আজ হারালাম, তাকে এখন আরো গভীরভাবে ভালবাসলাম এবং দুঃখবোধ করলাম তার রূপান্তরের জন্য। আমার কাছে ইহা তখন আদর্শভ্রষ্টতা বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।

যে মহাপুরুষ বিবেকানন্দ এই পৃথিবীতে সশরীরে বর্তমান ছিলেন, আজ তাহার কয়েক মুষ্টি ভস্মমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই গঙ্গার তীরে নির্জনে যে আলোকশিখা গত পাঁচ বৎসরকাল ধরিয়া জ্বলিতেছিল, আজ তাহা নির্বাপিত। যে কণ্ঠস্বর দেশে দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল আজ তাহা নীরব। এক উদ্দাম ঝটিকার বেগে জীবন বিকশিত হইয়াছিল এই মহান আত্মার মধ্যে। কিন্তু সেই জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল শান্তির মধ্যে। সান্ধ্য-সঙ্গীত শেষ হইলে পরে মৃত্যুর আশীর্বাদ নামিয়া আসিল এক অমাবস্যা রজনীতে। ক্লান্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহভার তিনি রক্ষা করিলেন এবং ক্রমে মহাসমাধিতে বিলীন হইয়া গেল তাঁহার সেই বিজয়ী আত্মা।

সবেমাত্র তিনি কর্মসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে বিবেকানন্দের মৃত্যু হইল। বিবেকানন্দ আসিয়াছিলেন মানুষ গড়িবার জন্য এবং সেই কার্যে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কি অমানুষিক পরিশ্রমই না তিনি করিয়াছিলেন, এবং এই দুরূহ কার্যের জন্য তাঁহাকে পর্যায়ক্রমে আচার্য, পিতা এবং শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। মৃত্যুর দিনের অপরাহ্ণটি পর্যন্ত তিনি এইভাবে ব্যয় করিয়াছিলেন।

কার্যে সিদ্ধিলাভ কিংবা নেতৃত্ব ইহার কোনোটিতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারের সময় বহু বিত্তশালী লোক তাঁহার বন্ধু হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে তাঁহাদের মধ্যে রাখিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের বিলাসবহুল জীবনের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র আকর্ষণবোধ করিতেন না। তাঁহার কাছে ভিক্ষুকের ছিন্নবাস, কলিকাতার

স্বল্পপরিসর রাস্তা এবং তাঁহার স্বদেশবাসীর অক্ষমতা সবচেয়ে প্রিয় ছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেরা তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিল কেন? কেন সে-দেশের লোক তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধর্মপ্রচারকদের একজন বলিয়া সম্মান করিয়াছিল? তিনি ত' ব্যক্তিগত কোন ধর্ম প্রচার করেন নাই। তিনি ত' কোথাও বলেন নাই হিন্দুধর্মই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কিংবা আর সব ধর্ম নিকৃষ্ট। কিংবা কোন একটি বিশেষ মতবাদ তিনি জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই। বরং একথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া হিন্দুধর্ম গঙ্গোত্রীর নির্মলধারার মতো প্রবাহিত হইয়াছিল এবং নিতান্ত বুদ্ধিজীবিরাও সেই ধারায় স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। উপনিষদ ছাড়া তিনি অন্য কোন শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দিতেন না। বেদান্ত ভিন্ন তিনি অন্য কিছু প্রচার করিতেন না। মানুষের অন্তরে গিয়া প্রবিষ্ট হইত সেই বাণী, কারণ সেই বাণী আসিয়াছিল এমন একজন ধর্মাচার্যের নিকট হইতে যিনি মত প্রকাশে ভয় করিতেন না।

তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জানিতেন এক সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ বলিয়া। তীব্র ত্যাগ ছিল সেই সন্ন্যাসের অবলম্বন এবং তাঁহার সরল উপদেশের মধ্যে সর্বদা প্রতিধ্বনিত হইত এই তীব্র বৈরাগ্য। একদা তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি যেন আমার গুরুর ন্যায় যথার্থ সন্ন্যাসীর মতো মৃত্যুকে বরণ করিতে পারি; কাঞ্চনে আসক্তি নাই, কামিনীতে আসক্তি নাই, যশে স্পৃহা নাই এবং এই তিনটির মধ্যে যশস্পৃহা হইল সবচেয়ে মারাত্মক।' এমন যে বৈরাগ্যবান পুরুষ, তাঁহার মধ্যে দেখিয়াছি একজন সতর্ক গৃহস্থকে—যে-গৃহস্থ সঞ্চয় করিতে ব্যস্ত, যে গৃহস্থ বস্তুর ব্যবহার শিখিতে এবং শিক্ষা দিতে আগ্রহবান এবং যাহার সকল কর্মপ্রচেষ্টা জীবনকে শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া গঠন করিতে ব্যগ্র। তাঁহার বৈরাগ্য এবং ত্যাগের মধ্যে তাই জীবনকে উপেক্ষা ছিল না।

বিবেকানন্দ একাধারে ছিলেন ভারতের শ্রেয়োধর্মী অধ্যাত্মধারণার মূর্ত বিগ্রহ ও একজন বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক। জাতীয়-জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁহার আবির্ভাব এবং তাঁহার কালে যে নূতন যুগের সূচক হইয়াছে, তিনি সেই যুগকে বরণ করিয়া লইতে দ্বিধা করেন নাই। ভারতের ঐতিহ্যে তাঁহার আত্মবিশ্বাস ছিল এবং ইহার প্রাচীন রীতিনীতির তিনি ছিলেন একজন নৈষ্ঠিক পূজারী। ভারতের জাতীয়-জীবনের পরিণতি যেন তাঁহার মধ্যেই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল এবং তিনি এক নূতন জীবন-বোধের সূচনা করিয়া উনবিংশ শতকের জাগরণকে অনেকাংশে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যেই যেন আমরা ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ বেদ পাইয়াছিলাম। ভারতের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাঁহার মূল্য নির্ণীত হইবার সময় এখনো আসে নাই। কারণ ধর্ম হইল জীবন্ত বীজের সমান, সেই বীজ তিনি সবেমাত্র বপন করিয়া গিয়াছেন, ফসল তুলিবার সময় এখনো আসে নাই।

কিন্তু একমাত্র মৃত্যুর ভিতর দিয়াই আমরা দেশ-প্রেমিককে পাইয়া থাকি। আজ তিনি যখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে হইতে চলিয়া গিয়াছেন, যখন শ্মশানে তাঁহার সমালোচকদের কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, তখনই শুনি সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর যাহার ভিতর দিয়া স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল এবং সমগ্র জাতি একমন হইয়া যাহা শুনিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা এমন একটি মনের পরিচয় পাই যাহা পৃথিবীর নানা দেশের নানা লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার অসাধারণ সুযোগ পাইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই-ই তন্ন তন্ন করিয়া জানাইয়াছেন এবং সর্বত্রই উচ্চ এবং নীচ সকলের দ্বারাই তিনি সম্বর্ধিত হইয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি যাহা কিছু দেখিত, তাহারই মর্মে প্রবেশ করিত। কতবার না তিনি বলিয়াছিলেন—'আমেরিকাবাসীরা শূদ্রের সমস্যা সমাধান করিবে—কিন্তু তাহার জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে

হইবে।' কিন্তু পরবর্তীকালে, দ্বিতীয়বার যখন তিনি পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার এই মতের পরিবর্তন হয় এবং তিনি পাশ্চাত্ত্যের অপরিসীম ধনলুব্ধতা ও বৈশ্যপ্রবৃত্তির কঠোর নিন্দা করিয়া বলেন যে, উহার তুলনায় এশিয়াবাসীদের নৈতিক মানদণ্ড যথেষ্ট উন্নত। তাঁহার নিকট প্রত্যেক জাতির মহত্ত্ব স্বীকৃত হইত এবং তিনি বলিতেন যে, সেই মহত্ত্বের আলোকেই সেই জাতিকে চিনিয়া লইতে হইবে। তেমনি ভারতবর্ষকে চিনিতে এবং বুঝিতে হইলে, স্বামীজি বলিতেন, ভারতের যুগযুগান্তরের মহত্ত্বের ইতিহাস জানিতে হইবে। দরিদ্র, সর্বরিক্ত, পরাধীন ভারত চিরকাল কিন্তু পরাধীন ছিল না, এবং চিরকাল উহা পরাধীন থাকিবেও না। কিন্তু ইহার যাহা কিছু মহত্ত্ব তাহা ভারতের সকল অবস্থার মধ্যেই অটুট রহিয়াছে। কী সেই মহত্ত্ব, যাহার জন্য ভারতে সারা এশিয়ার মুকুটমণি, তাহার দিকে বার বার অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া স্বামীজি বলিতেন, ভারতবাসীকে যদি প্রাচীন যুগের সহিত নবীন যুগের সমন্বয় সাধন করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভারতের চিরন্তর মহত্ত্ব সম্পর্কে সজাগ হইতে হইবে। তাঁহার দেশবাসীর জন্য বিবেকানন্দ কী ভবিষ্যদ্বাণী রাখিয়া গিয়াছেন? মৃত্যুকালে যে গৈরিকবাস তিনি পিছনে ফেলিয়া গিয়াছেন, জাতীয় কোন্ বৈশিষ্ট্যে সন্ন্যাসীর সেই বস্ত্র রাঙাইয়া লইয়াছিলেন? দণ্ডের উপর সেই বস্ত্রকে পতাকা করিয়া আজ আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। বিবেকানন্দ ছিলেন সেই মানুষ, যে মানুষ জীবনে অকৃতকার্যতা কাহাকে বলে তাহা জানেন না। আজীবন তিনি ছিলেন শক্তিমন্ত্রের অভীঃমন্ত্রের উপাসক। নেতিবাচক কোন কিছুই তাঁহার চিন্তার পরিমণ্ডলে থাকিতে পারিত না। উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা ছিল তাঁহার চরিত্র হইতে সুদূরতম জিনিস। কাহারো কর্তৃত্বই তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না— এমনই প্রচণ্ড রজোগুণের আধার ছিলেন তিনি। একমাত্র আচার্যের ভূমিকা ভিন্ন অন্য কোনভাবেই তিনি কোন বিদেশীর সঙ্গে সাক্ষাত

করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এমনই তীব্র ও তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর স্বাজাত্যভিমান। আমার এক ইংরেজ বন্ধু. যিনি স্বামীজির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, 'স্বামীজির যাহা কিছু প্রতিভা, তাহা তাঁহার মর্যাদার মধ্যেই নিহিত। রাজকীয় মহিমায় দীপ্ত সেই মর্যাদা।'

স্বামী বিবেকানন্দ রামমোহন রায়ের মত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের নিকট আসিবে চাটুকার হিসাবে নহে, ভৃত্য হিসাবে নহে, আসিবে আচার্য হিসাবে, গুরু হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে। সেই যোগ্যতা তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। তিনি কখনও কাহারও নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা অবনমিত করেন নাই। কতবার না তিনি গভীর ঘৃণার সহিত মন্তব্য করিয়াছেন— 'ইংরেজ আমাদের ধর্মের বিষয় শিক্ষা দেবে। গোষ্পদে সমুদ্র যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়ে ইংরেজদের ধ্যান-ধারণাও তেমনি। ভারতের স্থান এখানে পৃথিবীর শীর্ষদেশে—একথা আমি হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করিয়া বলিতে পারি।'

ভারতবর্ষে সব-কিছুই বিবেকানন্দের চক্ষে মহিমামণ্ডিত হইয়া ফুটিয়া উঠিত। ইহার জনগণের দুঃখ-দৈন্য ও দারিদ্র্যে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে আমি উল্লেখ করিব। একবার জাহাজে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ভারতবর্ষের পুরাণ সম্পর্কে একটি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে। স্বামীজি এমন প্রচণ্ড যুক্তি সহকারে তাহার প্রতিবাদ করিলেন যে, তাহা দেখিয়া ভদ্রলোক রীতিমত অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সেই সময়ে ভারতের পুরাণাদি শাস্ত্র, ইহার প্রাচীন বেদ ও উপনিষদ্ সম্পর্কে তিনি এমন সারগর্ভ আলোচনা করিলেন যাহা শুনিবার পর সেই বিদ্রূপকারী ইংরেজ একেবারে নিরুত্তর হইয়া গেল। ভারতের স্বার্থে যে কেহ আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, স্বামীজি নির্মম চিত্তে তাহাকেই প্রতি-আঘাত হানিয়াছেন। সে যদি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুও হইত তাহা হইলেও তিনি কুণ্ঠিত

হইতেন না। ভারতের সবকিছুই তাঁহার চিরন্তন, পবিত্র। তাই না তিনি বলিতেন—'ঈশ্বরে যাঁহারা পৌঁছাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ভারতবর্ষের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক মহিমার চির-পুণ্যক্ষেত্র এই প্রাচীন দেশ।' এইজন্যই তিনি তাঁহার পাশ্চাত্ত্য শিষ্যদিগকে বলিতেন—'যদি তোমরা ভারতবর্ষকে ভালবাস, তাহা হইলে ইহার সব কিছুকেই ভালবাসিতে হইবে, তোমাদের খুশীমত ভালবাসিলে চলিবে না।'

ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতের শিবকে উপলব্ধি করিতেন, তাহাদের ব্যথা তাঁহার বক্ষে ভীষণভাবে বাজিত, তাহাদের দুঃখে তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতেন। পাশ্চাত্ত্যের ভোগ-বিলাসের শ্রেষ্ঠতম জিনিস তাঁহার চরণে অর্ঘ্যের মত প্রদত্ত হইয়াছিল, তথাপি তিনি সেই সরল আকিঞ্চন হিন্দু-সন্ন্যাসীই ছিলেন এবং তাহাতেই তিনি গর্ববোধ করিতেন। তাঁহার জীবনযাত্রার সরলতা তাঁহার চরিত্রকে এক নিরুপম মাধুর্য প্রদান করিয়াছিল। সরলচিত্ত ছিলেন বলিয়া তিনি দুর্বলচিত্তের মানুষ ছিলেন না। সকল রকম দুর্বলতাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। সেইজন্য তিনি তাঁহার জাতির জন্য, জাতির প্রত্যেকটি লোকের জন্য একটি মন্ত্রই রাখিয়া গিয়াছেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'।

স্বামী বিবেকানন্দ

সুভাষচন্দ্র বসু

স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন। আমার সময়ের ছাত্রসমাজ স্বামীজির রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা যেরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কাহারও দ্বারা হয় নাই—তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সহিত একযোগে না দেখিলে স্বামীজিকে যথার্থভাবে বিচার করা যাইবে না। স্বামীজির বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমান মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাকে হিন্দুধর্ম বা ইসলামের বিশেষ আবাসভূমি হইলে চলিবে না—তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের একত্র বাসভূমি হইতে হইবে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যে বাণী—ধর্মসমন্বয়, তাহা ভারতবাসীকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বামীজি দুইটি জিনিসের উপরে জোর দিতেন—ত্যাগ ও চরিত্রগঠন। তাগ ব্যতীত কোন উপলব্ধিই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে মহাপুরুষের অভাব নাই—ভারতে এমন সব প্রতিভাশালী ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা অন্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সমকক্ষ। যাহা অতি প্রয়োজনীয়, তাহা এই - জনসাধারণের চিত্তের উদ্বোধন চাই। এই জন্যই স্বামীজি বলিতেন : মানুষ গড়াই আমার কাজ।

স্বামীজি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি মহান্। তাঁহার শিক্ষায় দেশবাসী অভূতপূর্ব আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ লাভ করিয়াছে।

* বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ৬৯তম জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে [ফাল্গুন, ১৩৩৭] আহূত জনসভায় সভাপতি কলিকাতার তদানীন্তন মেয়র শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণ।—সম্পাদক।

অমন মনীষার জন্মস্থান এই কলিকাতা মহানগরী। আজ পর্যন্ত যত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও সাধকের এখানে জন্ম হয়েছে নিঃসন্দেহে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন ভারত-আত্মার মূর্ত বিগ্রহ ; ভারতের আধ্যাত্মিক আস্পৃহা ও সাধনার প্রতীক-স্বরূপ। যে শাশ্বত আত্মা অভিব্যক্ত হয়েছে ভক্তের গানে, মুনি-ঋষিদের দর্শন উপনিষদে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায়, বিবেকানন্দ তার দিয়েছেন বাণীরূপ, করেছেন সোচ্চার।

তিনি যে মহত্ত্বের শিখরে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন ; তাতে আমরা আনন্দিত। কিন্তু যে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম, যে কঠোর পরিশ্রমের অনুস্যৃতি ও ভাগবত কর্মে আপনাকে উৎসর্গ করার অফুরন্ত উৎসাহ, যা বিবেকানন্দকে এই মহত্ত্ব দান করেছে, তা সত্যই চমকপ্রদ। বিবেকানন্দের এই বন্ধুর পথে উত্তরণ অধ্যাত্ম জীবনের তীর্থগামী সকল পথিক ও কর্মীদের উৎসাহিত করবে ও তাঁদের শিক্ষাপ্রদ হবে।

এই কলিকাতাতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এখানকার বিদ্যালয়েই তাঁর অধ্যয়ন। তখনকার দিনের সর্বজনপ্রিয় স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডেভিড হিউম ছিল তাঁর প্রিয় পুস্তক - কিন্তু অপরিতৃপ্ত মন তাঁর অতৃপ্তির তাড়নায় সংক্ষুব্ধই হয়ে চলেছিল। এমনি এক মুহূর্তে তিনি পেলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্য। দর্শনের পরস্পরবিরোধী নিগূঢ় তত্ত্বে অবিসম্বাদী সত্যের অস্পষ্ট ধারণায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যখন তিনি রামকৃষ্ণের কাছে এসে প্রশ্ন করলেন: 'আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' উত্তর এল: 'হ্যাঁ, তোকে যেমন দেখছি, তাঁকেও তেমনি দেখতে পাই—আরও পরিষ্কার, আরও

স্বচ্ছ।' তর্কের দ্বারা নয়, অনুমান দ্বারা নয়, অন্তরের উপলব্ধি দিয়ে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন, সারা জীবন ধরে তিনি যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন সেই অতীন্দ্রিয় জগতের অধীশ্বরকে। এই পরম সত্যই বিবেকানন্দের জীবন প্রবাহে আনলো আমূল পরিবর্তন।

তর্কবিতর্কের দ্বারা, অনুমান, বিশ্লেষণ প্রভৃতি বুদ্ধির ব্যাখ্যা দ্বারা নানা শাস্ত্রের অনুশীলন, ধর্ম বলে নয়, একমাত্র ব্রহ্মের উপলব্ধিকেই আমাদের দেশ পরম ধর্ম বলে জানে। এইটাই আমাদের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য।

আমরা উপনিষদেই পেয়েছি : পার্থিব এই উজ্জ্বল রূপে বা তার গভীর কালো অন্ধকারে বিভ্রান্ত হ'য়ো না—এসবের উপরে আছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তাঁকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে, মন দিয়ে জানতে হবে। জীবনের অভিজ্ঞতায় মিশিয়ে নিতে হবে। এই হচ্ছে ভারতের শাশ্বত বাণী। কুসংস্কার, অন্ধ গোঁড়ামি প্রভৃতিকে ভারত কোন দিনই প্রাধান্য দেয়নি।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগোর ধর্মসম্মেলনে তিনি ঘোষণা করলেন : 'সব ঈশ্বরের উপরে আছেন এক ঈশ্বর, সব ধর্মের উপরে রয়েছে এক ধর্ম, আমাদের যাবতীয় ধর্মানুরাগ, ধর্মানুশাসন, ধর্মমত এবং অনুষ্ঠানের উর্ধ্বে এমন একটা কিছু আছে যা এই সকলকে অতিক্রম করতে পারে, আর সেই ধর্মই সমস্ত পৃথিবীকে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম।'

ধর্ম মহাসম্মেলনে তিনি প্রচার করলেন শাশ্বত ভারতের বাণী, শাশ্বত ধর্মের বাণী ; যে বাণী বলে, ঈশ্বর এক,—এক এবং অদ্বিতীয়। তাই, গোঁড়ামির প্লাবনে যখন দেশ প্লাবিত হয়, তর্ক-বিতর্কের ঝড়ে যখন দেশ উদ্‌ভ্রান্ত হয়, ধর্মের ব্যাখ্যায় যখন ধার্মিকেরা উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন, তখন সহনশীলতা এবং হৃদয়বোধের জাগৃতির একান্ত প্রয়োজন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেছেন : 'তোমরা সকলেই নির্বোধ. তোমরা জান না

সেই পরম সত্য কি। সব ধর্মের সারভূত সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। প্রত্যেকেই সেই পরম সত্যে পৌঁছানোর পথ খুঁজছে।' এই হচ্ছে বুদ্ধের সত্য, এই হচ্ছে বিবেকানন্দ-জীবনের নির্যাস।

সেই পরম সত্তার অনুভূতিতে আত্মতৃপ্ত বিবেকানন্দ যখন আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তখন রামকৃষ্ণ বলেছিলেন : 'তোর লজ্জা করে না, তুই কেন এত বেশী করে নিজের মুক্তি খুঁজছিস ? ঈশ্বর রয়েছেন সব মানুষের সত্তায়। মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করতে হবে।'

মনে হয়, তার নরেন্দ্র নামকরণ কেবলমাত্র একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। তিনি মানব-সত্তার অবতার। তিনি ছিলেন 'নর-সখা', 'নর-নারায়ণ।' তিনি মানুষের দুর্বিষহ জীবন-জ্বালা অনুভব করেছিলেন, তাই তিনি মানুষকে দিতে চেয়েছিলেন সুন্দর জীবন। আমরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে, শৌর্যে-বীর্যে ভাস্বর হয়ে উঠি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে বুভুক্ষার তাড়নায় মরতে দেখে, তাদের অসহায় আর্তনাদ শুনে তিনি নিজের মঙ্গল বা আত্মমুক্তির প্রার্থী হতে পারেননি। তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন—মানুষের সেবার পথই ভগবানে পৌঁছাবার পথ।

তিনি আমাদের মননে জাতীয়তাবোধের ধর্ম অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছেন। সে স্বাজাত্যবোধ কোন সংকীর্ণ অর্থে নয়। সে ধর্ম—মানবতার ধর্ম। তাঁর ধর্ম আমাদের শিখিয়েছে প্রতিটি মানুষকে আত্মার আত্মীয়রূপে চিন্তা করতে, একই পরিবারের আপনজনরূপে গ্রহণ করতে। এ হচ্ছে মানুষ তৈরীর ধর্ম, মানবতার ধর্ম। যদি আমরা সেই 'পরম'-এর কাছে পৌঁছাতে চাই, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে হৃদয়ে অনুভব করতে ইচ্ছা করি, তাহলে দুর্গতদের সেবায় আমাদের

আত্মনিয়োগ করতে হবে, তাদের ক্লেশমুক্ত করাই হবে আমাদের কর্তব্য। এ হচ্ছে সেই আর্তের আহ্বান, আমাদের তাতে কর্ণপাত করা উচিত।

দেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে বর্তমানে আমরা এক সংকটময় মুহূর্তের সম্মুখীন হয়েছি। অনেকেই চিন্তা করছেন, আমরা বুঝি এসে দাঁড়িয়েছি অন্ধকারময় মৃত্যুগহ্বরের সামনে। মূল্যবোধের অবনতি, ব্যাপক পলায়নী মনোবৃত্তি, আর গণ-উন্মাদনার বিকার আমাদের গ্রাস করেছে। নৈরাশ্যে আর হতাশায় উঠেছে জীবনের নাভিশ্বাস। মানুষের নিজের আত্মার উপর অবিশ্বাসই মানুষের সম্মান, মর্যাদাকে ধূলাবলুণ্ঠিত করছে। এ হচ্ছে মানুষের অপমান, মানব-প্রকৃতির অসম্মান। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণে আসে বিবেকানন্দের বাণী। তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদে আস্থাবান হবার নির্দেশ দিয়ে যা বলেছিলেন, তারই সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, 'মানুষের আছে অপরিমেয় অধ্যাত্ম-সম্পদ, তার আত্মার মধ্যে নিহিত রয়েছে পরম সত্য, মানুষের বৈশিষ্ট্য তুলনাহীন। জগতে কোন কিছু অপরিহার্য নয় এবং আমরা আমাদের সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের দ্বারাই সমূহ বিপদ এবং নিদারুণ অক্ষমতাকে দূর করতে পারি।' তিনি দুঃখকে জয় করার জন্য আমাদের দিয়েছেন মানসিক-বল, অধ্যাত্ম-শক্তি, হতাশায় দিয়েছেন —আশা। তিনি আমাদের বলেছেন, 'শুধু মাত্র বাইরের রূপ দেখে ভুলো না, জগতের একটা উদ্দেশ্য আছে, আর তোমার উচিত তার সহযোগিতা করা, তার সঙ্গে হাত মেলানো।'

আত্মত্যাগ, সাহস, সেবা এবং নিয়মানুবর্তিতা—এইসব ব্রতের দীক্ষা পাই আমরা বিবেকানন্দের জীবন থেকে।

মৃত্যুর দিনকয়েক পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে ডেকে বলেছিলেন : 'এদের দেখো'। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় রামকৃষ্ণ 'এদের, বলতে যাদের নির্দেশ করেছিলেন তারা বিবেকানন্দের বয়োজ্যেষ্ঠ। রামকৃষ্ণের

সেই নির্দেশ ছিল ভবিষ্যদ্বাণীর মত। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন—অধ্যাত্ম-চেতনার উদ্গাতা এবং সমাজ-সেবার আদর্শে প্রোজ্জ্বল এক সংস্থা।

আজ আমাদের মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন এই মহান আত্মার কি ছিল আদর্শ, তিনি কি আমাদের দান করেছেন। শুধু মনে রাখা নয়, তিনি কি করতে চেয়েছিলেন তাও আমাদের বোঝা প্রয়োজন। আমাদের সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তা অনুভব করে, আর বিবেকানন্দের সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যে-দেশ তাঁকে জন্ম দিয়েছে তার উপযুক্ত হবার জন্য কায়মনে চেষ্টা করাই আজ আমাদের সকলের সর্বপ্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব।

বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভ্রাতারা ব্রত গ্রহণ করে অসাম্প্রদায়িক 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। বিবেকানন্দের জীবনের ভিত্তি ছিল ভারতের অতীত গৌরবের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এদেশের ঐতিহ্যে তিনি গৌরব অনুভব করতেন, অথচ জীবনসমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি আধুনিক কালোপযোগী মনোবৃত্তি ও দৃটিভঙ্গী নিয়ে। এক হিসেবে তাঁকে ভারতের অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে সেতু-স্বরূপ বলা চলে। বাংলা ও ইংরাজিতে তাঁর বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ, বাংলা লেখক হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করে গেছেন। উন্নত ছিল তাঁর দেহ, তেজোময় মুখশ্রী, এমন একটা উদার প্রশান্তির ভাব আছে তাঁর মুখে, দেখে মনে হয় তিনি নিজের সম্বন্ধে এবং নিজের ব্রত সম্বন্ধে অটল ও স্থিরনিশ্চয়। অথচ তাঁর মধ্যে ছিল বিরাট একটা শক্তির উৎস, ভারতকে প্রগতির পথে পরিচালিত করার জন্যে একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা। হিন্দুসমাজ যে সময় ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত, সেই সময় তিনি হিন্দুসমাজে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনলেন, ভারতের অতীত গৌরবের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে চিকাগোতে যে ধর্মমহাসম্মেলন হয়, বিবেকানন্দ সেই অধিবেশনে যোগদান করেন। *এই সময় তিনি এ্যাথেন্স কনস্তান্তি-নোপ্‌ল হয়ে মিশর অবধি গিয়েছিলেন। চীন ও জাপানেও গিয়েছিলেন তিনি। যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই সকল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সৌম্য শান্ত চেহারা, তাঁর বক্তৃতার বিষয়, বাগ্মিতার ভঙ্গীতে, এমন কিছু ছিল যার জন্যে বিদেশে সাড়া পড়ে যেত। এই হিন্দু সন্ন্যাসীকে যে একবার

---

* অতঃপর প্রায় একবছর আমেরিকায় কাটিয়ে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন।

দেখেছে তার পক্ষে বিবেকানন্দকে কিম্বা তাঁর বাণীকে ভুলে যাওয়া সহজসাধ্য হয়নি। আমেরিকায় তাঁকে বলা হত 'প্রলয়ঙ্কর হিন্দু'। পশ্চিম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের উপরেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, ইংরাজ জাতির অধ্যবসায় ও মার্কিনদের জীবনীশক্তির প্রাচুর্য ও সমাজসেবার আদর্শ তাঁর কাছে খুব ভালো লেগেছিল। একজন ভারতীয় বন্ধুকে তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, 'কোন একটি ভাবধারা যদি প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, সারা পৃথিবীতে সবার চাইতে অনুকুল ক্ষেত্র পাবে আমেরিকায়।' পাশ্চাত্ত্য দেশের ধর্মের রূপ ও প্রকাশ তাঁর মনের ওপর কোন দাগ কাটতে পারেনি বরঞ্চ পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আরও বেশী দৃঢ়ীভূত হয়েছিল। তার প্রাচীন গৌরবের অত্যুচ্চ শিখর থেকে অধঃপতন সত্ত্বেও ভারতবর্ষই যে একদিন পথের আলো দেখাতে পারবে, এ বিশ্বাস তাঁর মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল।

বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ বা একেশ্বরবাদ তিনি প্রচার করেছেন, জগতের সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের ধর্ম এককালে এই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এই বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। যা কিছু আধ্যাত্মিক, যা কিছু বিচার ও যুক্তিবহ, বহিঃপ্রকৃতির বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান দ্বারা যা কিছু সিদ্ধ, এ-সবকিছুর সঙ্গে বেদান্তের সঙ্গতি রয়েছে। 'বিশ্ববহির্ভূত কোন ভগবান কিংবা কোন অলৌকিক প্রতিভা যে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন, তা নয়। বিশ্বচরাচর আপনা থেকে আপনিই সৃষ্ট হয়েছে, আপনা থেকে আপনিই লয় পায়, আপনা থেকেই আপনাকে প্রকাশ করে। ব্রহ্ম হলেন এক অসীম সত্ত্বা স্বরূপ।' বেদান্তের আদর্শ মানবসত্ত্বার সত্যকে স্বীকার করা, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবতাকে স্বীকার করা। মানুষের মধ্যে দেবতাকে দেখাই হল সত্যকার ভগবদ্দর্শন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

কিন্তু 'বেদান্ত কেবল কল্পনার বস্তু হয়ে থাকলে চলবে না, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এর কাব্যময় প্রকাশ সত্য হয়ে উঠতে হবে। শাস্ত্রের জটিলতার জট ছাড়িয়ে বাস্তবজীবনের নীতি সন্ধান করে নিতে হবে। যোগের গোলকধাঁধা থেকে পথ কেটে বের করে নিতে হবে মনোবিজ্ঞানকে।' ভারতবর্ষের অধঃপতন ঘটেছে কেন? ভারত নিজেকে সঙ্কুচিত করেছে, শামুকের মত আপন আবরণের মধ্যে তার সত্বাকে প্রকাশকুণ্ঠ করে রেখেছে। বাইরের নানা দেশ ও জাতির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে আপন সমাধির মধ্যে ভারতের শিলীভূত সংস্কৃতি জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।......

বিবেকানন্দ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন, সমসাময়িক রাজনীতিকদের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু বার বার তিনি বলে গেছেন যে পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার, সমাজে সাম্য আনা দরকার, জনসাধারণকে তাদের পঙ্কশয্যা থেকে তুলে ধরা দরকার। 'বেঁচে থাকতে হলে, জাতীয় জীবনে উন্নতি ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন - চিন্তায় ও কর্মে স্বাধীনতা। যেখানে এই স্বাধীনতা নেই সেখানে ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির ধ্বংস অনিবার্য।'

'এই অগণিত জনগণ, এরাই ভারতবর্ষের আশা-ভরসা। ভদ্রলোকদের কাছ থেকে কিছু আশা করি না, কারণ তারা দেশের দিক থেকে ও মনের দিক থেকে মৃতকল্প।' বিবেকানন্দ চেয়েছিল ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম উন্নতির পটভূমিকার সামনে পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রগতিকে প্রতিষ্ঠা করতে, 'ভারতের মর্মের ওপর ইউরোপীয় সমাজ গড়ে তোল। সাম্যের দিক দিয়ে, স্বাধীনতার দিক দিয়ে, কর্ম ও শক্তি-প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যকে হার মানাও, কিন্তু ধর্ম-সাধনায় ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুত্ব যেন তোমার অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে থাকে।' ধীরে ধীরে বিবেকানন্দ আন্তর্জাতীয়তার দিকে অগ্রসর হন। 'রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে সব সমস্যা একটা বিশেষ কোন দেশ বা

জাতির সমস্যা ছিল, আজ সেইসব সমস্যার সমাধান নিছক জাতীয়-তার ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। এই সমস্যাগুলি ক্রমেই বৃহদাকার ধারণ করেছে, বিচিত্ররূপে আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতীয়তার বৃহত্তর ক্ষেত্রেই কেবল এই সমস্যা সমাধান করা চলবে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সমবায়, আন্ত-র্জাতিক বিধিব্যবস্থা—এ হল এ-যুগের দাবি। এ হল আজকের পৃথিবীর সংহত ও একতাবদ্ধ রূপ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই, বস্তু সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ক্রমেই অতীতের সঙ্কীর্ণসীমা ছাড়িয়ে একটা বৃহত্তর পরিধিতে ব্যাপ্ত হচ্ছে।' অন্যত্র বলেছেন, 'সারা পৃথিবী যদি তার পিছনে এগিয়ে না যেতে পারে তাহলে তাকে প্রগতি বলা যেতে পারে না। প্রতিদিন আমাদের কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে উঠছে ; সেটা এই—দেশগত, কিংবা জাতিগত, কিংবা অনুরূপ কোন সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হবে না। প্রত্যেকটি ভাব কিংবা চিন্তাকে এমন উদারভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে যেন তা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হয়। সাধনাকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করতে হবে যেন সকল মানুষ, সমস্ত জীবন তার আওতায় আশ্রয়লাভ করতে পারে। বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনকে এই প্রকার দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন এবং এইভাবেই তিনি তাঁর ধর্মপ্রচার করে বেড়িয়েছিলেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি। 'অপরের সংস্পর্শ পরিহার করে কোন ব্যক্তি বা জাতি বাঁচতে পারে না। যেখানেই আত্মসম্ভ্রম, জাতীয় গৌরব কিংবা মেকি-পবিত্রতা রক্ষা করার অজুহাতে মানুষ মানুষকে এড়িয়ে চলেছে, সেখানেই সংসর্গবিরূপ ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে তার ফল হয়েছে সাংঘাতিক। আমাদের আজকের এই অধঃপতনের অন্যতম কারণ হল এই যে, আমরা পৃথিবীর অন্যান্য সব জাতির সংস্রব সযত্নে এড়িয়ে চলেছি। এ থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায় বাইরের পৃথিবী যে ধারায় বয়ে চলেছে তার স্রোতে গা ভাসানো। গতিই হল জীবন।'

অন্যান্য নানা বিষয়ে বিবেকানন্দ অনেক কথা বলে গেছেন, কিন্তু তাঁর বাক্যে ও লেখায়, মূলমন্ত্র ছিল একটি, সেটি অভয়মন্ত্র, ভয় পরিহার কর, বলীয়ান হও। মানুষ তাঁর চোখে অধম পাপী-তাপী মাত্র ছিল না, মানুষ যে ঈশ্বরের পরমাত্মার অংশবিশেষ। কোন-কিছুতে ভয় পাবে কেন মানুষ? জগতে ভয় বলতে যদি কিছু থাকে ত' তা চিত্তের দৈন্য ও দুর্বলতা। দুর্বলতা পরিহার কর, দুর্বলতার মধ্যে মৃত্যুর বীজ নিহিত। 'এবা মে প্রাণঃ মা বীভেঃ'—এই ছিল উপনিষদের মহৎ শিক্ষা। ভয় থেকে পাপ, ভয় থেকে দুঃখ, দুর্গতি। অনেকদিন আমরা ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি; কঠিন হতে পারিনি, 'দেশ এখন চায় এমন সব মানুষ, যাদের পেশী হবে লোহার মত কঠিন, স্নায়ু হবে ইস্পাতের মত শক্ত। তাদের ইচ্ছাশক্তি এমন প্রবল হবে, যাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, এই ইচ্ছার জোরে মানুষ বিশ্ব-চরাচরের সকল রহস্য ভেদ করে সত্য আবিষ্কার করবে। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে—তা সে যেমন করেই হোক না কেন; এ অদম্য ইচ্ছা কোন বাধা মানবে না—সমুদ্রের অতল গহ্বরে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াতে হলেও এ ইচ্ছাশক্তি পিছু হটবে না। কাল্পনিক ও অবাস্তব জিনিসের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল অসাধারণ। পরলোকতত্ত্ব ও মরমীয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এসব অবাস্তর ধারণা সরীসৃপের মত। এর মধ্যে সত্য—এমন কি বড় সত্য কিছু একটা থাকতে পারে, কিন্তু এইসব ধোঁয়াটে কল্পনার ফলে জাত প্রায় মরতে বসেছে।···সত্যের সবচেয়ে বড় পরিচয় হল এই—যা শারীরিক মানসিক কিংবা আধ্যাত্মিক দিক থেকে মানুষকে দুর্বল করে, তা বিষবৎ পরিত্যাগ কর। তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন নেই, সুতরাং তা সত্য হবে কেমন করে! সত্য মানুষকে শক্তি দেয়। সত্য পবিত্র, সত্য সর্বজ্ঞ;···এই যে মরমীয়া তত্ত্ব, থাকতে পারে এর মধ্যে কিছু কিছু সত্য, কিন্তু এই তত্ত্ব মানুষকে দুর্বল করে।·····যে দর্শন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত; যা শক্তির আধার, যা আনন্দের উৎস—

সেই উপনিষদে ফিরে যাও। কুহকের ছলনায় ভুল না, সত্যের পথ চিত্ত-দৌর্বল্যের পথ নয়। সকলের বড় সত্য হ'ল প্রাণধারণের মত সব চাইতে সহজ ব্যাপার। কুসংস্কার বিষয়ে সাবধান! তোমরা যদি সবাই একান্তভাবে নিরীশ্বরবাদী হও তাও ভাল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্বোধ হ'য়ো না। নিরীশ্বরবাদীর মধ্যে তবু প্রাণের স্পন্দন আছে, তা'কে দিয়ে তবু কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু একবার যদি কুসংস্কার মাথায় ঢোকে তবে মস্তিষ্কের অস্তিত্ব লোপ পায়। বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না, প্রাণশক্তি অধঃপতিত হয়······অতীন্দ্রিয় রহস্যে আস্থা এবং ভ্রমাত্মক বিশ্বাস এই দুইয়েরই উদ্ভব মানসিক-দুর্বলতা থেকে।

এইভাবে সুদূর কুমারিকা থেকে আরম্ভ করে উত্তরে হিমালয় অবধি স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে তাঁর বাণী প্রচার করে বেড়ালেন। অনবসর ভ্রমণ ও অনবরত পরিশ্রমের ফলে জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'ল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করলেন।

বিবেকানন্দ একজন উচ্চশ্রেণীর যোগ ও বেদান্তের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। যোগ যে পরীক্ষামূলক এবং যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এই বিষয়ে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন—'যোগগুলির কোনটাই যুক্তি ত্যাগ করেনি। কেউ তোমাকে প্রতারণা করতে চায় না, কোনপ্রকারেই পুরোহিতদের হাতে তোমার যুক্তি সঁপে দিতে বলে না।···তারা প্রত্যেকটি বলে, তোমার যুক্তি ধরে থাকো, চেপে ধরে রাখো। যদিচ যোগ ও বেদান্ত অন্তর্নিহিতভাবে বিজ্ঞানের অনুরূপ, তবু একথাও ঠিক যে তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপন কথাই বলে। সুতরাং তাদের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা দেবেই। যোগশাস্ত্র অনুসারে আত্মা বুদ্ধিতে সীমাবদ্ধ নয়, এবং চিন্তাই কার্য; আর কেবল কার্যই চিন্তাকে মূল্য দিতে পারে।' প্রেরণা এবং সংস্কার স্বীকৃত হয়, কিন্তু এ দু'টি কি ভুল পথে নিয়ে যায় না? বিবেকানন্দ এর উত্তরে বলেছেন যে, 'প্রেরণা যুক্তির

বিরুদ্ধতা করলে চলবে না—যাকে আমরা প্রেরণা বলি তা যুক্তিরই পরিণত অবস্থা। যুক্তির পথ দিয়েই সংস্কারে পৌঁছতে হয়···যথার্থ প্রেরণা যুক্তির বিরুদ্ধ হয় না; যদি হয়, তা প্রেরণা নয়।' আরও বলেছেন, 'প্রেরণা সকলের কল্যাণের জন্য হওয়া আবশ্যক; নাম, যশ কি ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়? প্রেরণা সকল সময়েই জগতের হিতের জন্য হতে হবে। এবং সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হতে হবে।'

বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাধক ও মহাজন শ্রীনরোত্তম দাস তাঁহার একটি আবেগপূর্ণ ভাবশুদ্ধিময় প্রার্থনা-গীতিতে গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, তিনি অতিশয় দুর্ভাগা, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার জন্ম হয় নাই, স্বচক্ষে চৈতন্য-জীবন-লীলা দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। শ্রীনরোত্তম দাসের আক্ষেপের প্রতিধ্বনি করিয়া আরও গভীর ক্ষোভ ও খেদের সঙ্গে আমি এই কথা ভাবি যে, আধুনিক ভারতের অন্যতম যুগাবতার স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎকালে আমি ধরাধামে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনের ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বামীজি যখন দেহরক্ষা করেন, তখন আমার বয়স বারো বৎসর। সেই বয়সে স্বামীজির মহত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা বোধ বা ধারণা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তখন আমার কাছে স্বামীজির পুণ্য অবদানের কথা আদৌ পঁহুছায় নাই। তাঁহার নামের সহিত পরিচিত ছিলাম মাত্র।

স্বামীজির তিরোধানের পরের বৎসরই সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার রচনা ও বাণী, তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশের সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে। মোতি শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখনকার কালের Fifth Class বা পঞ্চম শ্রেণী হইতে Fourth Class বা চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়াছি, আর চার বৎসর পরে Entrance বা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিব। চতুর্থ শ্রেণীতে সহপাঠী রূপে পাইলাম বন্ধুবর প্রভাতকুমার বর্ধনকে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে প্রভাতের মৃত্যু পর্যন্ত, ৫৮ বৎসর ধরিয়া প্রভাত আমার ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল— প্রভাত ডাক্তারী পাস করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতীয়

সেনাবিভাগে কাজ লয়, পরে মেজর হইয়া অবসর গ্রহণ করে, এবং তাহার পরে বিশেষ যোগ্যতা ও সুনামের সহিত স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইয়া এবং হিন্দুসংগঠনে ও নানা জনহিতকর কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়া, দেশের ও দশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইস্কুলে একই ক্লাসে চারি বৎসর ধরিয়া একসঙ্গে আমরা পাঠ করি। পরে প্রভাত সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ও মেডিকেল কলেজে ভরতি হয়, আমি স্কটিশ চার্চ কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে আই-এ, বি-এ ও এম-এ পড়ি। উত্তরকালে আমাদের বাল্য-সৌহার্দ্য আরও গভীরভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। প্রভাতের পিতৃদেব চণ্ডীচরণ বর্ধন মহাশয় কলিকাতার বহুবাজারে সার্পেণ্টাইন লেনে উঁহাদের বাসভবনে Hindu Boys' School নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় চালাইতেন—Chandicharan Academy নামে স্কুলটি এখনও বিদ্যমান আছে—প্রভাতের সঙ্গে তাহাদের বাড়িতে গিয়া তাহার পিতৃদেবের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রভাতের পিতৃদেব ছিলেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য। ইস্কুলের সংশ্লিষ্ট একটি ছোটো গ্রন্থালয় তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীজির ইংরেজী ও বাঙ্গালা বই, লেখা ও বক্তৃতাদির সংগ্রহ ছিল, পরমহংসদেব সম্বন্ধে এবং হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি বই ছিল। সে ষাট বৎসর পূর্বেকার কথা। এই গ্রন্থালয় হইতে অনেকগুলি বই আমি প্রভাতের পিতার অনুগ্রহে বাড়িতে লইয়া গিয়া পাঠ করিতে পারি। চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত বৌদ্ধ নীতিগ্রন্থ 'ধম্মপদ' মূল পালি ও বাঙ্গালা অনুবাদে প্রথম পাঠ করি—সংস্কৃতের পাশে পালি ভাষা, সে আমার পক্ষে এক নবীন আবিষ্কার হইয়াছিল। তা-ছাড়া স্বামীজির বাঙ্গালা ও ইংরেজী পুস্তক—'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'চিকাগো বক্তৃতা', 'My Master', 'From Colombo to Almora' প্রভৃতি পাঠ করিয়া অপার আনন্দ পাই। প্রভাতের উৎসাহে, স্কুলে আমাদের ক্লাসের ছেলেদের জনকয়েককে লইয়া আমরা

একটি পাঠচক্র গঠন করিয়াছিলাম। সেখানে আমরা টিফিনের ছুটির সময়ে আধঘণ্টা বিশ মিনিট ধরিয়া কোনও ইংরেজী বই পড়িতাম বা বই লইয়া আলোচনা করিতাম—একজনের পাঠফল আর পাঁচজনেও উপভোগ করিতাম। প্রভাত এই পাঠচক্রে আমাদের কাছে From Colombo to Almora, Chicago Address প্রভৃতি চেঁচাইয়া পাঠ করিত, আমরা শুনিতাম।

এইভাবে স্বামীজির দেহত্যাগের পরের বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অমর উপদেশবাণীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, তাঁহার জীবনীর প্রধান প্রধান ঘটনাবলীও জানিতে পারি। তখন আমার মনে যে দুঃখ ও খেদ হইয়াছিল, তাহা কথায় বর্ণনা করা যায় না; হায় হায়, এত বড় মহাপুরুষকে আমি দেখিতে পাইলাম না! আমার পিতৃদেব স্বর্গত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় [১৮৬১-১৯৪৫] স্বামীজির কৈশোরে ও তাঁহার প্রথম যৌবনে তাঁহাকে জানিতেন। আমাদের তিনপুরুষের পৈতৃক ভিটা সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট (নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় গলি, অধুনা সুকিয়াস্ রো)—বাহির সিমুলিয়া চালতা-বাগান পল্লীতে স্থিত, স্বামীজির পৈতৃক ভিটা গৌরমোহন মুখুজ্যে ষ্ট্রীটের বাড়ির খুব কাছেই। প্রতিবেশী সমবয়স্ক বালক বিধায় ছেলেবেলায় আমার পিতা ও স্বামীজি ও অন্যান্য কতকগুলি সঙ্গী বিকালে হেদুয়া পুকুরের পাড়ে (কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে) মিলিত হইতেন। আমার বাবার মুখে কখনও 'বিবেকানন্দ' এই নাম শুনি নাই—তিনি 'নরেন দত্ত' বা 'নরেন' বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করিতেন। তাঁহারা নানা গভীর বিষয়ে, মুখ্যতঃ ধর্ম-বিষয়ে, এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের অজ্ঞতা ও গোঁড়ামির বিষয়ে আলোচনা করিতেন। স্বামীজি ইংরেজী বাইবেল লইয়া আসিতেন, এবং তাহা হইতে আপত্তিকর এবং যুক্তি-বিরোধী কথা বাহির করিয়া, হেদুয়ার পাশে খ্রীষ্টানদের প্রচার-স্থান একটি ছিল (এখনও আছে), সেইখানে গিয়া উহাদের কথা, বিশেষ করিয়া হিন্দুধর্মের বিরোধী কথার খণ্ডন

করিবার প্রয়াস করিতেন। বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলিয়া এক খ্রীষ্টান প্রচারকের সঙ্গে দিনের পর ধরিয়া তর্ক চলিত—এই চক্রবর্তী মহাশয় নিজেই ধর্মত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইয়াছিলেন। বাবার সঙ্গে স্বামীজির এই সুযোগটুকুও ছিল, অথচ আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তবে ছাত্রাবস্থায় তাঁহার ভাবশিষ্যা তাপসী ভগিনী নিবেদিতাকে কয়েকবার দেখিয়াছিলাম, তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, ভারতের লুপ্ত আত্ম-চেতনার পুনরুদ্ধারে তাঁহার গুরুদেবের অনুপ্রেরণায় নিবেদিতার কৃতিত্বের কথা কিছু কিছু শুনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ইহার বৎসর খানেক পরে, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আমার আর এক সহপাঠী শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ গুপ্তের আগ্রহে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। গৌরগোবিন্দ গুপ্ত বা গোরা শান্তিনেকেতনের ছাত্র ছিল, সেখান হইতে সে মোতি শীলের ইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভরতি হয়। তাহার কাছে রবীন্দ্রসাহিত্য-চর্চার আমার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। পরবর্তীকালে, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, রবীন্দ্রনাথকে সভা-সমিতিতে দূর হইতে দেখিবার এবং তাঁহার ভাষণ শুনিবার সুযোগ ঘটে এবং বি. এ. পাস করিবার কিছু পরে, সম্ভবতঃ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, শান্তিনিকেতনে গিয়া প্রথম রবীন্দ্রনাথের স্নেহলাভে সমর্থ হই. এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আমার জীবনের অন্যতম প্রধান সার্থকতা আমি লাভ করি। উত্তরকালে, ভাব ও কর্মজগতে নিজের কৈশোর ও যৌবনের মুখ্য প্রেরণা বিচার করিয়া দেখি, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ—উহাদের দুইজনের রচনা ও ব্যক্তিত্ব আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা কার্যকর হইয়াছে। বিবেকানন্দের চরণ দর্শন ও স্পর্শ করিবার সুযোগ পাই নাই; রবীন্দ্রনাথের কাছে দাঁড়াইবার দুর্লভ সৌভাগ্য প্রায় তিরিশ বৎসর ধরিয়া পাইয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমার ব্যক্তিগত জীবনে, যথাজ্ঞান আমার ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিবেকানন্দের প্রভাব কম হয় নাই। এই মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষ শিক্ষা ও আশীর্বাদ আমার জীবনকে অর্থপূর্ণ করিয়াছে, ধন্য করিয়াছে,—আমার কাছে আত্মচেতনা আনিয়া দিয়াছে, অপূর্ব চিত্ত-প্রসাদ আনিয়া দিয়াছে।

বিবেকানন্দের নিকট হইতে আমি কি পাইয়াছি? প্রথমে সেই কথাই ধরিতে হয়। তারপরে প্রশ্ন হইতে পারে, আমার জাতি ও দেশ তাঁহার কাছ থেকে কি পাইয়াছে? এবং সর্বশেষ, সমগ্র মানবজাতিই বা তাঁহার কাছ থেকে কি পাইয়াছে? আমি নিজে কিভাবে স্বামী বিবেকানন্দের অমর উপদেশ-বাণী হইতে উপকৃত ও লাভবান হইয়াছি, তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়, তাহা বহুশঃ আত্ম-চরিত-বিশ্লেষণের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। তবে সংক্ষেপে বলা যায়—দুইটি বস্তু তাঁহার নিকট হইতে আমি পাইয়াছি। প্রথম—আত্মসমীক্ষা ও আত্মচেতনা, এবং দ্বিতীয়—ইহার আধারে আমার চরিত্রনিয়ন্ত্রণ। আমি কি এবং কে, তদ্বিষয়ে আমার কোনও জ্ঞান বা ধারণা বা উপলব্ধি এখনও হয় নাই, অনুভূতিও কিছু আসে নাই। মনের দরজা জানালা খুলিয়া শ্রদ্ধাশীল আগ্রহে তাহার প্রতীক্ষায় আছি মাত্র। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, বিচারের পথে স্বামীজির ব্যাখ্যাত বেদান্ত-বাদ এবং অনুভূতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কল্পিত 'জীবন-দেবতা'র বোধ আমার কাছে যেন সার-সত্যের আভাস আনিয়া দিয়াছে। উপনিষদ-বেদান্ত-প্রোক্ত একত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে জীবনদেবতা-কল্পনায়-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ও মানব-দেহপিণ্ডে শাশ্বত সত্তার লীলা সম্বন্ধে একটু আকাঙ্ক্ষা তথা আগ্রহপূর্ণ সচেতনতার মিলন ঘটাইয়া দিয়াছে, আমাকে আকুল ও উদ্‌গ্রীব করিয়া দিয়াছে। প্রথম যৌবনে, হিন্দু-চিন্তার—ব্রাহ্মণ্য-দর্শনের মধ্যে বেদান্তমতের যে মহিমা, যে যৌক্তিকতা, যে বিশ্বজনত্ব, তৎসম্বন্ধে আমার চোখ খুলিয়া দেন বিবেকানন্দ। তৎপরে রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্য হইতে—রসের দিক হইতে—অনুভূতির পথ যেন আমার পক্ষে উন্মুক্ত হইয়া যায়।

আমার ঠাকুরদাদা ও ঠাকুরমা ছেলেবেলায় আমাদের নানা বিষয়ে

সদাচার শিখাইতেন—*noblesse oblige*, এ নীতি অনুসারে :—'ব্রাহ্মণঘরের ছেলে এ-রকম কাজ বা এ-রকম ব্যবহার বা আচরণ করে না'। যেমন, সকালে উঠিয়া, যথারীতি প্রাতঃকৃত্য করিয়া মুখ হাত ধুইয়া, এবং উপনয়ন হইবার পরে সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া তবে খাইবার কথা চিন্তা করিতে হয়; দৈহিক শুচিতা, পরিষ্কার থাকার প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি রাখিতে হয়; কেবল টাকার জন্য লোভ করিতে নাই—ধর্মপথে থাকিয়া আধ-রাতে একবার খাওয়া যদি জুটে, সে-ও ভাল ; নামী জ্ঞানী গুণী বয়োবৃদ্ধ লোকের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিতে হয় ; ইত্যাদি। নানাভাবে এই সব উচ্চ আদর্শ ও সদাচার তাঁহারা শিখাইতেন। বাঁ হাতে কাহাকেও কিছু দিতে নাই ; বইয়ে পা ঠেকিলে সেই বই তুলিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া, বিদ্যার প্রতি সম্মান দেখাইতে হয় ; ভাত খাইবার সময় ভাত ডাল তরকারি মাখিতে হইলে, আঙ্গুলের দুইটি পর্বের বেশী অপরিষ্কার করিতে নাই ; পাঁচজনের জন্য একটি জলপাত্র থাকিলে, আলগোছে জলপান করিতে হয়, পা দিয়া কোনও কিছু দেখাইতে নাই ; ইত্যাদি। নীতিশাস্ত্রে, রামায়ণ-মহাভারতে উচ্চতর নৈতিক জীবনের আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে যে অনেক কথা আছে, মানবিকতার দিক হইতে যাহার সার্থকতা, সেগুলির কথাও ইঁহাদের কাছে শুনিতাম, যেমন কথকতায়ও শুনিতে পাইতাম। কিন্তু বিবেকানন্দ-প্রোক্ত বেদান্ত-ব্যাখ্যাতেই যেন ধর্মজীবনের ভিত্তিস্বরূপ নৈতিক জীবনের অপরিহার্য আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান পাইলাম। জীবনের গভীরতম প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে মনের মধ্যে প্রথম জিজ্ঞাসা জাগরিত হইল বিবেকানন্দের লেখা পড়িয়া। ভারতীয়তা, ভারতীয় জাতীয়তা, হিন্দুত্ব, হিন্দু আদর্শ অনুসারে মানব-সমাজ এবং নৈতিক জীবনের সঙ্গে সেই আদর্শের যোগ, ইহার সম্বন্ধে বোধ পরিস্ফুট হইতে পারিল বিবেকানন্দের কৃপায় ; বেদান্তের বিশ্বগ্রাহিতা এবং হিন্দুত্বের সত্য স্বরূপ হইতেছে যে বেদান্তের আদর্শকে রূপায়িত করা, এই বোধের সহিত মিলিত

হইল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিকতা, অনিরুদ্ধ জ্ঞানমার্গে বিচরণ-বিষয়ে তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার 'ভারততীর্থ' ও 'বিশ্বভারতী'র আদর্শ ও কর্মচেষ্টা।

এই ভাবে, একদিকে বিবেকানন্দ আমার মনের বিকাশে, জ্ঞান ও বিচারশক্তি উন্মেষে আমাকে সাহায্য করিলেন, আমি ধন্য হইলাম। তজ্জন্য চিরতরে তাঁহার দাস বনিয়া গেলাম। এইজন্য তাঁহার কথা মনে হইলেই শতকোটি প্রণাম তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি।

বিবেকানন্দ আমার জাতির জন্য—হিন্দু জাতির জন্য, ভারতীয় জাতির জন্য, ভারতের সমগ্র মানব-সম্প্রদায়ের জন্য কি করিয়াছেন? প্রথমতঃ তাঁহার বেদান্তপ্রতিষ্ঠ সমতাবোধ ভারতের সমাজে নূতন চেতনা আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে যে, তিনি ভারতের হিন্দুজাতির মধ্যে আত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস, কর্মচেষ্টা, সাহস ও শক্তি আনিয়া দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার Aggressive Hinduism-এ যে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সর্বদা প্রণিধান-যোগ্য, আধুনিক হিন্দুর আত্ম-প্রতীতি ও আত্মশক্তি জাগাইয়া তুলিবার জন্য বিবেকানন্দের সার্থক প্রয়াসের কথা তিনি আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শাশ্বত তত্ত্বজ্ঞান, তাহার পরমত-সহিষ্ণুতা, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহার বিশ্বন্ধরত্ব, গীতায় ঈশ্বরের উক্তিরূপে ধৃত বচন—'সমোঽহং সর্বভূতেষু, ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ'—ইহার নূতন করিয়া উপলব্ধি—এ বিষয়ে নূতন চেতনা ও তজ্জাত শক্তি তিনি ভারতীয় জনগণের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্থাপিত ও অনুপ্রাণিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' ভারতকে ও জগৎকে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। দুর্গত মানুষের সেবাই যে ঈশ্বরের সেবা—এই মহৎ শিক্ষা তিনি ভারতকে নূতন করিয়া প্রদান করেন। তাঁহার 'দরিদ্র-নারায়ণ' পরবর্তী কালে গান্ধীজীর কাছে 'হরিজন'-রূপে দেখা দেন। অজ্ঞ, নিরক্ষর, সামাজিক অত্যাচার

ও অবজ্ঞায় নিপীড়িত, দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত ভারতের নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক জনগণের উন্নয়নের জন্য তাঁহার পূর্বে আর কে এতটা বিক্ষোভ দেখাইয়াছেন ? কমিউনিস্ট আদর্শের স্থাপনার পূর্বে Working Class কর্মিসমাজের উন্নয়নের জন্য এতটা চেষ্টা আর কে করিয়াছেন, এবং এ-বিষয়ে আমাদের কর্তব্যবোধ এতটা কে জাগরিত করিয়াছেন ? মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তাঁহার যে আগ্রহ ছিল, তাঁহার প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতা তাহার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ নানা বিষয়ে বিবেকানন্দ তাঁহার জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব এ-বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য।

ব্যক্তিগত জীবন, সমাজগত ও জাতিগত জীবন—এই দুইয়ের উপরে বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা বিচার করিবার পরে দেখিতে হয়, সমগ্র মানবজাতির উপর তাঁহার কোনও প্রভাব পড়িয়াছে কি না। এ বিষয়ে, স্বদেশে ও বিদেশের নানা অভিজ্ঞতার ফলে, আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, আধুনিক সভ্য মানবের ধর্মচিন্তায়, তাহার আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে, বিবেকানন্দ একটা যুগান্তর, একটা ক্রান্তি আনিয়া দিয়াছেন। যত দিন যাইতেছে, ততই এই বিষয় পরিস্ফুট হইতেছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় চিকাগোর আন্তর্জাতিক ধর্মসম্মেলনে বিবেকানন্দের উপস্থিতি ও তাঁহার বক্তৃতা, পাশ্চাত্ত্যের ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে তথা বিশ্বমানবের ধর্মানুভূতির জগতে একটা ক্রান্তিকারী ব্যাপার। ইউরোপ ও আমেরিকা মানসিক সাংস্কৃতিতে, বিজ্ঞান-চর্চায় ও বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ায় উচ্চ স্থানে আরোহণ করিলেও—সাধারণতঃ ধর্মের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শিশুচিত মনোভাবেরই পরিচয় দিত। ধর্মবিষয়ে কতকগুলি গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা, ধর্মজগতে উদারতা ও সত্যদর্শনের পথকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এখনও বহুশঃ রাখিয়াছে। বিবেকানন্দ বেদান্তের তূর্যধ্বনি করিলেন, অজ্ঞান ও অজ্ঞতার অন্ধকার যেন দূরীভূত হইল। সমীক্ষা, নিরীক্ষা, বিচার, সুযুক্তি, অসহিষ্ণুতার স্থলে ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা, এ-সমস্ত ক্রমশঃ দেখা দিতে

লাগিল। ধর্মবিষয়ে বিচারশীলতা ও সহিষ্ণুতা, এ যুগে বিবেকানন্দের হাত দিয়া ভারতের এক অবিনশ্বর দান ইউরোপ ও আমেরিকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ইউরোপ ও আমেরিকার সহৃদয় চিন্তাশীল জনগণ দুই হাতে করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, তাহা তাঁহাদের আত্ম-জ্ঞানের পক্ষে সহায়ক হইল। এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে স্বামীজি ইউরোপ ও আমেরিকায় নূতন ধারার প্রবর্তন করিলেন। নানা সংকীর্ণতা ও অধিকার-প্রমত্ততা বিবেকানন্দের উপদেশ-প্রচারের পরিপন্থী হইয়া দেখা দেয়, কিন্তু এখন ধীরে-ধীরে সে-সব বাধা দূরীভূত হইতেছে।

All great men come riding on the crest of a wave: পাশ্চাত্ত্য মানব বিশেষ করিয়া যাহা চাহিতেছিল, অজ্ঞানভাবে যাহার প্রতীক্ষায় ছিল, ধর্মবিষয়ে সেই উদার যুক্তি, বিশ্বন্ধর মনোভাব, পরমত-সহিষ্ণুতা, এই সমস্ত জলধিতরঙ্গবৎ পাশ্চাত্ত্যের জিজ্ঞাসু মনকে প্লাবিত করিয়াছিল, এবং সেই তরঙ্গের শীর্ষদেশে বরুণদেবের মতো আরোহণ করিয়া পাশ্চাত্ত্যে ও প্রাচ্যে প্রকট হইলেন বিবেকানন্দ।

একদিকে যেমন এইভাবে ভারতের বাহিরে বিশ্বমানব উপকৃত হইলেন, অন্যদিকে ইহার ফলে ভারতের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদাও নূতন-ভাবে দেখা দিল। পরাধীন পদদলিত নিপীড়িত ভারতের দৈন্যের মধ্যেও যে গুপ্ত আধ্যাত্মিক ধন জগৎকে দিবার মতো আছে, তাহা দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হইল। ভারতও প্রীতি-বিস্মিত হইল। এই যুগে, এই আধ্যাত্মিক সচ্চিন্তার পথে তিনজন ভারতীয় মহাত্মা বিশ্বমানবের কল্যাণমিত্রতা করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন—তাঁহারা হইতেছেন কবি ও মনীষা রবীন্দ্রনাথ, সাধক ও ধর্মনেতা বিবেকানন্দ, এবং সম্প্রতি দার্শনিক ও পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণন্। ইহাদের জীবনচর্চার ফলে—বিশেষতঃ বিবেকানন্দের সঞ্জীবন অগ্নিমন্ত্রের সাক্ষাৎ প্রভাবে—বিশ্বজগৎ লাভবান্ হইয়াছে, ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের ও ভারতীয় জনগণের নবীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। স্বামীজির সম্বন্ধে আমরা সত্যই বলিতে পারি তাঁহার দ্বারা—'কুলং পবিত্রং, জননী চ কৃতার্থা'॥

স্বামীজির সমন্বয়-চিন্তা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

স্বামী বিবেকানন্দ যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, ঠিক সেই বৎসরই কেশবচন্দ্র সেন সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া পুরাপুরিভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নববিধান নামে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর পনরো বৎসর পর্যন্ত সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং স্বামীজির জ্ঞানলাভের পর হইতে কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর কেশব সেনের ধর্মীয় ও সামাজিক মতবাদের বিশেষ প্রভাব ছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের যে আদর্শের উপর ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, কেশব সেন তাহা পশ্চাতে ফেলিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। রামমোহন বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন নাই। ইহার প্রচলিত ব্যাখ্যা বিনা-বিচারে গ্রহণ না করিয়া যুক্তির সাহায্যে ইহার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিতে হইবে, তিনি কেবল-মাত্র এই মতবাদই প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বেদকে তিনি অভ্রান্ত ও প্রামাণিক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন—পরবর্তী কালে রচিত স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিকে তিনি প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রের মর্যাদা দিতে স্বীকার করেন নাই। সামাজিক আচার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ মত পোষণ করিতেন।

কিন্তু ধর্ম বা সমাজের সংস্কার আরম্ভ হইলে তাহার গতি ক্রমশঃ বর্ধিত হয় এবং প্রথমে সংস্কার যে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে, ক্রমশঃ তাহার পরিধি বিস্তৃত হয়। ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য এবং সর্বদেশে সর্বকালেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রথমে মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরে কেশবচন্দ্র সেনের আমলে ব্রাহ্মসমাজে যে ধর্ম ও সামাজিক রীতি প্রবর্তিত হয়, তাহার সহিত রামমোহনের মতের গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। কেশব সেন হিন্দুশাস্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র যুক্তি ও বিচারের উপরই নির্ভর করিতেন। যদি কোন ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার বিশ্বাস ছিল স্বীকার করা যায়, তবে বলিতে হইবে যে, তাহা খৃষ্টানের বাইবেলে—হিন্দুর বেদে নয়। হিন্দুসমাজের সংস্কার তাঁহার হাতে সংহারের মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। রামমোহন নিজেকে বরাবরই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেন—মৃত্যুকালেও তাঁহার গলায় যজ্ঞোপবীত ছিল। কিন্তু কেশব সেন তাঁহার সমাজকে হিন্দু বলিতে অস্বীকার করেন; এবং তাঁহার চেষ্টায় ব্রাহ্ম বিবাহের যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই বিবাহের পূর্বে ঘোষণা করিতে হইত যে 'আমি হিন্দু নহি'। এ বিষয়ে তিনি কেবল রামমোহনকে নয়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের অপূর্ব ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতার প্রভাবে যখন দলে দলে হিন্দু ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতেছিল, তখন হিন্দুসমাজে বিষম বিক্ষোভ ও আলোড়ন উপস্থিত হইল। ইহা যে আকার ধারণ করে, তাহার উৎপত্তি ও প্রকৃতি বুঝিতে হইলে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করা দরকার। জগতে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মনুষ্যসমাজে যেভাবে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ এই বির্বতনের কয়েকটি মূলসূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। জার্মান দার্শনিক হেগেল যে মূল সূত্রটি দ্বারা এই বিবর্তনবাদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকদিগের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার বক্তব্য এই যে, সমাজে কোন বিষয়ে একটা বিক্ষোভ বা নূতন ধারার প্রবর্তন হইলে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই তাহার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে যে সঙ্কট উপস্থিত

হয়, তাহার ফলে কোন বিশেষ মনীষার প্রভাবে অবশেষে এই দুয়েরই মধ্যে সমন্বয় হয়। হেগেলের মতে এই তিনটি 'ক্রমের' মধ্য দিয়াই মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি এই তিনটির নাম দিয়াছেন Thesis, Antithesis, Synthesis অর্থাৎ বাদ, বিরুদ্ধ-বাদ ও সমন্বয়।

কেশব সেন যেমন সংস্কারের চরমে পৌঁছিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতিবাদকারী হিন্দুগণও তেমনি বিপরীত দিকে চরম মত পোষণ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুশাস্ত্র, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, প্রচলিত সংস্কার কিছুই মানিতেন না—অপর পক্ষ তেমনি যাহা কিছু হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহাই নির্বিচারে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যে-কোন অর্বাচীন গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইত। যে-কোন প্রথা বা সংস্কার হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল—তাহা যতই যুক্তিবিরুদ্ধ বা অনিষ্টকর হউক না কেন—অপরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। নানারূপ কুযুক্তি ও শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দ্বারা তাহার সমর্থন করা হইত। অস্পৃশ্যতা, স্ত্রীজাতির শিক্ষার বিরোধিতা, বীভৎস ধর্মাচার, বহু নৃশংস অনুষ্ঠান—এইভাবে হিন্দুসমাজে সমাদর লাভ করিত।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম জীবন এই বাদ ও বিরুদ্ধ-বাদের সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার সমন্বয়ের প্রথম আভাস ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। ব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দুধর্মের চরম বিরোধ ছিল মূর্তি-পূজা লইয়া। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার—ইহা লইয়াই সে যুগে তুমুল তর্কযুদ্ধ চলিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলে যে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ইহার চমৎকার মীমাংসা করেন। জল যেমন বরফে বিশিষ্ট আকার ধারণ করিতে পারে এবং বাষ্পে আকার-শূন্য হয়, ভগবানও তেমনি সাকার ও নিরাকার দুই-ই। ঠাকুর কালীমূর্তি পূজা করিয়াও যেমন ভগবানকে প্রত্যক্ষ

করিতেন, আবার নিরাকার পরম ব্রহ্মের ধ্যানেও সমাধিস্থ হইতেন। এই প্রত্যক্ষ সত্য ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে হিন্দু ও ব্রাহ্ম মতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ তাহারই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অন্যান্য মূল বিরোধের সমন্বয় করিয়াছিলেন। একদিকে শাস্ত্র, প্রচলিত প্রথা ও সংস্কার, অন্যদিকে নিছক যুক্তি ও বিচার—এ দুয়ের মধ্যেও স্বামী বিবেকানন্দ অপূর্ব সমন্বয় করিয়াছিলেন। তিনি বেদান্তের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন, এবং ইহার সাহায্যেই হিন্দু-ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদান্তের উদার মত গ্রহণ না করিলে কেবল ভারতের নয়, মনুষ্যজাতিরও উন্নতি সম্ভব নয়—এই ভাব তিনি আজীবন প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কঠোর স্বরে হিন্দুর বহু প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা-বর্জন ও হিন্দুসমাজে যাহারা ঘৃণিত, পদদলিত, উৎপীড়িত তাহাদের উন্নতি ব্যতীত যে হিন্দুসমাজ রক্ষা পাইবে না--ইহা তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'হিন্দুর ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে স্থান পাইয়াছে'--ইহা তাঁহারই উক্তি। বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নাই। স্বামীজির সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের 'নস্যাৎ'কারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রাচীন হিন্দুদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মহান্ গৌরবের প্রতি দেশবাসীকে সচেতন করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি অতি-রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম-প্রচারক ও ধর্মসম্প্রদায়ের নির্বিচার উক্তি দ্বারা হিন্দুধর্মের গৌরব-বৃদ্ধির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে নির্মম কশাঘাত করিয়াছেন।

কিন্তু কেবল ধর্ম ও সমাজে যে বাদ ও বিরুদ্ধ-বাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, স্বামীজি শুধু তাহারই সমন্বয় সাধন করেন নাই। জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভাগেও তাঁহার এই সমন্বয়ের দৃষ্টি দেখিতে পাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার ফলে যে পাশ্চাত্ত্যভাবের আমদানি হয়—তাহার ফলে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের সভ্যতা বিসর্জন দিয়া পুরাপুরি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া-

ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সমন্বয়-পদ্ধতিতে এই সমস্যারও সমাধান করেন। পাশ্চাত্ত্য সমাজ, শিক্ষা ও সভ্যতার যে অনেকগুলি গুণ আছে এবং তাহা গ্রহণ না করিলে আমাদের উন্নতিলাভ করা অসম্ভব, এ-কথা তিনি খুব জোর দিয়াই বলিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন—সিংহের চর্ম পরিলেই যেমন সিংহ হওয়া যায় না, পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণ করিয়া ভারতবাসী তেমনি সাহেব হইয়া উঠিতে পারিবে না। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এবং ইহার পরিবর্তে ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও উপলব্ধি পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রচার করিতে হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার নির্দেশ। প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্ত্যের এই অপূর্ব সমন্বয়ের বাণী এ যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাদর লাভ করিবার যোগ্য। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার সংস্কার সম্বন্ধেও স্বামীজি পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ের উপরই জোর দিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শের সহিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বহুমুখী শক্তি ও ব্যাপকতার সমন্বয় করিতে হইবে। ক্রমবর্ধমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগ ও প্রসারের সহিত পরিচিত হইতে হইবে—কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। অন্যদিকে এইরূপ জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে আধ্যাত্মিক জীবন ও চরিত্র গঠিত না হইলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। পাশ্চাত্ত্যের ন্যায় এদেশেও স্ত্রীজাতির শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে—কিন্তু প্রাচীন ভারতের স্ত্রীজাতির মহান্ আদর্শে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

স্বামীজি রাজনীতির ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্য জাতীয়ভাবের সহিত ভারতের আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় করিয়াছেন। ইওরোপের বিভিন্ন জাতির ন্যায় ভারতেও খণ্ড-বিখণ্ড দেশ ও মনুষ্যগোষ্ঠী মিলিত হইয়া এক স্বাধীন জাতির প্রতিষ্ঠা হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু

কোন্ মিলনের ভিত্তির উপর ভারতে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে —এটি ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের একটি অতি কঠিন সমস্যা। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—প্রধানতঃ ধর্ম, ভাষা, ঐতিহ্য প্রভৃতির একত্বের উপর এক-একটি ভৌগোলিক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এক-একটি জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, ইহার অধিবাসীদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভাষা বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমানায় ভিন্ন ভিন্ন ছিল। প্রাচীন-কালেও সমুদয় ভারতবাসী যে এক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল—এরূপ মনে করার কারণ নাই। পরবর্তী যুগে মুসলমান-আক্রমণের পরে ধর্মের প্রভেদ এই জাতীয়তার আর একটি প্রকাণ্ড বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে বাঙালী, মারাঠী, হিন্দুস্থানী, শিখ, রাজপুত প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ছিল, কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া কোন জাতি গড়িয়া উঠে নাই। এ ক্ষেত্রেও দুইটি বিরুদ্ধ মত ও দলের সৃষ্টি হয়। একশত বৎসর পূর্বে রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি ধর্মের ভিত্তির উপর হিন্দুজাতির প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরাও নিজেদের একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ঘোষণা করিত। এই বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক পরিবেশের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকল ভারতবাসীকে লইয়া এক অখণ্ড জাতি গঠন করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃগণ সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতায় জাতীয় কনফারেন্স ও পরে বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ভিত্তিতে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সফল হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আলিগড়ে সৈয়দ আহম্মদ যে স্বতন্ত্র মুসলমান-জাতির দাবি তুলিয়াছিলেন, জিন্নার আমলে তাহাই পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃগণ ৬০ বৎসর চেষ্টা করিয়াও এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই—মহাত্মা গান্ধীর আপ্রাণ চেষ্টাও হিন্দু-মুসলমানকে একজাতীয়ত্ববোধে অনুপ্রাণিত করিতে

সমর্থ হয় নাই। সুতরাং রাজনীতিক্ষেত্রেও যখন একদিকে ধর্ম ও অন্যদিকে রাজনৈতিক ঐক্যের উপর জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস চলিতেছিল, তখন স্বামী বিবেকানন্দ এই দুয়ের মধ্যেও সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমুদয় ভারতে একটি বলিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ জাতির প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য ও সাধনা। কিন্তু হিন্দু ইসলাম প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্মের অথবা রাজনৈতিক স্বার্থের ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী ভিত্তির উপর ভারতে জাতিগঠনের সম্ভাবনা তিনি দেখিতে পান নাই। ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলগত অধ্যাত্মবাদের উপরই তিনি জাতিগঠনের কল্পনা করিয়াছিলেন। বিষয়ের গুরুত্ববোধে স্বামীজির মূল উক্তিটি উদ্ধৃত করিতেছি: 'A nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune.' কথাটি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। স্বামীজি এ-কথা বলেন নাই যে কেবল হিন্দু বা অন্য কোন একটি ধর্ম যাহারা মানিয়া চলিবে, তাহাদের ঐক্যের উপর জাতির প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু সকল ধর্মের যাহা মূল বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন—অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদ—তাহার স্বীকৃতির উপরই একজাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অর্থাৎ দেহের অতিরিক্ত সে আত্মা, তাহাই ব্রহ্মের অংশ, সুতরাং মনুষ্যজাতি এক বৃহৎ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ - ধর্মানুষ্ঠানের সহিত এই ধারণার সম্বন্ধ নাই, অতএব মনে পরধর্মের প্রতি দ্বেষ বা অসহিষ্ণুতারও কোন স্থান থাকিবে না—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা যাহারা অনুপ্রাণিত হইবে, তাহাদের মিলন দ্বারাই ভারতে একজাতির প্রতিষ্ঠা হইবে। পাকিস্তানের সৃষ্টি দ্বারাই জাতীয়তাবাদের সমস্যা মিটিয়া যায় নাই, কারণ এখনও ভারতে বহুসংখ্যক মুসলমান এবং পাকিস্তানে বহুসংখ্যক হিন্দু আছে। সুতরাং রাজনীতিকের দৃষ্টিতে স্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারতে একজাতি প্রতিষ্ঠায় যে বাধা ছিল, তাহা এখনও বিদ্যমান। এই বাধা দূর করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম—সংখ্যালঘিষ্ঠ

ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সমূল উচ্ছেদ, দ্বিতীয়—তাহাদের মধ্যে একটি মিলন-সূত্রের আবিষ্কার। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই ধর্মপ্রাণ জাতি—উভয়েরই সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং এই উভয়ের মিলনে যদি জাতি গঠন করিতে হয়, তবে ধর্মকে বাদ দিলে তাহার ভিত্তি দৃঢ় হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জগতে যে সমুদয় জাতি প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের বিশেষত্ব ধর্ম। এই বিশেষত্বকে বাদ দিলে জাতি বাঁচিবে না—বাঁচিয়াও কোন লাভ নাই। সুতরাং এই ধর্মের যাহা মূলতত্ত্ব, সেই অধ্যাত্মবাদের উপরই জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব—অন্য কোন ভিত্তির উপর সম্ভব নয়। আজিকার দিনে স্বামীজির এই উক্তিটি আমাদিগকে বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে হইবে।

সমাজের বিবর্তনের দিক দিয়াও বিবেকানন্দ সমন্বয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি যে যুগের মানুষ, ভারতের সেই যুগে মুষ্টিমেয় অভিজাত (বণিক, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি) ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা ছিলেন। মূর্খ দরিদ্র নীচজাতীয় যে-সমুদয় দেশবাসী শতকরা নব্বই জনেরও অধিক-সংখ্যক—তাহাদের কোন স্থান ছিল না। এমন কি, নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসও আশঙ্কা করিতেন—সাধারণের মধ্যে জাতীয়তাভাব জাগ্রত করিলে দেশের বিপদ ঘটিবে। ৺বিপিনচন্দ্র পালের ন্যায় (পরবর্তী কালে) উগ্র জাতীয়তাবাদীও ১৮৮৮ খৃঃ অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবনের সূচনায় প্রকাশ্যে এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। স্বামীজি কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, জনসাধারণের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। এই জন্য কেবল মধ্যবিত্তশ্রেণী-পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের সফলতার উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও ইতিহাস-

চেতনার ফলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জগতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যুগের অবসান হইয়াছে—আপাততঃ বৈশ্য-যুগ চলিতেছে, কিন্তু শীঘ্রই শূদ্র-যুগ আসিবে। ভারতের সম্বন্ধেও তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উচ্চবর্ণেরা ভূতকাল—তাহাদের ধ্বংস আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী। তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই তিনি বলিয়াছেন, 'তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের মধ্য থেকে···কারখানা থেকে।' ইওরোপে কার্ল মার্কস শূদ্র-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও এই শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে অন্য শ্রেণী আর সমুদয়ের উচ্ছেদের বার্তাই জগতে ঘোষণা করিয়াছিলেন—এবং ইহা হইতেই কমিউনিস্ট সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। কিন্তু এখানে স্বামীজি অসামান্য সমন্বয়-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর সংঘর্ষের দ্বারা শূদ্র-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠার কথা বলেন নাই। যাহাতে বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা শূদ্রের উৎকর্ষ সাধন হয় এবং শূদ্র-আধিপত্যের যুগেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতি অব্যাহত থাকে—ইহাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। জগতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীর সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এমন এক আদর্শ সমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন, সেখানে ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন ও জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের চরিত্র ও সংস্কৃতি, বৈশ্যের উৎপন্ন দ্রব্যের যথাযথ বণ্টনের কৌশল ও প্রবৃত্তি এবং শূদ্রের সাম্য ও একত্বের আদর্শ—এই-সকলের অপূর্ব সমন্বয় হইবে। এই সমন্বয়ের ফলে ভাবী সমাজে যে সাম্যের দাবি প্রতিষ্ঠিত হইবে—সেই সম্বন্ধে স্বামীজির বিভিন্ন উক্তি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। এগুলির সম্যক্ আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে বর্তমান যুগের গতি ও চিন্তার ধারা লক্ষ্য করিয়া দুই-একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথমতঃ সাম্য বলিতে তিনি সমান অবস্থার কথা নয়, সমান অধিকারের কথাই বলিয়াছেন। প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষে মানুষে

প্রভেদ আছে এবং চিরকালই থাকিবে, সুতরাং সকল মানুষ এক রকম হইবে—এরূপ কল্পনা করা বাতুলতা। কিন্তু জগতে সকল মানুষেরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার থাকিবে। কৃত্রিম সামাজিক বিধানের জোরে কাহারও চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতা খর্ব করা হইবে না এবং কোন শ্রেণীকে কোন বিশেষ মর্যাদা বা সুবিধা দেওয়া হইবে না। তবে সামাজিক অবিচারের ফলে যাহারা এতদিন এই সমান অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাদের এই ক্ষতিপূরণের জন্য কিছু বেশী সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি উচ্চ শ্রেণীকে নীচে টানিয়া নিম্ন শ্রেণীর সহিত সাম্য-প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নিম্ন শ্রেণীকে উন্নত করিবারই পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শ্রেণীকে শূদ্রে পরিণত না করিয়া শিক্ষাদীক্ষাদি দ্বারা শূদ্র প্রভৃতিকে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করিবারই নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি অনুন্নত শ্রেণী অর্থাৎ দরিদ্রনারায়ণের সেবার প্রতি এত জোর দিয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, এই শ্রেণীর আধিপত্য শীঘ্রই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুতরাং যাহাতে তাহারা এই আধিপত্যের সদ্ব্যবহার করিতে পারে, এই জন্যই তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা কেবল অহেতুক পরোপকার নয়—ভবিষ্যতে নিজেদের স্বার্থ ও মঙ্গলের জন্যই উচ্চ শ্রেণীর পক্ষে ইহা অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য তিনি জানিতেন, শত শত শতাব্দীর ঘৃণা ও অবহেলার ফলে শূদ্রশ্রেণী যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে. তাহা হইতে উচ্চ শ্রেণীর পর্যায়ে পৌঁছিতে তাহাদের বহু সময় লাগিবে। জগতে শূদ্রাধিপত্যের প্রথম অবস্থায় শূদ্রভাব ও শূদ্র-মনোবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করিবে। কিন্তু স্বামীজি আশা করিতেন, আদর্শ ঠিক রাখিলে একদিন হয়তো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র শ্রেণীর পূর্বোক্তরূপ সমন্বয় হইবে, তখন চতুর্বর্ণের যাহা গুণ, তাহা থাকিবে। ইহার অপব্যবহারের ফলে সমাজে যে গ্লানির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা লোপ পাইবে।

তৃতীয়তঃ স্বামীজি যে সাম্যের কল্পনা করিতেন, তাহার সহিত জাতীয়তাবাদের বিরোধ নাই। কার্ল মার্কস জগতের সকল দেশের শ্রমিককে একত্র হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। বর্তমান কমিউনিস্টগণের মধ্যেও জাতীয়তাবাদ শ্রেণীগত, দেশগত নয়। অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্টগণ রাশিয়া বা চীনের কমিউনিস্ট সম্প্রদায়ের সহিত যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহাদের সুখদুঃখ ইষ্টানিষ্টের সহিত যে পরিমাণে জড়িত ও সহানুভূতিশীল, কমিউনিস্ট গণ্ডির বাহিরে ভারতের অগণিত অধিবাসীর সম্পর্কে সেরূপ নন। কমিউনিস্টদের সম্প্রদায় আছে, দেশ বা দেশভিত্তিক জাতীয়তাভাব নাই।

কমিউনিস্ট ব্যতীত অন্যান্য অনেকেও এখন প্রচলিত জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বিশ্ব-মৈত্রীকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে চান। তাঁহারা মনে করেন যে, কোন বিশিষ্ট দেশকে ভিত্তি করিয়া জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচায়ক এবং জগতে যুদ্ধবিগ্রহাদি অনেক অনিষ্ট-সংঘটনের মূল কারণ। সুতরাং এই ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ পরিহার করিয়া বিরাট মানবজাতিকে তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠা করাই যুক্তিসঙ্গত।

স্বামী বিবেকানন্দ এই জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রীর মহান্ আদর্শেরও সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তিনি ভারতে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতি-প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের যুবকগণকে উদাত্ত স্বরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া নির্ভয়-চিত্তে আত্মোৎসর্গের আদর্শ তাহাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। বিশ্বমৈত্রী বা আন্তর্জাতিক সংঘের আদর্শও তিনি ভুলেন নাই। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতে স্বাধীন বলিষ্ঠ জাতির প্রতিষ্ঠা হইলে তবেই সে বিশ্বমানবের দরবারে আসন পাইবে, নচেৎ আন্তর্জাতিক সংঘে তাহার স্থান হইবে না। তিনি বলিতেন, ভারতে জাতির প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে

পাশ্চাত্যে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার করা। আণবিক মারণাস্ত্র জগতের ধ্বংসকারী বলিয়া লোকের মনে আজ ভীতি উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু অর্ধ শতাব্দী পূর্বে স্বামীজি বলিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্রুত উৎকর্ষের ফলেই মানবজাতি ধ্বংসপ্রায় হইবে, কারণ বিজ্ঞান মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু তাহার অপব্যবহার নিরোধ করিবার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে পারে না। এই জন্য চাই ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি। এই দুয়ের সমন্বয় ব্যতীত মানবজাতির উন্নতি সম্ভব নয়। এই জন্যই ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন—তাহা না হইলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-প্রচারে কেহ কর্ণপাত করিবে না। যাহার যে বিশিষ্ট শক্তি আছে, তাহা স্বতন্ত্রভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের শক্তি ও সংস্কৃতির সাহায্যে যাহাতে সমগ্র মানবজাতি উন্নত হইতে পারে, এই জন্য আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমৈত্রীর প্রয়োজন। এইভাবেই তিনি জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সংবাদ পত্রে স্বামীজির বেলগাঁওয়ে অবস্থানকালের একটি খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বামীজি যদিও সন্ন্যাসী কিন্তু ইংরাজীতেও কথাবার্তা কহিতেন। দক্ষিণে তামাক সেবন করা হিন্দুর পক্ষে নিবিদ্ধ বিশেষতঃ সাধুর। কিন্তু স্বামীজি তামাক সেবন ও সুবিধা হইলে আমিষ আহারও করিতেন। লোকটি বড় প্রীতিকর ও ভিতরে অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল বলিয়া কেহ কিছু আপত্তি করিত না। যদিও রম্‌তা সাধু, কিন্তু ওঠা বসা যেন কোন বড় ঘরের ছেলের মত ছিল। কেহ তর্ক করিতে গেলে নম্র, হাস্যকৌতুকপ্রিয় স্বামীজি হঠাৎ ভাব পরিবর্তন করিয়া মহা শক্তিশালী পুরুষ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিধ্বস্ত করিতেন। স্বামীজির পড়াশুনা ও খবরাখবর সাধারণ লোকের অপেক্ষা অনেক বেশী দেখিয়া সকলে কোন তেজস্বী নূতন প্রকারের সাধু বলিয়া মনে করিত। বেলগাঁও হইতে স্বামীজি গমন করেন।

বেলগাঁও পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজি আপনার ইচ্ছামত দক্ষিণে যাত্রা করেন। মহা বিষণ্ণভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কন্যাকুমারী দর্শন করিতে যান। এই সময়কার কথা, তাঁহার বক্তৃতা ও চিঠিপত্রেতে কিছু কিছু পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

দক্ষিণে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বামীজি মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন এবং তদানীন্তন সহকারী একাউন্ট্যাণ্ট্ জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। নাম ধাম কিছুই জানা নাই, কোন পরিচয়পত্রও নাই, জিজ্ঞাসা করিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই, শুধু সাধু ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত এইটি বোঝা

যাইতেছিল। শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্যামবাজারের শ্রীযুত মণীন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিলেন যে, একটি বাঙ্গালী সাধু তাঁহার কাছে আছেন, বয়স আন্দাজ ৩০-৩২ বৎসর, মুখ গোল, কপালে কাটা দাগ, ভাল গাহিতে পারেন, ইংরাজী লেখাপড়া ভাল রকমই জানেন, হাস্যকৌতুকপ্রিয় ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত, এ লোকটির বিষয় সন্ধান করিয়া আমায় মাদ্রাজে যেন জানানো হয় এবং এ সকল কথা যেন গোপন রাখা হয়। তদনুযায়ী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভট্টচার্য ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে আসিয়া বর্তমান লেখকের কাছে সব বলেন এবং সমস্ত পরিচয় ও লক্ষণ মিলিয়া যাইলে তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া ফিরিয়া যাইলে মাদ্রাজে সংবাদ পাঠান।

স্বামীজি দক্ষিণের দিকে গিয়াছেন একথা পূর্বে জানা গিয়াছিল কিন্তু কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন তাহার নিশ্চয়তা ছিল না, এক্ষণে হইল। এই সকল কথা শরৎ মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয়কে জানানো হইলে পুনরায় পত্র লেখালেখি চলিতে লাগিল কিন্তু স্বামীজির পত্রের ভাব স্বতন্ত্র হইল। রাজপুতানার পত্রে যেমন শোকের ও বিষাদের ভাব ছিল, কখন বা রাগারাগি কখন বা গালাগালির কথা ছিল, তেমনি মাদ্রাজের প্রত্যেক পত্রাদিতে গাম্ভীর্য, সাহস, ভালবাসা ও উৎসাহপূর্ণ বাক্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। পত্রাদি লিখিবার ধাঁজধরনও অন্য প্রকারের ছিল—যেন কোন উচ্চ শ্রেণীর লোক সকলকে আদেশ-পত্র লিখিতেছেন। প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া খোঁজ-খবরও থাকিত এবং শান্তির ভাব ও সম্মুখে যেন কোন মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে এই সকল কথাবার্তা পত্রের প্রত্যেক পংক্তিতেই ছিল। গুপ্ত মহারাজ একবার হাস্য-কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি তো কিছুই পাইনি, স্বামীজিও কিছু পান নাই, তবে ভালবাসার জন্য একসঙ্গে থাকতুম, আর ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম ও গুরু বলে সেবা করতুম।' কিন্তু এই সকল পত্রাদির একটু-আধটু যাহা তিনি

শুনিতেন তাহাতেই চমকিত ও হর্ষিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আরে বাবা, এখন আর ঠাট্টা-তামাশা নয়, এখন যে দেখ্‌ছি কিছু পেয়েছে। এখন সম্মান ক'রে কথা কইতে হবে, আর হাসি-তামাশা নয়। আরে তা না হ'লে কি আমার গুরু হ'তে পারে? আমার মতন বেয়াড়া লোককে শায়েস্তা করতে না পারলে সে কি কখনও আমার গুরু হয়?' গুপ্ত মহারাজ অতি সরল লোক, কথার মারপ্যাঁচ কিছু জানিতেন না, তাই স্পষ্টভাবেই প্রাণের কথা কহিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া সকলেই বড় খুশী হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে অবস্থানকালে আলাসিঙ্গার মুখে যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রথমে একটি-দুইটি করিয়া লোক স্বামীজিকে দেখিতে আসিল। ক্রমশঃ সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং অল্পদিনের ভিতরেই জনসংখ্যা অত্যধিক হইয়া উঠিল। রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বহু লোক বসিয়া নানা কথাবার্তা কহিত,—বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই। স্বামীজির সহিত কথা কহিয়া সকলেই বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি আত্মগোষ্ঠীর ভিতরও হইল। স্বামীজি একটু সময় পাইলে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের ছোট কন্যাটিকে গান শিখাইতেন। এবং মাঝে মাঝে হারমোনিয়ম বাজাইয়া ছোট মেয়েটিকে সন্তুষ্ট করিতেন।

মন্দম্ চক্রবর্তী আলাসিঙ্গা পারুমল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক পাচাই আপ্‌পাস কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বামীজির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শিষ্য হইলেন, মহা উদ্যোগী ও সর্ববিষয়ে উৎসাহী হইয়া কার্য করিতে লাগিলেন। আলাসিঙ্গাকে কৌতুকচ্ছলে সকলে 'মাদ্রাজের হরমোহন' বলিয়া ডাকিত। এই সময়ে স্বামীজি এক দুঃস্বপ্ন দেখেন যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃস্বপ্নে তাঁহার মনটা একেবারে দুঃখিত হইয়া উঠিল এবং এ সকল কথা কাহাকেও না বলিয়া কেবল তিনি আলাসিঙ্গাকে বলিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে আর পত্র লিখিবেন না কিন্তু প্রাণটি বড় ব্যথিত হইয়া উঠিল

এবং স্বপ্নটি সত্য স্থির করিয়া তিনি শ্রাদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। শ্রাদ্ধের কথা শুনিয়া আলাসিঙ্গা স্বামীজিকে বলিলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী হইয়া কি করিয়া মাতার শ্রাদ্ধ করিবেন?' স্বামীজি গম্ভীর হইয়া শঙ্করাচার্য যে স্বীয় মাতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন সেই সকল বিষয় তাঁহাকে বলিলেন, কিন্তু কলিকাতায় সংবাদ কেহই লইলেন না। অবশেষে আলাসিঙ্গা বলিলেন, 'স্বামীজি, কয়েক মাইল দূরে রেলে করিয়া যাইলে এক পিশাচসিদ্ধ আছে সে সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিতে পারে। পারিশ্রমিক স্বরূপ ১০ টাকা লয় এবং কেহ কারণ লইয়া যাইলে বড়ই সন্তুষ্ট হয়। লোকটি অতিশয় কারণপ্রিয় ও শ্মশানের একটি খড়ের ঘরে বাস করে।'
চার-পাঁচজন মিলিয়া একদিন স্বামীজি সেই পিশাচসিদ্ধর কাছে যাইলেন। স্থানটি শ্মশান, চারিদিকে হাড়, ছাই, ভস্ম ইত্যাদি ছড়ানো রহিয়াছে। একটা বড় গাছ আছে, তাহার কাছে একটা মাটির ঘর বাঁধিয়া সেই পিশাচসিদ্ধ বাস করে। আলাসিঙ্গা সঙ্গে করিয়া এক বোতল মদ ও ১০ টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, সেই দুইটি দিলে সেই পিশাচসিদ্ধ তাড়াতাড়ি সেই মদ ও টাকা লইয়া তাহার মাটির ঘরটিতে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিল ও চীৎকার করিয়া কাতরস্বরে নিজের ভাষায় কি বলিতে লাগিল। স্বামীজি সেই চীৎকার শুনিয়া আলাসিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কি বলছে? ও চীৎকার করে কেন?' আলাসিঙ্গা ইংরাজীতে স্বামীজিকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ও বলছে, 'ঐ লোকটিকে এখান থেকে চলে যেতে বল, ওর গা থেকে বড় তেজ বেরুচ্ছে, তাতে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে, আমি ওর সব কথা বলে দিচ্ছি, কিন্তু ওকে এ শ্মশানভূমি থেকে চলে যেতে বল, ও যেন দূরে চলে যায়, আমি ওর তেজ সহ্য করতে পাচ্ছিনি।' তাহা শুনিয়া স্বামীজি হাস্য করিয়া আলাসিঙ্গাকে বলিলেন, 'দূঃ শ্যালা, মাতাল মাতালস্য নানা ভঙ্গি' এই বলিয়া স্বামীজি সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া দূরে চলিয়া গেলেন এবং

একটা ফুলগাছ হইতে ফুল তুলিয়া কখন বা শুঁকিতে লাগিলেন কখন বা চটকাইতে লাগিলেন ও আপন মনে বাংলা গান গাহিতে লাগিলেন। কিন্তু আলাসিঙ্গা প্রভৃতি শ্মশানে সেই ঘরটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন পিশাচসিদ্ধ কতকগুলি কাগজ লইয়া নিজের ভাষায় অনবরত লিখিতে লাগিল। এক তাড়া কাগজ লেখা হইলে সেই কাগজগুলি আলাসিঙ্গার হাতে দিয়া পিশাচসিদ্ধ বলিল যে, প্রত্যেক কাগজে, প্রত্যেক পাতায় উঁহার নাম সহি করিতে বল। আলাসিঙ্গা সেই কাগজগুলি আনিয়া স্বামীজিকে নাম সহি করিতে বলিলে তিনি তদ্রূপ করিয়াছিলেন।

আলাসিঙ্গা সেই কাগজগুলি পড়িয়া স্বামীজিকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, 'আগেকার নাম নরেন্দ্রনাথ। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। মাতা এখন জীবিতা আছেন, কোন অসুখ হয় নাই। স্বামীজির জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। ২১ বৎসরে পিতৃবিয়োগ হয়, তাহার পর সংসারে অনেক কষ্ট হয়। তদনন্তর গুরুর বিশেষ আশ্রয় পান ও অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন। মনে একটা আতঙ্ক হইয়াছে যে, গুরু তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু গুরু অলক্ষিতভাবে সর্বদাই কাছে আছেন ও রক্ষা করিতেছেন। বিপদের দিন কাটিয়া যাইবে, অমুক মাস থেকে শুভ দিন আসিবে। বহুদূরে সমুদ্র যাত্রা করিতে হইবে। তাহার পর বিশ্ববিজয়ী ও জগতবিখ্যাত হইবেন এবং অনেক হিতকর কার্য করিবেন। এই কাগজে লিখিত কথা যে সত্য ইহার প্রমাণস্বরূপ স্বামীজি অমুক ফুল তুলিয়া শুঁকিবেন এবং গুন্‌গুন্‌ করিয়া নিজের ভাষায় একটি গান করিবেন।' এইরূপ অনেক কথা লেখা ছিল। স্বামীজি ও আলাসিঙ্গা প্রভৃতি সকলে সেই কাগজগুলি পড়িয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠিলেন, কারণ, নাম, ধাম ও পূর্ব ঘটনা সমস্তই ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল।

তাহার পর স্বামীজি আলাসিঙ্গার মারফৎ পিশাচসিদ্ধকে অনেক প্রশ্ন

করিতে লাগিলেন। তখন সে কারণের বোতলটি অনেকটা খাইয়াছে ও একটু প্রফুল্ল হইয়াছে। সঙ্গে তার একটি স্ত্রীলোক ছিল, তখন সে সরিয়া যাইল। পিশাচসিদ্ধটি বলিতে লাগিল, 'সে পূর্বে নিম্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং বালক অবস্থায় একদল সাধুর সহিত মিশিয়াছিল। একজন সাধুর বিশেষ সেবা করায় তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে জপ-ধ্যানের কতকগুলি প্রক্রিয়া শিখাইয়া দিয়াছিলেন। কিছুকাল সেইভাবে জপ করিবার পর তাহার ভিতর একটা শক্তি উৎপন্ন হইল, কিন্তু পূর্বের নিষ্ঠা তখন চলিয়া যায়। কেউ কিছু প্রশ্ন করিলে কারণ-প্রিয় ও বামাচারী পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব অভ্যাসমত ধ্যান করিতে থাকিলে সম্মুখে একটি মূর্তি দেখিতে পায়। সেই মূর্তিটি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বলিয়া যায় আর সে সেইগুলি কাগজে লিখিয়া লয়। কখন কখন দুষ্ট মূর্তিটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না, তখন সে একটি শ্লেটে অঙ্কের তেরিজ কষিতে আরম্ভ করে। তখন তাহাতেই তাহার মন নিবিষ্ট হইয়া যায় এবং মূর্তিটি তখন স্পষ্ট হইয়া প্রতীয়মান হয় এবং সমস্ত কথা বলিয়া দেয়। ইহা ছাড়া সে বিশেষ কিছু জানে না।' সেই সমস্ত কথা শুনিয়া স্বামীজি ফিরিয়া আসিলেন।

মুন্সী জগমোহনলালের সহিত সাক্ষাৎকালে বর্তমান লেখক সেই পিশাচসিদ্ধের কথা মুন্সী জগমোহনলালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। মুন্সী জগমোহনলাল বলিলেন, তাহাকে ১০ টাকা ও এক বোতল মদ দিতে হয়। কিন্তু মুন্সী জগমোহনলালের বিষয় সে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা সকলগুলি ঠিক হয় নাই। অতীত ও ভবিষ্যতে কথার ভিতর কিছু মিলিয়া ছিল বটে কিন্তু অনেক স্থলেই মিল হয় নাই। এই জন্য মুন্সী জগমোহনলাল সেই পিশাচসিদ্ধটির উপর বিশেষ আস্থা প্রকাশ করিলেন না।

স্বামীজির মন এতদিন ধরিয়া বড় বিষণ্ণ ছিল। তাঁহার জীবন যে ব্যর্থ হইয়াছে এইটি তাঁহার ধারণা হইয়াছিল কিন্তু পিশাচসিদ্ধের কথা শুনিয়া তাঁতার প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হইতে লাগিল ও

মনে প্রবল শক্তি আসিতে লাগিল। চিকাগোর ধর্মসভায় যাইতে তাঁহার মনে এক নূতন ভাব উঠিল এবং ক্রমেই তাঁহার ভিতরে গাম্ভীর্য ও সিংহবল আসিতে লাগিল।

পি, সিঙ্গারাভেলু মুদালীয়ার খৃষ্টান কলেজের একজন বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। আলাসিঙ্গার পরম বন্ধু, এই জন্য স্বামীজির কাছে আসিতে লাগিলেন ও স্বামীজির অন্তরঙ্গ শিষ্য হইলেন। তিনি কিছুদিন ফল ও দুগ্ধ খাইয়াছিলেন, সেইজন্য সকলে তাঁহাকে 'কিডি' বা টিয়া পাখী বলিত এবং তিনি সেই নামেই বন্ধু-বান্ধবের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। কিডি অত্যন্ত বালকস্বভাব ও ভাবপ্রবণ ছিলেন। কথা বলিতে বলিতে অনেক সময় কাঁদিয়া ফেলিতেন। প্রগাঢ় ভক্তি এবং কি করিয়া লোকের সেবা করিবেন এইটি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল; কর্ম ও জ্ঞানভাব অপেক্ষা সেবা-ভাবটা তাঁহার ভিতর বেশী ছিল। তিনি বর্তমান লেখককে যে সব পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে কী ভালবাসাপূর্ণ অমায়িক ভাব ছিল! যেন স্বামীজির প্রতি তাহার প্রাণটা গলিয়া গিয়াছে এবং প্রাণের গভীর স্থান হইতে সে ভাব উঠিতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে পত্রগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে বর্তমান লেখক মাদ্রাজে যাইয়া দুই ঘণ্টা ছিলেন। কিডি আধ ঘণ্টার ভিতর স্বামীজি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিডি বলিয়াছিলেন, স্বামীজির ভাব সর্বতোমুখী। একবার কথা উঠিল যে, কি করিয়া হরিণ শিকার করা হয়। স্বামীজি বলিলেন, 'মনটাকে একাগ্র করিয়া যদি বন্দুক হরিণের দিকে রাখা যায় তাহ'লে গুলি অব্যর্থভাবে হরিণকে লাগবে।' এইরূপ কথার পর স্বামীজির একদিন শিকার করিবার ইচ্ছা হইল। কোন একস্থানে তাঁহারা কয়জন মিলিয়া হরিণ শিকার করিতে যাইলেন। স্বামীজি প্রথম-যৌবনকালে কুস্তি, জিম্‌নাষ্টিক, তলোয়ার ও লাঠি খেলা শিখিয়াছিলেন

কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া কখনও সে বিষয়ের চর্চা করেন নাই। স্বামীজি যখন মাঠে যাইয়া বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহার সাধু-ভাব যাইয়া ক্ষত্রিয়-ভাব দাঁড়াইল; হাতের বন্দুক একবারও কাঁপিল না, দৃষ্টি ঠিক করিয়া লইলেন এবং এমন-ভাবে গুলিটি ছুঁড়িলেন যে হরিণটির পায়ে গিয়া বিঁধিল ও হরিণটি পড়িয়া গেল। কিডি আহ্লাদ করিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন, 'স্বামীজির অব্যর্থ সন্ধান ছিল। পাকা শিকারী যেরূপভাবে শিকার করে তিনিও সেইরূপভাবে শিকার করা সেইদিন দেখাইয়া দিলেন।'

কিডি আর একটি গল্প বলিয়াছিলেন। একদিন স্বামীজি সন্ধ্যার সময় বসিয়া নৃত্যগীতের কথা বলিতেছিলেন। নৃত্য বা হস্তপদাদি সঞ্চালনে যে মানসিক নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করা যায় তাহাই তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। সেই সমস্ত বিষয় বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি উত্তেজিত হইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'একখানা শাড়ী কাপড় নিয়ে এসো তো।' কাপড়খানি আনা হইলে তিনি নিজ গৈরিক বসনের উপর সেই শাড়ীখানি স্ত্রীলোকের ন্যায় পরিয়া লইলেন। তখন তিনি যে সাধু বা পুরুষ সেইটি ভুলিয়া গিয়াছেন এবং নিজে স্ত্রীলোক এইটি ধারণা হইল। অবিলম্বে বাঈজীর ন্যায় হস্তাদি সঞ্চালন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নানারূপ ভাবভঙ্গি ও অঙ্গাদি পরিচালন করিয়া বাঈজীর ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে স্বামীজির সেই ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। বাদ্যের সহিত কোনো জায়গায় তাল কাটিয়া যাইল না। গৃহমধ্যে যেন কোনো শিক্ষিতা বাঈজী আসিয়া গান করিতেছে সেইটি সকলে অনুভব করিতে লাগিল। কিডি বলিয়াছিলেন, 'ভাবের সহিত সহসা শরীরকে পরিবর্তন করা স্বামীজি অদ্ভুতরূপে দেখাইয়াছিলেন।'

তাহার পর কিডি সাধারণ লোকদিগের প্রতি ভালবাসা, কি করিয়া

তাহাদের কল্যাণ ও উন্নতি হইবে সেই সমস্ত বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুনরায় কিডি বলিতে লাগিলেন, গরীব দুঃখীর কোনো কষ্ট দেখিলে স্বামীজির মুখ রূপান্তরিত হইয়া যাইত, অনেক সময় তিনি বিমর্ষ হইয়া থাকিতেন ও তাঁহার চক্ষুতে জল দেখা যাইত।

এই সময় মুন্সী জগমোহনলাল মাদ্রাজে স্বামীজির সহিত দেখা করিতে আসেন এবং সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট স্বামীজির পত্রাদি আসিতে লাগিল। প্রত্যেক পত্রখানি ভালবাসা ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক্যের নাম করিয়া খবরাখবর লওয়া এবং তিনি যে এইবার একটা বিশেষ কিছু কার্য করিবেন তাহারই পূর্ব-সূচনা দেখা যাইতেছিল। একবার একখানা পত্র আসিল যে, তিনি হায়দ্রাবাদে যাইতেছেন, পাঁচ-ছয়দিন বাদে পুনরায় মাদ্রাজে ফিরিবেন। খেতড়ির রাজা অজিত সিংয়ের দয়া-দাক্ষিণ্য, সেবা ও গুরুভক্তি প্রভৃতির নানা সুখ্যাতিপূর্ণ পত্র আসিতে লাগিল। রাসমণির জামাতা মথুরচন্দ্র বিশ্বাস যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করিয়াছিলেন, রাজা অজিত সিংও স্বামীজিকে সেইরূপভাবে ভক্তি করিতেন।

মাদ্রাজ হইতে একখানি পত্র আসিল যে স্বামীজি আমেরিকায় চিকাগো মহাসভায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যাওয়া কতদূর সম্ভব হইবে এবং যাইয়া কৃতকার্য হইতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল, সেইজন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর আশীর্বাদ চাহিয়াছিলেন। স্বামীজি কথাটি অতি গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া এই সকল কথা শরৎ মহারাজ, যোগেন মহারাজ, সান্ন্যাল মহাশয় ও বর্তমান লেখক ব্যতীত আর কেহই জানিত না। অপরের কাছেও এ বিষয় উল্লেখ করা হইত না। যাহা হউক, এই সময় হইতে স্বামীজির আমেরিকা যাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

লণ্ডনে অবস্থানকালে কৃষ্ণমেনন্ নামক জনৈক মাদ্রাজী যুবক স্বামীজির নিকট যাইত। একদিন স্বামীজি বলিতে লাগিলেন, 'দেখ্, আমি এই মেননের দেশে গেছ্লুম। সেই সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে গিয়ে দেখি যে এক বীভৎস কাণ্ড! মেয়েদের কোমর পর্যন্ত কাপড় পরা আর উপরকার অঙ্গটা একেবারে খোলা। আরে ছি! ছি! দেখে লজ্জা করতে লাগলো!' মেনন্ বলিত, 'স্বামীজি যখন মাদ্রাজের দিকে ছিলেন তখন আমি তাঁহার কোল্কেতে তামাক ভোরে দিতুম, এইটাই ছিল আমার প্রধান কাজ।' মেনন্ কথাটি এমন বুক ফুলাইয়া গর্ব করিয়া বলিল যে বর্তমান লেখক তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মেননের ভক্তিপূর্ণ কথাটি শুনিয়া বুঝা গেল যে, স্বামীজিকে তামাক সাজিয়া খাওয়ানোই তাহার সর্ব কার্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য, এবং তাহার সৌভাগ্য যে সে সেই কাজ করিবার অধিকার পাইয়াছিল।

একদিন স্বামীজি কর্নেল অল্‌কটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সঙ্গে মেনন্ ও জনকতক লোক ছিল। স্বামীজির মুণ্ডিত মস্তক ও মাথায় পাগড়ি। অল্‌কটের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্তা কহিতে কহিতে স্বামীজি মৃদুভাব হইতে ক্রমশঃ কঠিনভাব ধারণ করিলেন, অবশেষে অল্‌কটকে ধম্‌কাইতে শুরু করিলেন। স্বামীজি নির্ভীকভাবে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি কতকগুলি ভূতুড়ে ধর্ম চালাচ্ছ কেন? তোমার মহাত্মারা উড়ে যাচ্ছে, উড়ে আসছে, মাথার পাগড়ি রেখে যাচ্ছে, এ সব কি কচ্ছ? আর যত আহাম্মক মাদ্রাজী ছোঁড়াদের মাথা খাচ্ছ। তুমি হিন্দুধর্মের কি জান? যত বাজে ধুয়ো তুলেছ।' এইরূপভাবে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। মেনন্ ও তাঁহার সঙ্গীরা স্বামীজির ভর্ৎসনা শুনিয়া স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পর স্বামীজি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শান্ত ও গম্ভীর হইয়া তাঁহার আমেরিকা যাওয়ার বিষয় অল্‌কটকে জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন, 'তোমার তো আমেরিকায় অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন,

তাঁহাদের নিকট পরিচয়-পত্র দাও না?' অল্‌কট একটু মৌন হইয়া থাকিয়া পরিচয়-পত্র দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন স্বামীজি পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের মস্তকোস্থিত পাগড়ি উন্মোচন করিয়া অল্‌কটকে বলিলেন, 'এই একটা নেড়া মাথার কাছে তোমার বিশ হাজার থিওজফিষ্ট দাঁড়াতে পারে না। এই গেরুয়া-পরা নেড়া মাথাগুলি রাজাদের উপর কথা চালায় আর সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে যত হিন্দু আছে তাদের গুরু হ'য়ে আদেশ চালাচ্ছে।' মেনন্ বলিতে লাগিল যে স্বামীজি যখন এই কথাগুলি অল্‌কটকে বলিতেছিলেন তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। উপস্থিত সমস্ত লোকই হতভম্ব হইয়া রহিল এবং সন্ন্যাসীর কি উচ্চ আদর্শ ও অদ্ভুত শক্তি তাহাই সকলে সেদিন নূতনভাবে দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ভিক্ষুক নয়,—জগৎগুরু। এই ভাবটি তিনি যেন সেদিন সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে স্বামীজি একটু হাসিতে হাসিতে অল্‌কটকে বলিলেন, 'অনেকক্ষণ বকিয়েছ, দাও গোটা কতক চুরুট্ দাও, টানি।' এই বলিয়া গোটা পাঁচ-ছয় চুরুট্ লইয়া হাসিতে হাসিতে সঙ্গের লোকগুলিকে লইয়া চলিয়া আসিলেন এবং রাস্তায় অনেক কৌতুক ও ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন।

মেনন্ জাতিতে অব্রাহ্মণ ছিলেন, সেইজন্য মাদ্রাজ দেশের ব্রাহ্মণেরা মেননের জাতিকে শূদ্র বা তদনুরূপ মনে করিয়া তাহাদের সাথে আহারাদি করিতেন না। একবার কতকগুলি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ আসিয়া স্বামীজির সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলেন। কথা প্রসঙ্গে তাহারা স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজি, আপনি কি জাতি?' স্বামীজি গম্ভীর হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, 'I belong to king-maker caste' (যে জাত রাজা সৃষ্টি করে আমি সেই জাতের লোক)। সন্ন্যাসীর আদেশে রাজা সিংহাসনে বসেন, সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকিলে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন এবং সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করিলে রাজা সিংহাসনচ্যুত

হন, এই ভাবের কথা বলিলেন। স্বামীজির কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা নির্বাক হইয়া রহিলেন, পুনরায় আর কোনো প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না।

স্বামীজি আমেরিকায় যাইবেন, মাদ্রাজে এই খবর প্রচারিত হইলে ব্রহ্মণদিগের ভিতর অনেকেই বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইলেন এবং নানা প্রকার আপত্তি তুলিতে লাগিলেন। একবার স্বামীজি কয়েকজন অন্তরঙ্গ লইয়া মাদ্রাজের বন্দরের উপর বসিয়া বৈকালবেলা বায়ু সেবন করিতেছিলেন, সেই সময় কতকগুলি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ আসিয়া স্বামীজিকে অনেক কটূক্তি করিয়াছিল।

স্বামীজি আলাসিঙ্গা নামটি সংক্ষিপ্ত করিয়া কখন কখন আচিঙ্গা বলিতেন এবং আলাসিঙ্গার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, তাহাকে আহ্লাদ করিয়া আচিঙ্গার ভাই চিচিঙ্গা বলিয়া ডাকিতেন। সেই ব্যক্তি চিচিঙ্গা নামে সকলের নিকট পরিচিত ছিল। এই সময় আলাসিঙ্গা কিডি, রঞ্জন রাও, আর. এ. কৃষ্ণচারিয়া প্রভৃতি অনেকেই স্বামীজির অন্তরঙ্গের ভিতর হইয়াছিল। বেলগিরি আয়েঙ্গারও স্বামীজিকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। মাদ্রাজের অনেক শিক্ষিত যুবক স্বামীজির একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই তাঁহার যেন একটা মানসিক ভাবের পরিবর্তন হইল এবং সাহস ও জগত-বিজয়া শক্তি যেন সহসা তাঁহার ভিতর উদ্ভূত হইল।

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, শিক্ষা কল্প নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ ব্যাকরণ বেদ প্রভৃতি অপরাবিদ্যা, আর যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় তাই পরাবিদ্যা। ধর্মের পথে চালনা করে বলে শিক্ষা বা বেদশিক্ষার প্রয়োজন আছে। প্রাচীন ভারতে ধর্ম ছিল সকল কাজের উৎস। প্রাচীন ভারতের আদি-সাহিত্য—ঋক্ সাম যজু অথর্ববেদ ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি সবই ধর্মসাহিত্য। প্রৌঢ় অবস্থায় লোক যখন বানপ্রস্থে যেতেন তখন বয়সের জন্যে ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না তাঁদের দার্শনিক চর্চা আরণ্যক বলে পরিচিত হয়েছিল। সেই দার্শনিক চর্চা উপনিষদে আরও গভীর হয়ে উঠেছিল। বলা হয়, উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড পূর্ণতা লাভ করেছে। উপনিষৎ তাই জানার শেষ সীমায় উপনীত,—বেদান্ত। প্রাচীন ঋষিরা যা দেখেছেন, অর্থাৎ ধ্যানযোগে যা অনুভব করেছেন তাই উপনিষদে উল্লেখ করেছেন। গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন 'তত্ত্বমসি'। জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, আমাদের অজ্ঞানতার জন্যে ভেদ মনে হয়। শঙ্করাচার্য উপনিষদের জ্ঞানমূলক ভাষ্য করেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে তৎকালীন প্রধান পণ্ডিতের মত খণ্ডন করে তিনি নিজস্ব অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্করের পূর্বেও বেদান্তভাষ্য ছিল, শঙ্করের ভাষ্যের পরে বেদান্তভাষ্য বলতে তাঁর ভাষ্যই বোঝায়। তবু বলব ভারতের এসব জ্ঞানের ঐতিহ্য পণ্ডিতেরাই বুঝতে পারে। সাধারণের শিক্ষার জন্য এসব ব্যবহার করা চলে না। অথচ এ জ্ঞানের কথা, আশার কথা সাধারণে না জানলে চলবে কেন? বিশ্ববাসীকে সহজ করে জ্ঞানের সার পরিবেশন করা যায় না কি? স্বামীজি সরল ভাষায় বেদান্ত বোঝাতে আরম্ভ করলেন। কেবল

বোঝানো নয়, ব্যবহারিক জীবনে যে বেদান্তের সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব তাও প্রমাণ করলেন। নিজে না দেখলে না বুঝলে, কেবল অন্যের কথায় মেনে নেবার লোক তিনি ছিলেন না। উপনিষৎ বলছে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। স্বামীজি বললেন, সময় আসে যখন ঐ একত্বের উপলব্ধি হয়। উপনিষদের উক্তি অভ্রান্ত। তিনি বলেছিলেন, তাঁর জীবনে এই অনির্বচনীয় অনুভূতি হয়েছিল; দক্ষিণেশ্বরের বাগানে যখন শ্রীঠাকুর তাঁর বুকে হাত দিয়েছিলেন তখন। আর একবার হয়েছিল আমেরিকায়, লেকের ধারে। সে-পরমমুহূর্তে তিনি দেখেছিলেন, বাড়িঘর দুয়ার জানালা বারান্দা গাছপালা চন্দ্র সূর্য সব যেন কোথায় কি হয়ে গেল। সব যেন ভেঙেচুরে অনু-পরমাণু হয়ে আকাশে বিলীন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চৈতন্য, অহঙ্কার সব অবলুপ্ত হয়ে গেল। তাঁর আর কিছু মনে রইল না। ক্রমে তাঁর দেহজ্ঞান ফিরে এল, আবার সবই দেখলেন— সেই বাড়ি বাগান সব।

শুনে কেউ কেউ বলেছিলেন, মস্তিষ্কের বিকারের ফলেও লোকে এই রকম দেখে। স্বামীজি বলেছিলেন, বিকার কি হে! দেখলাম যখন, তখন কোন রোগও হয়নি, নেশাও করিনি। তাছাড়া অনুভূতি-গুলি যে বেদের কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

এই তো সেই দর্শন, জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়। কলসীতে সমুদ্রের জল ধরা হল। বলা হল কলসীর জল আর সমুদ্রের জল। কলসী ভেঙে দিলে সমুদ্রের জল আর কলসীর জল ভিন্ন থাকে না। দৃশ্যমান জগৎ ভ্রমমাত্র—রজ্জুতে সর্পভ্রম, সূর্যকিরণে মরীচিকা ভ্রম। ভেদবুদ্ধি থাকে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার প্রভাবে যার সৌভাগ্য থাকে তার সে আবরণ অপসৃত হয়।

শ্রীঠাকুর ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। সমাধিকালে মায়াজনিত দেশ কাল নাম ও রূপের বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকে না নাম-রূপধারী জগৎ লীন হয়ে যায়, আর ভেদজ্ঞান থাকে না।

শ্রীঠাকুর স্বামীজিকে কেবল স্পর্শদ্বারা সেই উপলব্ধি করিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীজি কেবল বেদান্ত পড়েননি, বেদের সার অনুভব করেছিলেন, তাই তাঁর বলা লেখা এত উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে। স্বামীজি কথাটি সহজ করে বুঝিয়েছিলেন। ভারতের ধর্ম উদার। পতঞ্জলি বলেছিলেন, মোক্ষলাভের চারিটি পথ—ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরের বাচক শব্দের জপ, মহাপুরুষে চিন্তা, যা ভাল লাগে তার ধ্যান। তিনি পথগুলির তারতম্য করেননি। যে কোনো পথে চললেই—যার আবেগ আছে তিনি মোক্ষলাভ করবেন। রাজার ধর্ম হল প্রজার সুখ-সুবিধা দেখা। অভিষেক সময় প্রাচীন ভারতের রাজা প্রজাদের উদ্দেশ করে শপথ গ্রহণ করতেন, প্রজাদের উপর অত্যাচার করলে তিনি যেন সারাজীবনে অর্জিত সুকর্মের ফল সন্তান-সন্ততি, ইহকাল-পরকাল সব থেকে বঞ্চিত হন। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র বার বার বলেছে—বিভিন্ন পথে প্রবাহিত নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র, তেমনি বিভিন্ন পথ অবলম্বী মানুষের গন্তব্যস্থান সেই ভগবান। গুরু শিষ্যকে বলেছেন, গুরু বা গুরুজনদের যা সগুণ তাহা গ্রহণ কর, যা দোষের তার অনুকরণ কর না। ভারতের উদারতার আরও উদাহরণ আছে, দাসী জবালার ছেলে সত্যকাম, যাঁর পিতাকে জানা ছিল না, তিনিও উত্তরকালে নিজের গুণের জন্য ঋষি বলে অভিহিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়েরা অর্জন করতেন। আমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র যাঁরা অবতার বলে খ্যাত, তাঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ যেতেন ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য। পাঞ্চালদেশের রাজা প্রবহণ। তাঁর কাছে এলেন ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্যে। রাজা শুধালেন, জান কি দেহী কি করে দেহত্যাগ করে? জান কি বিদেহী আত্মা কেমন করে দেহ ধারণ করে? শ্বেতকেতু জানতেন না, তাঁর পিতা ব্রাহ্মণ হয়েও এ তত্ত্ব জানতেন না। তখন পিতাপুত্রে এলেন রাজার কাছে জানবার জন্যে। বৈদিক যুগে জাতির অভিমান ছিল না।

মত ও পথের উদারতা হিন্দুধর্মকে সনাতন করে তুলেছে। একথা এত সহজে স্বামীজির আগে কেউ আমাদের জানাননি। গভীর অধ্যয়ন ও অনুভূতির ফলস্বরূপ যে তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তাই জগতবাসীকে বলে গেছেন। মনেপ্রাণে বুঝেছিলেন বলেই উদাত্তকণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন যে হিন্দু অন্য ধর্ম-অবলম্বীকে হিংসা করেনি। রোমের অত্যাচারে একদা খৃষ্টান উদ্বাস্তুরা দক্ষিণ-ভারতের উপকূলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। জরথুস্ত্রপন্থী পারসীক জাতি বহুকাল হল এদেশে বসবাস করছে। বটগাছের মত প্রাচীন হিন্দু-ধর্মের নানা মতের ঝুরি নেমে গেছে। ভারতের ভিত্তিতে সুদৃঢ় হয়ে বসেছে।

প্রতিভার বিকাশে, কর্মক্ষমতায় শঙ্করাচার্যের সঙ্গে স্বামীজির তুলনা করা যেতে পারে। শঙ্কর মাত্র বত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর মধ্যে তাঁর শেখা ও শেখানো আজও অম্লান হয়ে আছে। স্বামীজি উনচল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন। স্কুল, কলেজ ও অনন্তের পথে প্রস্তুতির কাল বাদ দিলে তাঁর শেখা আর শেখানোর কাল পনরো বছরের বেশি নয়। ওরই ভেতর রচনাকাল মাত্র নয় বছর।

শঙ্করাচার্য তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনে এগারোখানা উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা ও অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পায়ে হেঁটে কুমারিকা থেকে বদ্রীনাথ, দ্বারকা থেকে পুরী, এই দীর্ঘ পথ ঘুরেছিলেন। চারধাম, শৃঙ্গেরী যোশী সারদা ও গোবর্ধন মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর অদ্ভুত কর্মশক্তি ভাবলে বিস্ময় লাগে। স্বামীজিও তেমনি করেছিলেন, তাঁর প্রব্রজ্যার দৈর্ঘ্য কিছু কম নয়। অবশ্য একালে সব পথ তিনি পদব্রজে অতিক্রম করেননি। তেমনি তাঁর পথের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে গেছে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে,—পূর্ব থেকে পশ্চিম দেশে। তাঁর পথ চলা আসমুদ্র হিমাচলেই আবদ্ধ থাকেনি।

তখনকার দিনে শঙ্করকে হয়তো হিন্দু বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আর অন্য

ধর্মের বা ম্লেচ্ছ ভাষার পাঠ নিতে হয়নি। সে যুগে তার দরকারও ছিল না। তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে স্বামীজি তাও শিক্ষা করেছিলেন। ইংরেজি ভাষা এত ভাল শিখেছিলেন যাতে উত্তরকালে তাঁর সমালোচকেরা তাঁর লেখা বলা ইংরাজি ভাষায় কোনো খুঁত ধরতে পারেননি। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা না-ই বা তুললাম। এর উপর তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ। গাইতে পারতেন ভাল। তাঁর গানের লহরীতে শ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হতেন। অসাধারণ পরিশ্রম করবার ক্ষমতাকে লোকে প্রতিভা বলে। স্বামীজির মতো প্রতিভার এমন উজ্জ্বল মডেল আর কোথায় পাওয়া যাবে !

প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্মজগতে স্বামীজির মৌলিক দান কি ? স্বামীজি বিশ্বসভায় ভারতের ধর্ম-আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বলতে গেলে প্রথম ভাষণেই। আধ্যাত্মিকতাই ভারতের প্রাণকেন্দ্র, স্বামীজির পূর্বে জোর গলায় একথা তো কেউ বলেননি। এইটাই তো তাঁর বড় দান। পাশ্চাত্ত্য জগতকে এবং তৎসহ আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে দেখিয়েছিলেন হিন্দুধর্মে অখণ্ড সার্বভৌমত্ব। হিন্দুধর্মের মূলনীতিগুলির এমন সহজ সরল ভাষা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আজও করেননি। বৈদিক যুগের উজ্জ্বল ধর্ম ও দর্শন কালপ্রবাহে তমসাচ্ছন্ন হয়েছিল। আচার-আচরণ ক্লিন্ন হয়ে উঠেছিল। সে সব বাদ দিয়ে, সারবস্তু তিনি খুঁজে বের করে জগতের সামনে ধরে দিয়ে গেলেন। এমনিভাবে, এমন ভাষাতে ধরে দিয়ে গেলেন, যা এড়ানো কঠিন হল। ভারতের বৈশিষ্ট্য, গীতা উপনিষদে ছিল। বিস্মৃত হয়েছিল। তার নতুন করে খোঁজ পড়ল, তাঁর কথায়। বেদান্ত বলতে কি বোঝায়, বেদান্তের অন্তর্নিহিত সত্য বোঝালেন বিদেশীদের, বললেন আমাদের মতো জনসাধারণদের।

অদ্বৈতবাদ উপনিষদসম্মত। আচার্য গৌড়পাদ অদ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। গৌড়পাদ ছিলেন গোবিন্দাচার্যের গুরু। গোবিন্দাচার্য ছিলেন শঙ্করাচার্যের গুরু। গৌড়পাদ যে বাদের সূচনা করেছিলেন,

শঙ্কর সেই অদ্বৈতবাদ পূর্ণ পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। শঙ্কর বলেছিলেন, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়; জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নেই; ভেদজ্ঞান হয় অজ্ঞানতার জন্যে; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

রামানুজাচার্য বললেন, ব্রহ্ম এক ও পূর্ণ এবং জীব ব্রহ্মের অংশ মাত্র। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, অভেদ নয়। জীব ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত, জগৎও ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত। জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ বা শরীর। রামানুজের মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত।

মাধবাচার্য বললেন দ্বৈতবাদ। তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। জীব ঈশ্বরের অংশ নয়, তাঁর দাস। জীবের কর্তব্য ঈশ্বরের সেবা করা, আর তাতেই তার মুক্তি।

শ্রীঠাকুর অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত তিন ভাবই মানতেন। প্রসঙ্গত তিনি মহাজ্ঞানী হনুমানের কথা বলতেন। শ্রীহনুমানের যখন দেহবুদ্ধি বলবৎ থাকত তখন শ্রীহনুমান অনুভব করতেন, তিনি দাস আর শ্রীরামচন্দ্র প্রভু (দ্বৈতভাব)। যখন তাঁর বোধ হত যে তিনি মন-বুদ্ধি-আত্মাযুক্ত জীবাত্মা, তখন তিনি দেখতেন শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ আর তিনি তাঁর অংশ (বিশিষ্টাদ্বৈতভাব)। আর যখন তিনি ভাবতেন তিনি নামরূপরহিত শুদ্ধ আত্মা, তখন দেখতেন তিনিও যা শ্রীরামচন্দ্রও তা, কোনো ভেদ নাই (অদ্বৈতভাব)। শ্রীঠাকুর বলতেন, তিনটি ভাবই মনের উন্নতির অবস্থা অনুযায়ী উপনীত হয় তবে অদ্বৈতভাবই ধর্মোন্নতির শীর্ষবিন্দু। তিনি নিজ জীবনে উপলব্ধি করে একথা বলে গেলেন। পূর্বসূরীগণ যেসব মতবাদ প্রচার করে গেলেন তা যে কেবল মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, প্রত্যক্ষ, তা বুঝিয়ে দিলেন।

স্বামীজি তাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ কেবল সহজ কথায় বুঝিয়ে ক্ষান্ত হননি, অদ্বৈতবাদের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আর দ্বৈতবাদের সমন্বয় করে গেছেন। শ্রীঠাকুর যেমন বলতেন, ঈশ্বর সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। নিরাকার হলেও আকার নেন—যেমন জল আর বরফ।

স্বামীজিও বলতেন একেন তিনি অভিব্যক্তি—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈত। দ্বৈত আর বিশিষ্টাদ্বৈত অবস্থা থেকে অদ্বৈতভাবে পৌঁছানো যায়। অবশ্য অদ্বৈতভাবই ধর্মপথের চরম লক্ষ্য—তত্ত্বমসি; একমেবাদ্বিতীয়ম্। শ্রীঠাকুর ভাগবতপাঠ শুনতে শুনতে দেখেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তি, আর তার পাদপদ্ম থেকে বেরিয়ে আসছে জ্যোতি—যা ভাগবত স্পর্শ করল, তারপর শ্রীঠাকুরকে স্পর্শ করল। তাঁর উপলব্ধি হল, বস্তু পৃথক হলেও, অনন্তেরই প্রকাশসম্ভূত—তিনে এক, একে তিন।

স্বামীজির ধর্মবাদের উৎকর্ষ তো এইখানে। শ্রীঠাকুর তাঁদের তাই দেখিয়েছিলেন। নিজে আচরণ করে শিখিয়েছিলেন 'যত মত তত পথ'। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ। অভ্যাসযোগে তা উপলব্ধি করা সম্ভব। জীবন চলাই ধর্ম। কর্ম যদি অনাসক্ত হয়, ভক্তি যদি বিশ্বাসভিত্তিক হয়, জ্ঞান যদি শুদ্ধ হয়, তা'হলে পথ যা-ই হোক, সিদ্ধিলাভ হবেই। জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা কর্মবিরতি নয়। সক্রিয়তাই ধর্ম। সক্রিয়তাতে প্রাণের পরিচয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সব কোলাহলের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের সংহত সুরটি শিষ্য অর্জুনকে জানিয়েছিলেন। সংসারের দৈনন্দিন জীবনে ছোট বড় সব কাজের মাঝে সেই সুরটি বাজিয়ে যেতে হবে,—নিষ্কামকর্মের সুর, ফলবাসনারহিতের সুর। স্বামীজি বলেছিলেন অভ্যাসযোগে সাধারণ মানুষ জীবনে এ করতে পারে। ব্যবহারিক জীবনে এটা অবশ্যই সম্ভব। স্বামীজির, তাঁর গুরুভাইদের, তাঁদের শিষ্যপ্রশিষ্যদের মধ্যে কর্মের প্রাবল্য ও অনাসক্তি, তার অপূর্ব সাফল্য দেখা গেছে। বিরাটের উপলব্ধি এসেছে। প্রাণ বড় হয়েছে। হৃদয় সরস হয়েছে। অনুভূত হয়েছে। জীবই শিব। জীবের সেবা শিব বা ঈশ্বরের সেবা। জ্ঞানচক্ষু খুলেছে। স্পষ্ট দেখা গেছে শিল্প বিজ্ঞান ধর্ম সবই সত্যের অভিনব প্রকাশ। এটা বুঝতে গেলে মনে রাখতে হয়েছে সবেতে একেরই বিকাশ, দ্বিতীয় আর কিছু নেই।

এসব বলা সহজ, ভাবাও সহজ, তবে জীবনে প্রতিফলিত করা শক্ত। অভ্যাস-যোগে ও একজীবনে তা না-ও হতে পারে। স্বামীজির সে সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন শ্রীঠাকুরকে, যিনি দেখেছিলেন মহৎকে, যিনি নিত্য অনুভব করতেন উপনিষদের বাণী 'তত্ত্বমসি'।

প্রদীপ, তৈল, সলিতা, শলাকা সব থাকে। আঁধার এলে দীপ জ্বালা হয়। ধর্মের জগতে আঁধার নেমেছিল, সলিতা শলাকা তেল সংগ্রহ করে দীপ জ্বেলে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার আলো আজও ম্লান হয় নি, বরং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি যখন শিকাগো নগরে বিশ্বধর্মসম্মেলনে যোগদান করেন তখন হইতেই তিনি প্রতীচ্যে ধর্মপ্রচারক হিন্দু সন্ন্যাসী (Hindu Monk of India)-রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসীরা সঙ্গত কারণেই স্বামীজির এই নাম দিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে গেরিক হিন্দু-সন্ন্যাসের চিহ্ন। অতএব গেরিক বস্ত্র ও উত্তরীয়ধারী স্বামীজি তাঁহাদের কাছে হিন্দু মংক্। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে কিন্তু এই পরিচয় বাহ্য। ধর্মসম্মেলনে স্বামীজি প্রথমে যে বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই তাঁহার ধর্মতত্ত্ব এবং জীবনদর্শনের আদর্শ সত্যভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণকারী পাশ্চাত্ত্যের নরনারীকে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী যে ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে তাহা প্রতীচ্য কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। যে ধর্ম অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীকে এই ধর্মগ্রহণের অধিকার দেয় নাই বলিয়া তাহারা জানিত, সেই ধর্মের একজন প্রচারকের মুখে এই সম্বোধন তাহাদিগকে অবশ্যই অভিভূত করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বামীজি সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হইয়া এই সম্বোধন করেন নাই। পরমহংসদেবের কৃপাস্পর্শে বেদান্তধর্মকে যে উদার, মানবধর্মানুসারী দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছিলেন তাহার ফলেই তিনি জানিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মানবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ভাই-বোনের সম্পর্ক।

১৮৯৭-এ স্বামীজি ভারতে ফিরিয়া আসেন। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণকালে জনসাধারণের সহিত আন্তরিকভাবে

মেলামেশা করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য একান্তরূপেই বস্তুবাদী হইয়া উঠিয়াছে। বাহ্যসম্পদ আহরণ করিয়া ইহজীবনকে সুখকর করিয়া তোলাই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য। তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং কর্মপ্রচেষ্টা ঐ উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত। তাই তাহাদের আত্মা উপবাসী, জীবনে অতৃপ্তি। ভারতে ফিরিয়া স্বামীজি দেখিলেন যে, ভারতবাসী ইতিমধ্যে য়ুরোপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আত্মাকে অস্বীকার করিবার যে শক্তি বস্তুবাদী য়ুরোপ অর্জন করিয়াছে, ভারতবাসী তাহা করিতে পারে নাই। তাই তাহারা নির্বিচারে অন্ধভাবে য়ুরোপীয়দের অনুকরণ করিয়া চলিয়াছে। ভারতে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিবার প্রস্তুতি চলিতেছে। কিন্তু এই স্বদেশীভাব য়ুরোপের পেট্রিয়টিজমের অনুবাদমাত্র। ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় নাই; ইংরাজী শিক্ষার সহিত য়ুরোপীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের ফলে ভারতবাসীর মনে ভাবপ্রবণতার একটা উচ্ছ্বাস-মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামীজির চোখে ইহা একটা প্রবল বিভীষিকারূপে দেখা দিল। তিনি বুঝিলেন যে, জাতিকে সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্ত্যমোহমুক্ত করিতে হইবে।

স্বামীজি বেদান্তধর্মের যে মানবিকতাসম্মত ব্যাখ্যা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাকে মূলমন্ত্র করিয়া ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাকে অধ্যাত্ম-সাধনায় পরিণত করিতে চাহিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জাতীয় ঐতিহ্যকে অবলম্বন না করিলে সত্যকার জাতীয়তাবোধ জাগে না, আত্মা উদ্বোধিত না হইলে মানুষের চিত্ত সচেতন হয় না। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই য়ুরোপীয় জড়বাদের পরিবর্তে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। স্বামীজি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—ভুলিও না ভারত, তোমার নারীজাতির আদর্শ, তোমার উপাস্য দেবতা সর্বত্যাগের আদর্শ, তোমার জীবন সমাজ-সেবায় উৎসর্গীকৃত।

স্বামীজি ঘোষণা করিলেন যে, ভারতবাসীর স্বদেশ 'বিরাট

মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভারতবাসীমাত্রেই মহামায়ার সন্তান।' ভারতবাসীকে ডাকিয়া বলিলেন,—ভুলিও না নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ······বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ······'।

তাই আজ নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায় যে, ভারতের জাতীয়তাবোধকে অধ্যাত্ম-সাধনার পর্যায়ে উন্নীত করিয়া বহুমুখী ও ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার পথ স্বামীজি ভারতকে দেখাইয়াছেন। বিরাট মহামায়ার ছায়াস্বরূপ ভারতের সমাজদেহে নীচ বলিয়া অপমানিত, দরিদ্র বলিয়া পীড়িত, মূর্খ বলিয়া নিন্দিত সকল ভারত-বাসীকে মর্যাদা দান করিয়া তাহাদিগকে উন্নত না করিলে জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তাই স্বামীজি সেবাধর্মের আদর্শে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেবাধর্মে দীক্ষিত 'একদল আগুনের মতন তেজস্বী ও জোয়ান ছেলে' তৈয়ারী করার জন্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠ স্থাপিত হইল।

স্বামীজি ভারতবাসীকে যে বাণী এবং জীবনাদর্শ দান করিয়াছেন তাহা তাহাদের অন্তরে অবদান হইয়া রহিয়াছে। আজিকার ভারতবাসী স্বামীজিকে উদ্দেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে পারে,

ভুলে থাকা সে তো নহে ভোলা।
বিস্মৃতির মর্মে বসি' দিয়েছো যে দোলা।

বিবেকানন্দের সন্ধান ও সিদ্ধি — হরপ্রসাদ মিত্র

[প্রাক্‌-শিকাগো পর্ব]

১৮৬০ থেকে ১৮৮০,—সেকালের শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে এই বিশ বছরের প্রধান আন্দোলন মানে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও উৎসাহ-উদ্দীপনা, সামর্থ্য বা বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। সাহিত্যে মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন,—সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের নাম অবিস্মরণীয়। অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রথম ভাগ ছাপা হয় ১৮৭০-এ, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮০-তে। বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' দু' খণ্ড বেরোয় যথাক্রমে ১৮৭১ ও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ইত্যাদি বক্তৃতাগুলি 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' নামে ১৮৬১-তে সংকলিত হয়। সেই বছরেই রাজনারায়ণ বসুর 'ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' ছাপা হয়; তাঁর বক্তৃতা বেরোয় ১৮৭০-এ; 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' ছাপা হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬-র মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ সাধিত হয়। এ ছাড়া আরো নানা সৃষ্টি, নানা চিন্তা এবং ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। শাস্ত্রজ্ঞানের সন্ধানে, কর্মবৈচিত্র্যের উদ্দীপনায়, সৃষ্টির প্রেরণায় সেই যুগ ছিল বিশিষ্টতা-চিহ্নিত। বিবেকানন্দের শৈশব, বাল্য, কৈশোর কেটেছে সেই পর্বে। ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনে সে পর্বে কেশচন্দ্র আর প্রতাপ মজুমদারের নাম সর্বপ্রধান। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে বিলেত যাত্রা করেন। মনোমোহন ঘোষ তখন সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন। কেশবচন্দ্র বিলেতে গেছেন

১৮৭০-এ। তার আগেই ১৮৬৬-তে তাঁর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বিলেত থেকে ফিরে তিনি Indian Reform Association গড়েছেন। ১৮৭৬-এ Allbert Hall স্থাপন করেছেন। ভারতবর্ষের বিচিত্র জনগণের ঐক্যজাগৃতির জন্যে দয়ানন্দকে হিন্দি শিখে নিতে উৎসাহিত করেছেন তিনি। যে বছর কেশবচন্দ্র বিলেত যান, সেই ১৮৭০-এ বালক নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন ইনষ্টিট্যুশনে ভর্তি হন। ১৮৭৮-এ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' জন্মগ্রহণ করে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর শিবনাথ শাস্ত্রী সে-সমাজের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে গণ্য। নরেন্দ্রনাথ সে সভার সদস্য ছিলেন। কেশবচন্দ্রের 'নববৃন্দাবন' নাটকে তিনি যোগীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। প্রবেশিকার আগে থেকেই আহম্মদ খান আর বেণী গুপ্ত, এই দুই ওস্তাদের কাছে কণ্ঠসঙ্গীত আর যন্ত্রসঙ্গীতের পাঠ নেন। কলেজে পড়বার সময়ে বন্ধুমহলে বেশ জনপ্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। তখন খুব চা আর কফি খেতেন। ঘোড়া-চড়বার ঝোঁক ছিল। হার্বার্ট স্পেন্সারকে চিঠি লিখেছিলেন একবার। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিট্যুশনের অধ্যক্ষ W. W. Hastie সাহেব তাঁকে ভালবাসতেন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সুরেন বাঁড়ুজ্যে যখন মাৎসিনি গারিব্‌লডির কীর্তিকাহিনী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, নরেন্দ্রনাথ তখন সে বক্তৃতা শুনতে যেতেন। নবগোপাল মিত্র ছিলেন ঠনঠনে মিত্র-পরিবারের সন্তান, শিমুলিয়া দত্তবাড়ির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল,—দত্তদের দৌহিত্র তিনি। ভূপেন দত্ত লিখে গেছেন যে, নরেন্দ্রনাথ সে-সময়ে নবগোপাল আর কেশবচন্দ্রের প্রভাবের মধ্যেই যৌবন উদ্‌যাপন করেছেন। ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স তাঁর নিরন্তর বিদ্যার্জনে, বুদ্ধিচর্চায় কেটেছে। মহেন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায়—বিবেকানন্দ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাও খুব পড়েছেন। সেই সত্তরের দশকে, ১৮৭৫ থেকে কেশবচন্দ্র তাঁর 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় রামকৃষ্ণ পরমহংসের অসাধারণ

সাধকভাবের কথা লিখতে শুরু করেন। শোনা যায় 'পরমহংস' উপাধি নাকি কেশবচন্দ্রেরই দান। তাঁরই বাংলা পত্রিকা 'ধর্মতত্ত্ব'-তে ১৮৭৫-এর ১৪ই মে ভগবান রামকৃষ্ণের জীবনী ছাপা হয়। কেশবচন্দ্র আর অধ্যক্ষ হেষ্টির লেখালেখির ফলেই রামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শিক্ষিত-সমাজ প্রথম অবহিত হয়। ১৮৮১-র ৯ই অক্টোবর ও ১১ই ডিসেম্বরের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় ভগবান রামকৃষ্ণের কথা ছিল। ১৮৭৯-তে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্রনাথ ১৮৮০-তে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তিনি কলেজে যেতেন কালো আলপাকার চাপকান পরে, ট্রাউজার পরে,—কব্জিতে বাঁধতেন রিষ্টওয়াচ। কলেজের দ্বিতীয় বছরে পড়বার সময়ে তাঁর ম্যালেরিয়া হয়। তখন শরীর সারাতে কিছুদিনের জন্যে গয়ায় গিয়েছিলেন। পার্সেণ্টেজ কম ছিল বলে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ. পরীক্ষায় বসতে দিতে বাধা ওঠে। তখন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিট্যুশনে চলে যান। সেই সময়ে পিতা বিশ্বনাথ দত্তকে নরেন্দ্রনাথ বিলেত যাবার অভিপ্রায় জানান। কিন্তু বিশ্বনাথ রাজী হননি। তিনি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে চান নি। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন নরেন্দ্রনাথের একই কলেজের প্রবীণতর ছাত্র। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি বলে গেছেন এসব কথা। ১৮৮৩-তে বি. এ. পাস করে ১৮৮৪-তে নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটন ইনষ্টিট্যুশনের আইন-বিভাগে ভর্তি হন। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিট্যুশনে পড়বার সময়েই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ঠাকুর তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুল হন। সেই অবস্থায় একবার গিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। তারপর যান রামকৃষ্ণের কাছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রামকৃষ্ণের শেষ অসুখে সে-বার দায়িত্ব উপলক্ষ করে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রস্তুতি দেখা দেয়। চিকিৎসার জন্যে তাঁকে কলকাতায় শ্যামপুকুরে, পরে কাশীপুর বাগানবাড়িতে

নিয়ে যাওয়া হয়। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কালী, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা সেই সে-বার ব্রতে সম্মিলিত হন। কাশীপুর-বাগানবাড়ি থেকেই ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ-সংঘের সেবাব্রত রূপ নিতে থাকে। তাঁদের কর্মসূচী পরে সুচিহ্নিত হয় বটে, কিন্তু তখন থেকেই সূত্রপাত ঘটেছে বললে অন্যায় হয় না।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট, সোমবার প্রত্যুষে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লোকান্তরিত হন। সেই বছরেই বড়দিনের সময়ে ভক্ত-ভ্রাতৃমণ্ডলীর এক সম্মেলন হয়। কিন্তু সে-সময়ে এইসব সাধক ভক্তের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন না। সারদা দেবীর সঙ্গে তখন কোনো কোনো ভক্ত বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। যোগানন্দ আর লাটু মহারাজই ছিলেন সে-কালের রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রধান কর্মী।

নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা বিরজা হোম করে যথারীতি সন্ন্যাস নেন আরো কিছু পরে। ১৮৮৮ পর্যন্ত তিনি প্রধানতঃ বরানগরেই বাস করেন। তবে, সেই বছরেই হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে বারাণসী, অযোধ্যা, লখনউ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হাথরাস ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে আসেন। হাথরাসের স্টেশনমাষ্টার ছিলেন শরৎচন্দ্র গুপ্ত। নরেন্দ্র ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্টেশনে নামলেন, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। চাকরি এবং সংসার ছেড়ে,—ফার্সী ভাষায় এবং সুফী-দর্শনে অভিজ্ঞ শরৎচন্দ্র গুপ্ত 'সদানন্দ' নামে পরিচিত হন; রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন যে, এই সদানন্দ ছিলেন Franciscan Grace-এর প্রতিমূর্তি।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আবার ভ্রমণে বেরোন। সে-বার তিনি যান গাজীপুরে। রেঁালার মতে,—গাজীপুর ভ্রমণ পর্বটিতেই তিনি মানবকল্যাণ চিন্তা বা লোকহিতচর্চার আসল আদর্শের দেখা পান। ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে অল্পকালের জন্য তিনি গাজীপুরে আর এলাহাবাদে যান। এব সব ঘটনার মধ্যেই হিন্দু-বিশ্বাস আর আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে তিনি অন্বয় উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন।

১৮৯০-এর জুলাই মাসে তিনি বরানগর ছাড়েন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব লোকান্তরিত হবার পরে, সেই সময়ে গভীরভাবে তিনি নির্জনতা খুঁজছিলেন। আত্মানন্দ তাঁর সঙ্গে হিমালয়ে যান, গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আলমোড়ায় সারদানন্দ আর কৃপানন্দের দেখা পান তিনি। তুরীয়ানন্দও এসে পৌছান। ১৮৯১-এর জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে তাঁদের মীরাটে রেখে নরেন্দ্র চলে যান। তাঁরা দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছোন। অভিপ্রেত নিঃসঙ্গতায় এইভাবে বাধা পড়ায় নরেন্দ্র খুবই উত্তেজিত হয়ে তাঁদের বকাবকি করেন। তারপর ১৮৯১-এর ফেব্রুয়ারিতে দিল্লী ত্যাগ ক'রে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে 'ডিপথিরিয়া' রোগে তিনি বিপন্ন হন। কিন্তু পেছিয়ে যাবার মানুষ ছিলেন না তিনি। ১৮৯১ থেকেই তাঁর পরিব্রাজক-জীবন, কর্ম-ব্যাকুলতা, নির্জনতা-প্রীতি এবং জ্ঞান আর কর্মের ঐক্য সন্ধান তীব্র হয়ে ওঠে। ১৮৯১-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় যান রাজপুতানা, আলওয়ার,—তারপর জয়পুর, আজমীর, খেতড়ী, আহমেদাবাদ, কাথিয়াবাড়, জুনাগড়, গুজরাট,—পোরবন্দরে প্রায় আট ন' মাস কাটিয়ে দ্বারকায় পৌঁছোন,—বরোদা রাজ্যে যান,—খাণ্ডোয়া হয়ে, বোম্বাই হয়ে পুনায়,—১৮৮২-এর অক্টোবর মাসে বেলগাঁও,—বাঙ্গালোর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, ত্রিবান্দ্রম, মাদুরা দেখে রামেশ্বর,—সেই ১৮৯২-এরই শেষ দিকে পৌঁছেছিলেন কন্যাকুমারীতে। ১৮৯১-এর এপ্রিলে খেতড়ীর মহারাজার সঙ্গে বাস করেন তিনি। কিছুদিন হিমালয়ে তিব্বতীদের সঙ্গেও বাস করেছেন। কন্যাকুমারী থেকে পণ্ডিচেরি হয়ে তিনি মাদ্রাজে যান। আর, একথাও স্মরণীয় যে, ১৮৯৩-এর প্রথম দিকেই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পাশ্চাত্ত্য জগতে যাবার বাসনা প্রকাশ করেন তিনি।

কর্ম আর জ্ঞান, এই দুটি শব্দের ইঙ্গিত দুই পৃথক ক্ষেত্রের দিকে,—দুটি শব্দে পৃথক দুই অঞ্চল বুঝিয়ে থাকে,—স্বামী বিবেকানন্দের

জীবনে কিন্তু এই দুইটি ক্ষেত্র এক হয়ে দেখা দিয়েছিল। রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন—'Naren, with whom dream itself was action!' ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বাগবাজার থেকে কাশীনিবাসী প্রমদাদাস মিত্রকে নরেন্দ্রনাথ তাঁর মা আর দুই ভাইয়ের তখনকার দুরবস্থার কথা লেখেন। তাঁর পিতৃবিয়োগের পরে তাঁদের খুব-ই অশান্তিজনক পরিস্থিতিতে দিন কাটাতে হয়েছে। সেই চিঠিতে তিনি জানান—'ইহাদের অবস্থা পূর্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা দুর্বল দেখিয়া, পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল—হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটীর অংশ পাইয়াছেন—কিন্তু সর্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।' এই দুঃখ দেখে তাঁর মনে 'রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়'—এবং সেই কথা স্মরণ করেই 'গীতা'র শ্লোক উল্লেখ করে প্রমদাদাসকে তিনি আরো লেখেন—'আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশীবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়…।'

স্বামীজির সেই চিঠিতে তাঁর নিত্যসঙ্গী গীতা আর Imitation of Christ,—দুয়েরই উল্লেখ ছিল। গীতা থেকে তিনি স্মরণ করেছিলেন :

আপূর্য্যমাণ মচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অর্থাৎ, সমুদ্রে অজস্র জলধারা প্রবেশ করলেও সমুদ্রের যেমন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, তেমনি যাঁর মধ্যে অজস্র কামনা প্রবেশ করে লয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই শান্তিলাভ করেন ; যিনি সকাম কর্মে নিযুক্ত, তিনি অশান্ত। আর, Imitation of Christ থেকে তিনি স্মরণ করেন—'We have taken up the Cross. Thou hast laid it upon us,

and grant us strength that we bear it unto death. Amen.'

এই চিঠির পাঁচ বছর পরে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে তিনি লিখেছিলেন—'যদি নেতৃত্ব চাও সকলের গোলাম হয়ে যাও। জনকল্যাণের কর্মী যাঁরা, শিবানন্দকে তাঁদেরই কথাপ্রসঙ্গে সেই চিঠিতেই তিনি ইংরেজিতে যা লেখেন তার বঙ্গানুবাদ এই—যে কোনো ভাষারই আবরণে থাকুক না কেন, মানুষ ভালবাসা আপনা হতেই টের পায়।' রামকৃষ্ণ পরমহংসের এই প্রেমেই তিনি তাঁর 'কেনা গোলাম' হয়েছিলেন। শিবানন্দকে তিনি লেখেন—'ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই',—আবার,—'দাদা, বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে যে কি আছে তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India.'

এই ইংরেজির পরেই আবার বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে লেখেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most prefect—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট, কারুর সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি জন্ম-জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর

উপদেশ ফলবান হোক। তিনি কি নামের দাস? তাষা, যীশুখ্রীষ্টকে জেলে মালায় ভগবান বলেছিল, পণ্ডিতেরা মেরে ফেল্‌লে, বুদ্ধকে বেনেরা খালি তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির শেষভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে।'

কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইত্যাদি সাধক মনীষীর প্রতি ইঙ্গিত এখানে স্পষ্টই বোঝা যায়।

১৮৮৮-র ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকজন গুরুভ্রাতার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে যান। আঁটপুর স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি। ১৩৫৫ সংস্করণের প্রথম খণ্ডের 'পত্রাবলীর' প্রথম চিঠি আঁটপুর থেকে লেখা—মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের উদ্দেশ্যে। স্বামীজি মহেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—'আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন। হায়, অতি অল্প লোকেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে।' ১২ই আগস্ট ১৮৮৮ থেকে শুরু করে ৪ঠা জুন ১৮৯০ পর্যন্ত প্রায় দু'বছরের মধ্যে কাশীনিবাসী প্রমদাদাস মিত্রের কাছে লেখা তাঁর অনেকগুলি চিঠি ছাপা হয় প্রথম খণ্ডে। অযোধ্যা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থভ্রমণের উল্লেখ আছে এই সব চিঠির মধ্যে,—আবার কখনো বরাহনগর মঠ থেকে, কখনো বা বাগবাজার থেকে লেখা কয়েকখানি চিঠিতে রামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর বেদান্ত-পাঠ, পাণিনি-ব্যাকরণ চর্চা ইত্যাদির কথা আছে। ১৯-এ নভেম্বর ১৮৮৮ তারিখে বরাহনগর মঠ থেকে তিনি কাশীপ্রবাসী প্রমদাদাসকে জানিয়েছিলেন—'এই মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন ভরসা করি। বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়েই তাঁরা পাণিনি পড়তে আগ্রহী হয়েছিলেন। প্রমদাদাস সেই সময়—সম্ভবতঃ ১৮৭৯-এর প্রথম দিকেই নরেন্দ্রনাথকে

কাশীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি গুরুদেবের জন্মভূমি দেখতে বেরিয়ে নরেন্দ্রনাথ পথে রোগাক্রান্ত হন। প্রথমে জ্বর হয়, তারপর ভেদবমি। সে-বারে তাই আর কাশী যাওয়া হয়নি। ২১-এ মার্চ ১৮৮৯ তারিখের চিঠিতে তিনি লেখেন—'অধুনা কাশী যাইবার সঙ্কল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, পরে শরীরগতিক দেখিয়া ঈশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে।' জ্ঞানানন্দ তখন কাশীতে। রাখাল আর সুবোধ—দুই গুরুভ্রাতা কাশীতে যান ঐ ১৮৮৯ সালের শেষ দিকে। গঙ্গাধর এবং আর চারজন ভক্ত তখন উত্তরাখণ্ডে। গঙ্গাধর তিব্বতে ঘুরে আসেন। তিনি ভুটানেও গিয়েছিলেন। কেদারনাথ তীর্থের পথে শ্রীনগরে শিবানন্দ নামে নরেন্দ্রনাথের এক গুরুভ্রাতার সঙ্গে গঙ্গাধরের দেখা হয়। তিব্বতীরা ফিরিঙ্গির চর মনে করে গঙ্গাধরকে কেটে ফেলতে উদ্যত হয়। কিন্তু কোনো কোনো লামার করুণায় তিনি বেঁচে যান।

১৮৮৯-এর ৪ঠা জুলাইয়ের চিঠিতে নরেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, শিমুলতলায় তাঁর পূর্ব-অবস্থার এক আত্মীয় একখানি বাড়ি কিনেছিলেন এবং সে-বাড়িতে ঐ সময়ে নরেন্দ্রনাথ নিজের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কিছুদিন ছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত গরমের ফলে উদরাময় দেখা দিতেই তিনি শিমুলতলা পরিত্যাগ করেন। সেই চিঠিতে নরেন্দ্রনাথের নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঈষৎ উল্লেখ আছে। নিজেদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর নিজের তখনকার স্মরণীয় মন্তব্য বলেই সে-অংশটুকু এখানে উল্লেখযোগ্য :

> 'ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমার জীবনের গত ৬।৭ বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ,

> কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোনো উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্স্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট।'

হাইকোর্টে মকদ্দমার খরচা যোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে, নরেন্দ্রনাথের মা আর ভাইয়েরা পৈতৃক বাড়ির ভাগটুকুই শুধু পেয়েছিলেন। সে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু সে-বার সেই মকদ্দমা শেষ হয়ে গেলে তিনি কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত বোধ করেন। প্রমদাদাসের আশীর্বাদ কামনা করে তিনি 'চিরদিনের মত বিদায়' প্রার্থনা করেন। তখন নরেন্দ্রনাথের ঠিকানা ছিল—বলরাম বসুর বাড়ি, ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তাঁর মনে তখন—একদিকে সংসারের নানাদুঃখে কতকটা অভিভূত ভাব আর কতকটা আধ্যাত্মিক সত্য-জিজ্ঞাসা, দুইই কাজ করছে। প্রমদাদাসের সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। সে সময়ের এক চিঠিতে প্রমদাদাসের কাছে তিনি বারো দফা প্রশ্ন জানিয়েছেন। সে-চিঠির তারিখ ১৭ই আগস্ট, ১৮৮৯। সে-সব প্রশ্ন গভীরভাবে তাঁরই নিজস্ব ভাবজীবনের সঙ্গে জড়িত। যেমন, একটি প্রশ্নে তিনি জানান—'যে ঈশ্বর বেদ-বক্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ করিতেছেন। কোন্ কথা শোনা উচিত? পরের বিধি প্রবল, না আগের বিধি প্রবল?' চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রমদাদাসের সঙ্গে তাঁর আরো অনেক আলোচনা হয় সে-সময়ে। শঙ্করের বিবর্তবাদ,—জার্মান Transcendalist-দের সম্বন্ধে স্পেন্সারের বিদ্রূপ, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি নানা মত নানা দৃষ্টির কথা উঠেছিল। ১৮৮৯-এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে তিনি বৈদ্যনাথে পূর্ণবাবুদের বাড়িতে ছিলেন। সেখান থেকে কাশী যাত্রা করেন, কিন্তু গুরুভ্রাতা যোগেন্দ্র তখন চিত্রকূট, ওঙ্কারনাথ ইত্যাদি দেখে প্রয়াগে পৌঁছে বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে সেবা করবার জন্যে সেখানে গিয়ে পৌঁছোন। ৩০এ ডিসেম্বর সেই প্রয়াগধাম থেকেই প্রমদাদাসকে

পুনরায় চিঠি লেখেন। এলাহাবাদে তিনি চক অঞ্চলে ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাড়িতে ছিলেন।

১৮৯০-এর জানুয়ারিতে [২১এ জানুয়ারি] তিনি গাজীপুরে গিয়ে তাঁর বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন। গাজীপুরে পওহারী বাবাকে দেখবেন বলেই সে-বার গাজীপুরে যাওয়া। পওহারী বাবা থাকতেন উঁচু পাঁচিলে ঘেরা এক বাড়িতে। বাড়ির বাইরে আসতেন না তিনি। দরজায় দাঁড়িয়ে, ভেতর থেকেই নিজের ইচ্ছেমতন কখনো কখনো কারও-কারও সঙ্গে কথা বলতেন। বিবেকানন্দ ৩১এ জানুয়ারির চিঠিতে লিখেছিলেন যে, বাবাজীকে দেখবার চেষ্টা করছেন তিনি, কিন্তু দেখা মেলেনি। তারপর ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০-এর চিঠিতে বাবাজীর দর্শনলাভ,—তাঁর মহাপুরুষতার সম্বন্ধে নিজের সংশয়মোচন ইত্যাদির কথার উল্লেখ আছে : তাঁর নিজের কথায়—ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের আশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত 'নিদর্শন'। শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দ সে চিঠিতে লিখে গেছেন— 'আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না।' তাঁরই আজ্ঞা মতন সে-বার কিছুকালের জন্য তিনি সেখানে ছিলেন। আর, তিনি নিজে একথাও লিখে গেছেন— 'ইঁহাদের লীলা না দেখিলে শাস্ত্রে পুরা বিশ্বাস হয় না।' আবার মার্চের প্রথম দিকেই [৩রা মার্চ, ১৮৯০] প্রমদাদাসকে তিনি পওহারী বাবা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহমান্দ্যের কথাও জানিয়েছেন। পওহারীর সাধনা অপূর্ণ আছে—এরকম সন্দেহের কথাও আছে।

১৮৯০-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারি গাজীপুর থেকে কলকাতায় বলরাম বসু মহাশয়কে অশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি যে চিঠি লেখেন তাতেও পওহারী বাবার প্রসঙ্গ ছিল। ঐ ফেব্রুয়ারি মাসেই স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা একখানি চিঠিতে তিনি উত্তরকুরুবর্ষ—অর্থাৎ তিব্বত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। বুদ্ধদেবকে তিনি যে খুবই ভক্তি

করতেন, সে বৃত্তান্তেরও উল্লেখ ছিল সেই চিঠিতে। প্রসঙ্গতঃ এদেশে তন্ত্রসাধনার ধারা সম্বন্ধে তিনি জানান যে, বৌদ্ধরাই আমাদের দেশে তন্ত্র প্রবর্তনার জন্য দায়ী। বামাচারের আতিশয্যে তারা যখন নির্বীর্য হয়ে পড়ে, তখন কুমারিল ভট্ট তাদের তাড়িয়ে দেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে থাকে। বর্মা ও সিংহলের বৌদ্ধেরা তন্ত্র মানেন না, কিন্তু তিব্বতের বৌদ্ধেরা মানেন। বেদের কর্মবাদ অন্যান্য ধর্মের কর্মবাদের সঙ্গে মেলে। কর্মের উদ্দেশ্য—'বাহ্যোপকরণ দ্বারা অন্তর শুদ্ধ করা'। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, এ পৃথিবীতে বুদ্ধদেবই প্রথম মানুষ—The first man,—যিনি এর বিপক্ষে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। বুদ্ধদেব আর শঙ্করাচার্য—এই দুই মহাত্মার ধর্মসাধনার সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্ক উল্লেখ করে তিনি বলেছেন: উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের হৃদয় পাননি। বিবেকানন্দ তাঁর সেই চিঠিতেই জানিয়ে গেছেন—'বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর'। স্বামী অখণ্ডানন্দ 'সুত্তনিপাত' থেকে গণ্ডার-সুত্তের অনুবাদ করেছিলেন। সেই অনুবাদের প্রশংসা করে বিবেকানন্দ গীতার (৬।৮) জ্ঞান-বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ' অবস্থার দিকে তর্জনী নির্দেশ করেন।

ঐ বছর মার্চ মাসে গাজীপুর থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দকে তিনি যা লিখেছিলেন, তারই এক জায়গায় ছিল—'বাঙ্গালা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়।' হঠযোগে ব্রতী বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর এই মন্তব্যটির গুরুত্ব কম নয়। ১৮৯০-এর কাছাকাছি সময়ে তাঁর এই মানসিক অবস্থা এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের এই দিকটি দেখবার মতন। পওহারী বাবা ছিলেন রাজযোগী। রাজযোগীদের সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ কমতে থাকে এবং ঐ মার্চ মাসে তিনি এই কথা ভাবতে থাকেন যে, আর কোনো

মিঞার কাছে যাবার দরকার নেই। এই সূত্রেই রামপ্রসাদের গানের কলি স্মরণ করেছিলেন :

আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরমধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
(ও মন), কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচত্বয়ারে ॥

সেইসব কথার সঙ্গেই সে-পর্বের চিঠিপত্রে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর গভীর যোগাযোগের কথা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন—রামকৃষ্ণ নিত্য-সিদ্ধ মহাপুরুষ কিংবা অবতার।

মার্চের শেষ দিকের [৩১-এ মার্চ ১৮৯০] এক চিঠিতে তিনি তাঁর তখনকার মানসিক অশান্তির কথা আবার জানিয়েছিলেন—'আমার গুরুভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবারাত্রি কি যাতনা ভুগিতেছি কে জানিবে?'

২৬-এ মে ১৮৯০ তারিখে, ৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীটের বাড়ি থেকে প্রমদাদাসকে লেখা এক চিঠিতে তিনি আবার জানান—'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে "দেই তুলসি তিল দেহ সমর্পিলুঁ" করিয়াছি'। তারপর নিজের গুরুদেব সম্বন্ধে তিনি পুনরপি জানান—'আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।' ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই মত ছিল যে, পূর্ণসিদ্ধ ব্যক্তি ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু দেহাদি ভাবনার নিবৃত্তি যতক্ষণ না ঘটে, দেহীর দেহসংস্কার যতক্ষণ অন্তর্হিত না হয়, ততক্ষণ এক জায়গায় বসে সাধনা করাই দরকার। সেই প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিয়ে বিবেকানন্দ বলেন : 'অতএব উক্ত নির্দেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসীমণ্ডলী বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন, সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম

বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদির খরচ এবং বাটীভাড়া দিতেন। তাঁর সেই চিঠিতেই সুরেশবাবুর মৃত্যুর খবর ছিল—'তিনি কল্যরাত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন'। বলরাম-বাবু তার অল্প আগেই মারা গেছেন। ১৫ই মার্চ ১৮৯০-এর চিঠিতে বলরামবাবুকে তিনি তাঁর কাছে আর চিঠি লিখতে নিষেধ করেন। বলরামবাবুর এবং সুরেশবাবুর অসুস্থতার খবর পেয়ে সেই চিঠিতে তিনি উদ্বেগও প্রকাশ করেন।

বিবেকানন্দের পত্রাবলীর মধ্যে তাঁর এই চিঠিখানিও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রমদাদাসকে তিনি এই কথা জানিয়েছিলেন যে, কাশী প্রভৃতি দূর অঞ্চলে হয়তো চাঁদা উঠতে পারে। কলকাতার কাছা-কাছি গঙ্গাতীরে জমি কিনতে ৫।৭ হাজার টাকা লাগবে। সুতরাং স্থায়ী একটি মঠ বা আশ্রমের জন্যে চাঁদা তোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এদিকে, বলরামবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়েই বিবেকানন্দ গাজীপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন। সে-সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঠের খরচ চালাতে থাকেন।

১৮৯০-এর ৬ই জুলাই তারিখে স্বামী সারদানন্দকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে জানা যায় যে, অতঃপর তিনি নিজে আলমোড়ায় যেতে উদ্যোগী হন—'সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ইচ্ছা ; গদাধর আমার সঙ্গে যাইতেছে'। তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের অব্যবহিত পূর্বাবস্থা এবং পরিব্রাজক-পর্বটুকুও বিশেষভাবে দেখা দরকার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগের সময় থেকে শুরু করে, পরবর্তী ছ'সাত বছরের নিরন্তর সংঘ-গঠনের মনোযোগ ও কর্মব্যস্ততার পাশাপাশি তাঁর আধ্যাত্মিক সন্ধান ও স্বীকৃতির অজস্র তথ্য সাজিয়ে দেখলেই তাঁর আত্মোপলব্ধির সূত্রগুলি পাওয়া যাবে। এই বিচিত্র ভ্রমণের মধ্যেই ১৮৯১-এর এপ্রিলে তিনি আজমীর থেকে আবুপাহাড়ে যান। ১৮৯২-এর

সেপ্টেম্বরে তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ে। ২০শে সেপ্টেম্বর খেতড়ীর পণ্ডিত শঙ্করলালকে তিনি লিখেছিলেন: ভারতবর্ষীয়দের বিদেশ ভ্রমণ দরকার, মানবসেবার আদর্শে তাদের অনুপ্রাণিত হওয়া দরকার। ১৮৯৩-এ মাড়গাঁও থেকে হরিপদ মিত্রকে লেখা চিঠিতে তাঁর দক্ষিণ ভারতের পাঞ্জেম প্রভৃতি গ্রাম ভ্রমণের উল্লেখ আছে। এই চিঠিতে তিনি 'সচ্চিদানন্দ' নাম সই করেন। আমেরিকা-যাত্রার কিছু আগে থেকে আমেরিকা-যাত্রা পর্যন্ত এই নামেই তিনি চিঠি সই করতেন। ২১-এ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদের খার্তাবাদে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে লেখা আলাসিঙ্গার নামে একখানি চিঠি পাওয়া গেছে। সেই চিঠিতে তাঁর আমেরিকা-যাত্রার আয়োজনে কিছু যে দেরি হয়ে গেছে—অতিরিক্ত গরমের জন্যে তিনি যে রাজপুতানায় ফিরতে পারবেন না, ইত্যাদি কিছু-কিছু ব্যক্তিগত খবর ছিল। তবে ২৭-এ এপ্রিল, ১৮৯৩ তাঁকে রাজপুতানায় খেতড়ীতে বিদ্যমান দেখা গেছে। সেখান থেকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। বিবেকানন্দের সন্ধান ও সিদ্ধি বলতে যা বোঝায়, একদিকে সে তাঁর সারা জীবনের তপস্যা, অন্যদিকে যে-তপস্যার ফললাভের জন্যে মানব-জগতের প্রস্তুতি বা সামর্থ্য। তাঁর সন্ধানের দিকটিই এখানে আলোচিত হোলো। তাও সম্পূর্ণ নয়। আগেই সে-কথা বলা হয়েছে। শিকাগো যাত্রার আগে পর্যন্তই এ-আলোচনার সীমা। আর, তাঁর সিদ্ধি তো জগৎব্যাপী। সেটি অনুভূতির বিষয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

[স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পূর্বে]

ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুরারির শেষ ভাগে লণ্ডন হইতে রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত এক জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষে কলিকাতায় কংগ্রেস হয়। এই কংগ্রেসের অধিবেশনের কিছু পূর্বে রেভারেণ্ড ওড ও মিঃ ওকাকুরা, এই দুইজন জাপানী ভদ্রলোক বেলুড় মঠে স্বামীজির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বেলুড় মঠেই কিছুদিন বসবাস করিলেন। শিকাগোর মত জাপানে একটি ধর্মমহাসভা হইবে এবং স্বামীজি যাহাতে ঐ সভায় উপস্থিত হন, তারই জন্য এই দুই জাপানী ভদ্রলোক স্বামীজিকে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজি বলিলেন তাঁহার শরীর সুস্থ থাকিলে তিনি অবশ্যই যাইবেন।

মিঃ ওকাকুরা প্রাচ্য দেশীয় আর্টের এক অতি উচ্চ শ্রেণীর সমঝদার ব্যক্তি। প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে তিনি একজন আদর্শবাদী। তিনি স্বামীজিকে সঙ্গে লইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বুদ্ধগয়া দেখিতে গেলেন। ভগিনী নিবেদিতা তখন লণ্ডন হইতে ভারতাভিমুখে সমুদ্রপথে মোম্বাসা নামক জাহাজে রমেশ দত্তের সহিত অবস্থান করিতেছেন। স্বামীজি বুদ্ধগয়া হইতে কাশীতীর্থে আসিলেন। কাশীতে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া মিঃ ওকাকুরা স্বামীজির নিকট হইতে বিদায় লইলেন। স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের মেলার পূর্বেই কাশী হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন—

'Yet he made one more journey, lasting through January and February 1902, when he went, first to

Bodh Gaya and next to Benaras. It was a fit end to all his wanderings.'*

স্বামীজি কলিকাতায় ফিরিবার পর পৃথিবীর দূর দেশ হইতে তাঁহার অনেক শিষ্য এই সময় তাঁহার সহিত সক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

'Many of his disciples from distant parts of the world gathered round his Swami on his return to Calcutta.'**

এই বেলুড় মঠেই মিঃ ওকাকুরা ও মিঃ টাইকানের সহিত স্বামীজির জীবিতকালে ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সাক্ষাতের গুরুত্ব খুব বেশী। কেননা, পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতার সহিত ওকাকুরার – প্রাচ্য-প্রীতির সম্পর্কে একমত হইয়া— ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা দেয়।

ঠাকুরবাড়ির অনেকের সহিত ওকাকুরার পরিচয় হয়। সরলাদেবীর সহিতও ওকাকুরার পরিচয় হয়।

মিঃ ওকাকুরা বিপ্লববাদী ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও প্রিন্স ক্রপট্কিন-এর দ্বারা [১৮৯০-১৮৯৫] প্রভাবান্বিতা হইয়া, স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব হইতেই বিপ্লববাদী হইয়া 'আইরিশ হোম রুল' আন্দোলনে কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল, মে ও জুন স্বামীজি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। এই তিন মাস এক ফোঁটাও ঠাণ্ডা জল তাঁহাকে পান করিতে দেওয়া হয় নাই। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই তিন মাস তিনি দারুণ গ্রীষ্মেও এককোঁটা ঠাণ্ডা জল পান করেন নাই। ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন :

...the Swami made a great effort in the spring of 1902, to recover his health and even undertook a

* The Master As I Saw Him ; pp. 499.

** The Master As I Saw Him ; pp. 499-500.

course of treatment under which, throughout April, May and June, he has not allowed to swallow a drop of cold water. How far this benefited him physically one does not know ; but he was overjoyed to find the unflawed strength of his own will, in going through the ordeal······When June closed, however, he knew well enough that the end was near.'*

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে আর দেরি নাই, মৃত্যু আসিয়াছে।

২৮শে জুন প্রাতঃকাল। নিবেদিতা বাগবাজারে তাঁহার নূতন ভাড়াটিয়া বাড়ি হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলেন স্বামী বিবেকানন্দ দুইজন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়িতেই আসিতেছেন। নিবেদিতা উল্লাসে 'জয়, জয় গুরু' বলিয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামীজি একা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে থাম, চৌকাঠ, দেওয়াল ও একটি ডুমুর গাছ ধরিতে ধরিতে অগ্রসর হইলেন। তারপর তিনি দোতলায় উঠিয়া গিয়া একখণ্ড মৃগাজিনে উপবেশন করিলেন। এই মৃগচর্মটির উপর বসিয়া স্বামীজি বহু বৎসর ধ্যান করিয়াছেন এবং মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ইহা তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে দান করিয়াছেন। স্বামীজি বলিলেন, 'আমি এই বাড়িটি পছন্দ করি। এখানে তোমার কাজ করিবার সুবিধা হইবে। ছোট শিশুটিকেও স্নেহ ও যত্ন করিবে, কেননা একটি ছোট কীটের মধ্যেও মহত্ত্ব লুক্কায়িত থাকে।' এই কথোপকথনের মধ্যে স্বামীজি কতকগুলি মাটির পুতুল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। এগুলি নিবেদিতা তাঁহার ছাত্রীদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। স্বামীজি আরও দেখিলেন

* The Master As I Saw Him ; pp. 502-5.

যে, কাঠের বাক্সে 'ম্যাজিক লণ্ঠন' ও 'মাইক্রস্‌কোপ' রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া স্বামীজি উৎসাহিত হইলেন। স্বামীজি বলিলেন, 'আগামী কাল প্রাতে তুমি বেলুড় যাইও। তুমি সন্ন্যাসীদের সম্মুখে স্কুল সম্বন্ধে তোমার ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী বুঝাইবে।' নিবেদিতা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এই রকম এতটা তিনি আশাও করেন নাই। বিদায়ের সময় নিবেদিতা স্বামীজিকে বলিলেন, 'নতুন বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় আপনি কি আসিয়া আশীর্বাদ করিবেন?' স্বামীজি উদাসভাবে মৃদু হাস্য করিলেন। নিবেদিতার স্কন্ধে হস্ত আরোপ করিয়া সুমিষ্ট স্বরে (যাহার সহিত নিবেদিতা বহুদিন হইতে পরিচিত) বলিলেন, 'আমার আশীর্বাদ সর্বদাই তোমার উপর রহিয়াছে।'

পরের দিন, ২৯শে জুন, স্বামীজির আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতা প্রাতে বেলুড় মঠে আসিলেন। মঠে উপস্থিত হইয়া ভগিনী নিবেদিতা দেখিলেন যে, স্বামীজি যেন সুখ ও দুঃখের ঊর্ধ্বে তূরীয় অবস্থায় আত্মস্থ হইয়া আছেন। সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সমক্ষেই স্বামীজি ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল, বেলা বেশ বাড়িয়া উঠিল; সন্ন্যাসীরা গভীর মনোযোগের সহিত স্বামীজির বাণী শুনিতেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাকে সন্ন্যাসীরা যে ঠিক ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, স্বামীজি তাহা জানিতেন। তাই, তিনি নিতান্ত নির্ভীক ও নিপুণভাবে নিবেদিতার জটিল চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের বলিলেন যে, স্বামীজির নিজের মতোই নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব কখনও কখনও এতই জটিল ও বিচিত্র বোধ হয় যে, সময় সময় একই মানুষের মধ্যে এরূপ বিচিত্র ও বিভিন্ন কর্মতৎপরতা সম্ভব মনে হয় না; কিন্তু মূলতঃ নিবেদিতা নিতান্তই নিষ্ঠাবতী—একাগ্র ধীশক্তি এবং আন্তরিক আত্ম-নিবেদনের বলে নিবেদিতার মধ্যে বিভিন্নমুখী ব্যক্তিত্বের একত্র সমাবেশ লক্ষ্য করা

যায়। নিবেদিতা চলিয়া অসিবার পূর্বে স্বামীজি পুনঃ পুনঃ তুইবার তাঁহার মস্তক সস্নেহে স্বীয় করতলে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

নিবেদিতার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া স্বামীজি নিবেদিতার সম্মুখেই মঠের সন্ন্যাসীদের অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বলিলেন যে, বহু ব্যক্তিত্বের একত্র সমাবেশ নিবেদিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

নিবেদিতার চরিত্রগত সত্তা সম্পর্কে স্বামীজি তাঁহার মৃত্যুর মাত্র চারদিন পূর্বে এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। শুধু নিবেদিতাই যে স্বামীজিকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা নয়; স্বামীজিও নিবেদিতাকে ঠিক মতোই চিনিতে পারিয়াছিলেন, যাহা অপর কেহ পারেন নাই।

স্বামীজি ২৮শে জুন বাগবাজারে নিবেদিতাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। চার দিন পর [৩রা জুলাই] নিবেদিতা নিজের মনে একটি প্রেরণা পাইয়া সহসা বেলুড় মঠে স্বামীজির কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে দিন বুধবার, একাদশী ছিল। ঐ দিন হিন্দুপ্রথা অনুসারে উপবাস করিতে হয়। যে মুহূর্তে স্বামীজি নিবেদিতার আগমনবার্তা শুনিতে পাইলেন, সেই মুহূর্তেই তিনি নিবেদিতাকে তাঁহার খুব কাছে আসিতে বলিলেন। এই অকস্মাৎ সাক্ষাত একটা পরম বিস্ময়ের বস্তু। স্বামীজি বুঝিলেন যে, নিবেদিতা তাঁহার নিকট শেষ বিদায় চাহিতে আসিয়াছেন। স্বামীজি নিজে একাদশীর উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিবেদিতার জন্য প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করিলেন। নিরামিষ তরকারি, ভাত, ফল, দই—পাথরের থালা ও বাটিতে সাজাইয়া নিবেদিতার সম্মুখে দিলেন। নিবেদিতার আপত্তি সত্ত্বেও স্বামীজি নিজেই তাঁহাকে খাদ্য পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভোজন শেষ হইলে একজন হাত ধুইবার জল ও তোয়ালে আনিল। স্বামীজি উহা সেই লোকটির হাত হইতে নিয়া নিজেই উপুড় হইয়া নিবেদিতার হাতের উপর জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। নিবেদিতা

হতভম্ব হইয়া বলিলেন, 'স্বামীজি, এ কাজ তো আপনাকে আমারই করা কর্তব্য।' স্বামীজি একটু শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, 'যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদের পা ধুইয়া দিয়াছিলেন।' নিবেদিতার মুখে আসিল ইহা সত্য, কিন্তু ইহা মৃত্যুর ঠিক পূর্বের ঘটনা।

কিন্তু তিনি ইহা বলিতে পারিলেন না। নিবেদিতা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। স্বামীজি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাঁহার মাথায় আশীর্বাদ করিলেন। চক্ষু বুজিয়া থাকিলেও নিবেদিতা বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামীজি তাঁহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন।

নিবেদিতা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া কৃপণ যেমন বহু ধনরত্ন লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, সেইরূপ বাগবাজারে নিজের বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত রাত্রিই তাঁহার মন ঐরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল।

পরদিন [৪ঠা জুলাই] প্রাতঃকালে একজন সন্ন্যাসীকে দিয়া স্বামীজি নিবেদিতাকে একখানি 'প্রসাদী' কেক্ (cake) পাঠাইলেন। ওই কেক্খানি সোনালী রঙের পাতায় আবৃত ছিল এবং ইহার কিয়দংশ তিনি নিজের জন্য রাখিয়া 'প্রসাদ' করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নিবেদিতা এই কেক্ প্রসাদ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং ঐ কেক্টি দুই হাতে তুলিয়া বার বার মাথায় স্পর্শ করাইতে লাগিলেন। সমস্ত দিন এইরূপ আনন্দ-বিহ্বলতার মধ্যে কাটিল। রাত্রিতে ছাতের উপর বেলুড়ের দিকে মুখ রাখিয়া নিবেদিতা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

স্বামী সারদানন্দের চিঠি লইয়া [৫ই জুলাই] প্রাতে এক ব্যক্তি আসিয়া ভগিনী নিবেদিতাকে দিল। চিঠিতে লেখা ছিল: 'প্রিয় নিবেদিতা, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। গতরাত্রে নয়টার সময় স্বামীজি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। তিনি আর জাগিবেন না।—সারদানন্দ।'

'My dear Nivedita, the end has come. Yesterday

Swamiji fell asleep at nine o'clock in the night, no more to awake. —*Saradananda*'

চিঠির অক্ষরগুলি যেন নিবেদিতার চোখের সম্মুখে নাচিতে লাগিল। গৃহের ভিতর একটি অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল। নিবেদিতা ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ঝি সব বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল। নিবেদিতা পত্রবাহকের সহিত তৎক্ষণাৎ বেলুড় অভিমুখে রওনা হইলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন. এই সংবাদ সকলেই জানিতে পারিয়াছে এবং হতাশভাবে বেলুড়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

[স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর]

১৯০২, ৫ই জুলাই। যে লোকটি স্বামী সারদানন্দের চিঠি আনিয়াছিল, ভগিনী নিবেদিতা তাহার সঙ্গেই ঝড়ের মত বেগে বেলুড় অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। তিনি মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; সমস্ত চুপচাপ। নিবেদিতা একাকী উপরে স্বামীজির ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরটি অতিশয় অন্ধকার। কেননা, দরজা জানালা সমস্তই বন্ধ ছিল, মাছি ভন্ ভন্ করিতেছিল। মেঝেতে স্বামীজির মৃতদেহ শায়িত অবস্থায় পড়িয়াছিল। মৃতদেহটি হরিদ্রাবর্ণের পুষ্পে আবৃত ছিল। নিবেদিতা মৃতদেহের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং স্বামীজির মস্তক নিজের ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া স্বামীজির মুখে বাতাস করিতে লাগিলেন।

নিবেদিতা কোনরূপ শোক প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার শোক যেন মরিয়া গিয়াছে। নিবেদিতা মনে ভাবিলেন যে, অমরনাথে স্বামীজি বলিয়াছিলেন যে, শিব তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন। এখন তিনি নিজের ইচ্ছাতেই তাঁহার ক্লান্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

নীচে শব্দ শোনা যাইতেছিল, নিবেদিতা নিজের ক্রোড় হইতে স্বামীজির মস্তক নামাইয়া যেমনটি ছিল সেইরূপ ফুলের বালিশের

উপর পুনরায় স্থাপন করিলেন। সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং গতকল্য ভোর হইতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীজি কি কি করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতে লাগিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, 'আমি কিছুদিন হইতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিতেছিলাম না। উহা যেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের মত দেখাইতেছিল।'

তারপর একটি জনতা ঘূর্ণাবর্তের মত ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। নিবেদিতা বুঝিলেন যে, এইবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন চলিতেছে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিবেদিতা এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, 'হে ঈশ্বর, কেন একজন অপরকে দিবার জন্য নিজেকে এইরূপভাবে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিবে?'

নীচে মঠের সম্মুখে উঠানে স্বামীজির মৃতদেহ স্থাপন করা হইল। একটি বিরাট জনতা চারিদিকে জড় হইয়াছে। স্বামীজির বদনমণ্ডল যুবকের মত দেখাইতেছিল। তাঁহার মুখ অনাবৃত ছিল, মনে হইতেছিল যেন তিনি ঘুমাইয়া আছেন তাঁহার বয়স চল্লিশেরও কম। সন্ন্যাসীরা স্তব্ধভাবে সারি সারি দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই মস্তক মুণ্ডিত। বিদায়-প্রার্থনা খুব সংক্ষিপ্ত। একজন সন্ন্যাসী একটু মসলিন কাপড়ের উপর পায়ে আলতা দিয়া স্বামীজির পদচিহ্ন তুলিয়া লইলেন। প্রদীপ লইয়া মৃতদেহকে আরতি করা হইল। মন্ত্র উচ্চারিত হইল; ধূপ জ্বালানো হইল। ঘন ঘন হৃদয়-বিদায়ক শঙ্খধ্বনি করা হইল। শেষ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সন্ন্যাসীরা জোড়হস্তে নতজানু হইলেন। কেহ কেহ তিনবার ভূমিতে উপুড় হইয়া প্রণাম করিলেন; কেহ কেহ বা তাঁহাদের মস্তক স্বামীজির পায়ের উপর স্থাপন করিলেন।

তারপরে একটি ছোট শোভাযাত্রা করিয়া স্বামীজির মৃতদেহ সন্ন্যাসীরা ধীরে ধীরে বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। 'জয়, গুরু মহারাজ কি জয়' ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মঠের দক্ষিণদিকের কোণে একটি প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষের তলদেশে শবাধারটিকে নামানো হইল। আর একটু নীচের দিকে গঙ্গার তীরবর্তী স্থানে একটি সুসজ্জিত চিতাশয্যা নির্মাণ করা হইল। এই স্থানটি স্বামীজি নিজেই নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

নিবেদিতা একটি বৃক্ষের তলে একা বসিয়াছিলেন। ভিড়ের মধ্যে পুষ্পাচ্ছাদিত স্বামীজির শবটি সন্ন্যাসীরা যখন স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন তখন উহা তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিলেন না। দুইবার শবাচ্ছাদনের হরিদ্রা-পুষ্পগুলি জনতার মাথার উপর দিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। উহা তরঙ্গের উপর ফেনারাশির মত বোধ হইতেছিল। স্বামীজির রেশমী গেরুয়ার কিয়দংশ বাতাসে উড়িতে দেখা গেল। দুই-দুইবার নিবেদিতা 'জয়, জয়' বলিয়া চিৎকার করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি অনুভব করিতেছিলেন যেন তিনিও ঐ সঙ্গে মরিয়া যাইতেছেন এবং তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে তাঁহার মুখ গুঁজিয়া রাখিলেন। নিবেদিতা প্রার্থনা করিলেন, 'হে স্বামী, এমন করুন যাহাতে আমার ইচ্ছামত নয়, আপনার ইচ্ছামত আমি কাজ করিয়া যাইতে পারি। হর, শিব, শিব।'

নিবেদিতা রাত্রি পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন। বাতাস উঠিল, চিতার ভস্ম বাতাসে উড়িতে দেখা গেল। এক টুকরা হরিদ্রাবর্ণের গেরুয়া নিবেদিতার ক্রোড়ে বাতাসে উড়িয়া আসিয়া পতিত হইল। ইহা স্বামীজিরই পরিধেয় গেরুয়ার কিয়দংশ, যাহা চিতার আগুনে কিছুটা দগ্ধ হইয়াছে। ধীরে ধীরে চিতার আগুন নিবিয়া গেল। হঠাৎ অনুপস্থিত বন্ধুদিগের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার মায়ের মুখখানি তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার মাকে তিনি ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার মায়ের কোমল হস্তের স্পর্শ, এই শোক দূর করিবার জন্য তিনি গাত্রে অনুভব করিলেন। নিবেদিতা যখন তাঁহার মার উদ্দেশ্যে ডাকিতেছিলেন,

তখন বিশ্বস্ত বন্ধু স্বামী সদানন্দ উত্তর দিলেন। স্বামী সদানন্দ তাঁহার কাছে কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া ছিলেন তাহা নিবেদিতা এতক্ষণ জানিতে পারেন নাই। এখন জানিতে পারিয়া তাঁহার কিছুটা সান্ত্বনা বোধ হইতেছিল এবং তিনি তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন।

রাত্রিতে প্রার্থনা আরম্ভ হইল। নিবেদিতা উঠিলেন, বলিলেন, 'সন্ন্যাসীরা প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু আমার সময় নাই। স্বামীজি আমাকে একটি কাজের ভার দিয়া গিয়াছেন, আমাকে উহাই করিতে হইবে।' যখন তিনি উঠিয়া চলিতে লাগিলেন, তখন শুধু অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হে প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' স্বামী সদানন্দ একটু দূরে দূরে নিবেদিতাকে অনুসরণ করিতেছিলেন। স্বামী সদানন্দ কাঁদিতেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৭ই পৌষ বোলপুর ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সেই বিদ্যালয়ে গাছতলায় বসিয়া ছাত্রদের উপনিষদ পাঠ করান। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুলাই তিনি বোলপুর হইতে কলিকাতা ফিরিতেছিলেন; হাওড়া স্টেশনে আসিয়া শুনিলেন, কাল রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন। শুনিবামাত্রই তিনি দৌড়াইয়া বেলুড় মঠে উপস্থিত হইলেন। তখন গগনস্পর্শী চিতার আগুন চারিদিকে লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া প্রচণ্ডবেগে জ্বলিতেছিল। উপাধ্যায় চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। কে যেন তাঁহার মনে প্রেরণা জাগাইয়া বলিল, 'তুমি, তোমার যতটুকু শক্তি আছে তাই দিয়া, বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি-জয় ব্রত গ্রহণ কর।' সেই মুহূর্তেই স্থির করিলেন যে তিনি বিলাত যাইবেন, হিন্দুর দর্শনাদি শাস্ত্র প্রচার করিবেন।

উপাধ্যায়ের যে কথা সেই কাজ। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৫ই

অক্টোবর সঙ্কল্প করিবার তিন মাস মধ্যে, মাত্র সাতাশ টাকা পকেটে লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। ৫ই নভেম্বর অক্সফোর্ড পৌঁছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অক্সফোর্ডের কলেজগুলি খোলা ছিল। তিনি একমাসের অল্পকাল মধ্যে অক্সফোর্ডে তিনটি বক্তৃতা দিলেন: (১) হিন্দুধর্মে ঈশ্বরবাদ, (২) হিন্দুর নীতিশাস্ত্র, (৩) হিন্দুর সমাজবিজ্ঞান। ডাঃ কেয়ার্ড এই তিনটি বক্তৃতাতেই সভাপতি হইয়াছিলেন। তারপর 'Hindu Thought and the Western Culture' সম্বন্ধেও একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

চিতার আগুন নিবিলে পর ভগিনী নিবেদিতাও এই কথা বলিতে বলিতে ধীর পদক্ষেপে চলিয়া গেলেন, 'স্বামীজি আমাকে একটি কাজের ভার দিয়াছেন। আমাকে উহা করিতে হইবে।' নিবেদিতা ও উপাধ্যায় এই উভয় ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দের প্রজ্বলিত চিতাগ্নির নিকট হইতে একই সঙ্গে প্রেরণা পাইয়া বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহা একটি আশ্চর্য ঘটনা।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৬ই জুলাই নিম্নলিখিতরূপে স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিল: 'We deeply regret to announce that Swami Vivekananda is dead. The report is that he came from a walk, lay down on a charpoy to rest, and died, no doubt, from heart disease. He had also been suffering from diabetes. He did eminent service to the Hindus by his lectures in America. At the Chicago Exhibition he proved a prominent figure. Indeed, so great was his power that he succeeded in converting a few Westerners to his own faith as Swami Abhedananda is doing now. He was a disciple of Paramhangsa Ramkrishana, who,

while living, surrounded himself by a large number of devoted followers. On the death of the Paramhangsa his mantle fell upon the shoulders of Swami Vivekananda. InIndiaVivekanandaandhiscolleagues did much good work in alleviating distress. Though a disciple of the Paramhangsa, Vivekananda chalked out a path for himself. The Paramhangsa was a bhakta but Vivekananda preached Yoga and there is a wide divergence between the two cults. Vivekananda also preached the Avatarship of his guru, the Paramhangsa and this ed Swami Adhayananda whom he had initiated and who is now in our midst delighting the Calcutta public by sweet discourses of the Lord Gauranga, to secede from him. Vivekananda also quarelled with the Theosophists and this led at one time to a hot controversy between him and the illustrious Col. Olcott, President of the Society. Vivekananda has been cut off in the prime of his life. *Possibly his mantle will fall upon his adopted daughter Nivedita.*'

আজ হইতে অর্ধশতাব্দী পূর্বে স্বামীজির মৃত্যুর মাত্র দুইদিন পরে অমৃতবাজার পত্রিকার এই বিবরণটি ইতিহাস আলোচনার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম, পরমহংসদেবের ধর্মপ্রভাব পতিত হইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের উপর। এখন স্বামী বিবেকানন্দের কর্মভার পতিত

*Amrita Bazar Patrika: 7th July, 1902. (Author's emphasis)

হইল ভগিনী নিবেদিতার উপর। ভগিনী নিবেদিতার জীবনচরিত-আলোচনায় অমৃতবাজার পত্রিকার এই মন্তব্যটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, পরমহংসদেবেরও অপর কোন শিষ্য অথবা বিবেকানন্দের অপর কোন গুরু-ভ্রাতার উপর তাঁহার কর্মভার পতিত হইবে, এমন কথা বলা হইল না। ভগিনী নিবেদিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়, পরমহংসদেব ভক্ত ছিলেন, আর বিবেকানন্দ যোগ প্রচার করিয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। এই কথা বলিয়া পরমহংদেবের ধর্মপ্রভাব স্বামী বিবেকানন্দের উপর পতিত হইয়াছিল বলা স্ববিরোধী হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ পরমহংসদেব প্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, পরে তোতা পুরীর নিকট দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দও ভক্তি প্রচার করিতে গিয়া গীতাপ্রচারক কৃষ্ণ অপেক্ষা গোপীপ্রেমের কৃষ্ণকে উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। 'লর্ড গৌরাঙ্গ' প্রচারক ভক্তিবাদী অমৃতবাজার সম্ভবতঃ বিবেকানন্দের এই গোপীপ্রেমের কথাটি কখনও জানিতে পারেন নাই।

তৃতীয়, পরমহংসদেবকে শুধু ভক্ত বলিলে তাঁহার ঐতিহাসিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজের একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'বিধাতার ইচ্ছায় আমি এক ব্যক্তির সহবাসের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী, তেমনি অপরদিকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন। যিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত, অপরদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন।'

সুতরাং পরমহংসদেবকে শুধু ভক্ত বলা চলে না। ইহা ছাড়া, 'যত মত তত পথ'—এই কথা বলিয়া তিনি সমস্ত ধর্মমতের প্রত্যেক-টিকেই একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়া জগতের বিভিন্ন ধর্মের যে সমন্বয় নির্দেশ করিয়াছেন পণ্ডিত মোক্ষমূলার এজন্য তাঁহাকে ইতিহাসের একজন বড় সমন্বয়াচার্য বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। তাছাড়া, শ্রীঅরবিন্দ 'কর্মযোগীন্' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রথম প্রবন্ধে

লিখিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, ইঁহারা উভয়ে শঙ্করাচার্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমন্বয় দিয়া গিয়াছেন।*

চতুর্থ, একথা সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ পরমহংসদেবকে শুধু অবতার নয়, পূর্বের অবতারদের অপেক্ষা বড় অবতার বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মাদ্রাজের একটি বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলিয়াছেন:

'যিনি একাধারে শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল হৃদয়ের অধিকারী, এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি অনেক বর্ষ ধরিয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণ প্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াই অদ্য ক্ষান্ত হইতে হইবে।'

পঞ্চম, ভগিনী নিবেদিতা এই বৎসরই অক্টোবর মাসে বরোদা গিয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ তাঁহাকে উপহার দেন এবং এই রাজযোগ পড়িয়াই অরবিন্দ সর্বপ্রথম যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিবেকানন্দের যোগ নিবেদিতার হাত দিয়া অরবিন্দে সংক্রামিত হয়।

ষষ্ঠ, স্বামী বিবেকানন্দকে কেবল থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ও তাহার সভাপতি অল্‌কট-এর সহিত বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। আটল্যান্টিকের উভয় তীরেই স্বদেশী বিদেশী অনেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সহিতই স্বামীজিকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। শুধু ব্রাহ্ম সংস্কারকগণ নহেন, শুধু খৃষ্টান মিশনারীগণ নহেন, শুধু অল্‌কট নহেন, গৌরাঙ্গভক্ত অমৃতবাজারও বাদ যান নাই।

স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার কিছু পূর্বে বা পরে আমরা ভগিনী

*Ramkrishna and Vivekananda gave more perfect synthesis than Sankaracharya—*Karmayogin, 19th June, 1909.*

নিবেদিতাকে বর্ষাঋতুতে একটি বক্তৃতা দিতে দেখিতে পাই। তাঁহার সঙ্গে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।* র‍্যাটক্লিফ সাহেব লিখিয়াছেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বর্ষাঋতুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়ায় এক রবিবারে ভগিনী নিবেদিতা বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। এবং তিনিও সঙ্গে গিয়াছিলেন। বক্তৃতাসভায় কথক ঠাকুর তুলসীগাছ সম্মুখে লইয়া রামায়ণ পাঠ ও গান করিতেছিলেন। নিবেদিতা বক্তৃতা-শেষে বলিলেন, 'হে নব্যভারত, শুধু অতীতের রামায়ণের গল্পে ডুবিয়া থাকিও না। মাতৃভূমির সেবা দ্বারা তাহাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া নূতন রামায়ণ সৃষ্টি কর।'

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর মাত্র দুই সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১৯শে জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকা আর একটি সংবাদ প্রকাশ করিলেন, যথা :

Sister Nivedita—We have been requested to inform the public that at the conclusion of the days of mourning for the Swami Vivekananda, it has been decided between the members of the Order at the Belur Math and Sister Nivedita *that her work shall*

* এস. কে. র‍্যাট্‌ক্লিফ। যে, ১৯০২ সালে Paul Knight-এর Editorship-এর সময় Leader-writer হিসাবে স্টেট্‌স্‌ম্যান-এ যোগ দেন। পরে ১৯০৩ হইতে ১৯০৬ পর্যন্ত সম্পাদক (Editor) ছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিলাত চলিয়া যান ; Indian Nationalism-এর পক্ষপাতিত্বের জন্য তিনি কাগজের স্বত্বাধিকারীদের বিরাগভাজন হন। বিলাতে তিনি বহু সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে এবং বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি ভগিনী নিবেদিতার বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি।…

henceforth be regarded as free and entirely independent of their sanction or authorith * অর্থাৎ—

স্বামীজির অশৌচান্তের পরমুহূর্তেই ভগিনী নিবেদিতা ও বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে পরামর্শের পর এইরূপ স্থির হইল যে, এখন হইতে ভগিনী নিবেদিতার কার্যাবলীর সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার নিজের। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁহার কার্যাবলীর সহিত বেলুড় মঠের কোনই সংশ্রব নাই।

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটি অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই মনে হইবে। কেননা, মাত্র ১২ দিন পূর্বে [৭ই জুলাই] অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার কর্মভার (mentle) তাঁহার মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার উপর পতিত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিলে কি ইহা সম্ভব হইত? বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা কি এতটা সাহসী হইতেন? একটা ঘটিয়া গেল।

* Amrita Bazar Patrika, 19th July, 1902 (Author's emphasis.)

মাঝে মাঝে এমন এক একটা সময় আমাদের আসে, যখন জীবনের স্রোত নিতান্তই একঘেয়ে একটানা মনে হয়। খাওয়া, পরা, শোওয়া —দিনের পর দিন সেই একই রীতিতে চলছে; সেই সাধারণ গল্পগুজব—নূতনত্বহীন একঘেয়ে চিন্তার ধারা—সনাতন সংসারপ্রবাহ। হঠাৎ হয়তো শোক তাপ বা একটা কিছু অঘটন ঘটল; জোর এক ধাক্কা আমাদের শরীর মনে এসে পড়ল। তাতে আমাদের জীবনের বেগটা হয়তো কথঞ্চিৎ কমে আসে—একঘেয়ে ভাব খানিকটা কাটে। কিন্তু কতক্ষণ? আবার কল চলল—যথাপূর্ব সেই চিরন্তনভাবে।

জীবনে একটা অস্বস্তি—একটা অতৃপ্তির ভাব এসে উপস্থিত হয়। তাইতো—এ গড্ডালিকা প্রবাহের তাৎপর্য কি? কিসের অপেক্ষায় আমাদের বেঁচে থাকা? তারপর হঠাৎ একদিন জীবনে সেই অভূতপূর্ব ঘটনা এসে হাজির হয়—যা জীবনের একঘেয়ে প্রবাহটাকে এক নতুন দিকে নতুনভাবে টেনে নিয়ে যায়—যার ফলে আমার আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ হতে দূরে—অতিদূরে এক অভিনব দেশে এক অভিনব জাতির মধ্যে গিয়ে পড়ি, জীবনটাকে যারা এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে শিখছে—তার উদ্দেশ্য যারা ঠিক ঠিক বুঝেছে—এই লোকগুলোর ওপর কি যেন একটা অজানা আকর্ষণ আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করি। আমরা তখন বুঝি, এরই জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলুম। আমাদের যত ছটফটানি—যত অস্বস্তি—যত অশান্তি সব চিরদিনের মত থেমে যায়।

অনেক দুঃখ-কষ্ট ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে, অনেক উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে, জন্ম-জন্মান্তরের পর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। কিন্তু

এটি আবার জীবনে প্রথমেই বোঝা যায় না—ধরা পড়ে অনেক পড়ে। তাই সেই ১৮৯৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের কনকনে শীতের এক রাত্রিতে কোন বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই যখন ডেট্রয়েট শহরে ইউনিটেরিয়ান্ চার্চে একটা বক্তৃতা শুনতে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলাম তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে, আজ এমন একটা কাজে বের হচ্ছি যা আমার জীবনের গতিটাকে একেবারে সম্পূর্ণ এক নূতন রাস্তায় ফিরিয়ে দেবে। বক্তৃতা শোনাটাও আমাদের দৈনিক একঘেয়ে রুটিনের একটা অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। নূতন কিছু একটা শোনা কত দুর্লভ! আবার সেই শীতে ডেট্রয়েটে যে সব বক্তারা এসেছিলেন তাঁদের অস্বাভাবিক রকমের একঘেয়ে লাগছিল। কাজেই 'বিবেকানন্দ—ভারতীয় সন্ন্যাসী'র বক্তৃতাতেও খুব বড় একটা কিছু আশা করে যাইনি। নিজের আগ্রহ ছিল খুবই কম—কেবল বন্ধু মিসেস ফাঙ্কির অনুরোধটা এড়াতে পারিনি। তাঁর খুব আশা ছিল কোন-না-কোন দিন তিনি একটা কিছু নতুন শুনতে পাবেন। যা হোক, আমরা এই 'ভারতবর্ষীয় লোকটি'র বক্তৃতা শুনতে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হলাম। এ জন্মে তো নয়ই, বোধহয়, এর আগে যত হাজার হাজার জন্মের ভিতর দিয়ে এসেছি, তাদের কোনটিতেও এত বড় একটা ঘটনার সংস্পর্শে আসতে হয়নি। কারণ বক্তৃতা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা বুঝে নিলুম যে আমরা যা এতদিন ধরে খুঁজে এসেছি সেই পরশমণি আজ আমাদের সামনে। এক নিঃশ্বাসে আমাদের ভিতরটা যেন বলে উঠল, 'আঃ—এ সুযোগ যদি হারাতুম……।'

স্বামী বিবেকানন্দের শারীরিক গঠন সম্বন্ধে যাঁরা ভাল মত শুনেছেন তাঁরা হয়তো শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, সেই অতুলনীয় চেহারাই যে আমাদের অমন করে আকর্ষণ করেছিল তা নয়। সত্য বটে সে আকৃতি বাস্তবিকই অপূর্ব ছিল। সন্ন্যাসী বলতে আমাদের যা ধারণা ছিল—রোগা খিটখিটে শীর্ণকায় ব্যক্তিবিশেষ। কিন্তু বক্তৃতামঞ্চে

যিনি উঠলেন, তিনি যে তা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এই অদ্ভুত পুরুষটির শরীর থেকে কি একটা শক্তি বের হচ্ছিল, যা সবাইকে যেন অভিভূত করে ফেলেছিল। সে অপরিসীম শক্তির খেলা পরে সামনাসামনি আমরা অনেক টের পেয়েছিলাম। যাক্—কিন্তু সেই তেজোমণ্ডিত চেহারার কথা ছেড়ে দিলেও, তার পিছনে যে মনটি ছিল, সেইটেই আমাদের হৃদয়ে প্রথম গভীর ছাপ দিয়েছিল। সে মনের মহিমা, গভীরতা ও মাধুর্য বর্ণনা করতে মানুষের ভাষা অক্ষম। সাধারণ লোকের ত কথাই নেই, এমন কি যারা অতিশয় প্রতিভাবান বলে বিখ্যাত, তাঁদেরও মন, এ মন থেকে দূরে—দূরে—অতি দূরে ছিল। এর গড়নটাই যেন অন্য ধরনের। ভাবগুলো তার এত পরিষ্কার, এত শক্তিমান, এত অসাধারণ যে, তারা যে কোন সসীম মানবের বুদ্ধিপ্রসূত তা বিশ্বাসই হয়নি। সুদূর ভারতের এই প্রচারকটি তখনও ত্রিশে পৌছাননি। বয়সে নবীন কিন্তু প্রাচীন-কালের এই সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারীর কাছে এই প্রথম আমরা ভারতের সনাতন বাণী শুনলুম—সেই মানুষের স্বরূপের কথা—অজর অমর নিত্যশুদ্ধ আত্মার কথা !! তত্ত্বমসি—অনাদি কাল থেকে তুমি পূর্ণই রয়েছে, সেই মহান্ ভূমা সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ কেবল ভ্রান্তিবশে বুঝতে পারছ না। একবার যদি বুঝে নিতে পার, ব্যস্। আর এই অনুভূতি কার যে কখন হবে তার ঠিক নেই। হয়তো এই মুহূর্তেই অজ্ঞানের আবরণটা হঠাৎ সরে যেতে পারে কিংবা হয়তো লক্ষ বছর পরে—তা কে বলবে? কিন্তু এটি নিশ্চিত যে সকলেই একদিন সেই চরম অনুভূতি লাভ করবে।

এই শিক্ষা অতি প্রাচীন সন্দেহ নেই—হয়তো ভারতের সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী এতে নূতনত্ব কিছুই দেখে না, কিন্তু তবুও বিবেকানন্দের মুখে শুনতে চির নূতন। তাঁর কাছে এটি আর দার্শনিক মতবাদ বিশেষ ছিল না—এ ছিল প্রত্যক্ষ জীবন্ত সত্য। কঠোর সাধনা দ্বারা তিনি এই ব্রহ্মজ্ঞান নিজে অনুভব করেছিলেন আর স্বায়ত্ত সেই

অমৃতের সন্ধান জগৎবাসীকে শুনানো ছাড়া বাকী জীবনেও তাঁর আর অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

যাঁরা প্রথম বক্তৃতাতে এসেছিলেন, তাঁরা দ্বিতীয়টিতেও না এসে থাকতে পারলেন না। তারপর তৃতীয়টিতে—চতুর্থটিতে—এমন করে দিনের পর দিন, এই অদ্ভুত পুরুষের সঙ্গ চলতে লাগল। কখনো রামায়ণ মহাভারতের গল্পের ভিতর দিয়ে, কখনো বা পুরাণ উপকথার ভিতর দিয়ে, আবার কখনো বা উপনিষদাদি শাস্ত্রের ভিতর দিয়ে, নানা কৌশলে বিভিন্ন আকারে তাঁর উপদেশ চলত। উপনিষদ থেকে তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। প্রথমে মূল সংস্কৃত আবৃত্তি করে, তারপর তার একটি মোটামুটি কবিত্বপূর্ণ অনুবাদ দিয়ে যেতেন। এই আবৃত্তি এক অদ্ভুত জিনিস ছিল। শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে এক অপরিসীম গাম্ভীর্য এনে দিয়ে তাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে গিয়ে তা আঘাত করত আর তারা রুদ্ধশ্বাসে নিস্পন্দ দেহে বসে থাকত। স্বামীজির কণ্ঠস্বরও কী অদ্ভুত ছিল! বাস্তবিকই মনে হ'ত, যেন সেই স্বর না শুনলে আসল সঙ্গীত কি তার ধারণাই হয় না। আমার মনে পড়ে তাঁর মুখে যখন প্রথম 'ইণ্ডিয়া' এই শব্দটি শুনি, তখন থেকেই ভারতের একটা অজানা আকর্ষণ অনুভব করেছিলুম। পাঁচটি অক্ষরের একটি ছোট শব্দের ভিতর দিয়ে তিনি এতটা ভাব প্রকাশ করতে পারতেন—এ যেন বিশ্বাসই হয় না। তার ভিতর ছিল ভালবাসা, প্রেম, গর্ব, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, বীরত্ব, কবিত্ব আরও কত কি। ভারত আমাদের প্রাণের অতি প্রিয় বস্তু হয়ে উঠল। তার সম্বন্ধীয় যত কিছু, তার অধিবাসী, ইতিহাস, শিল্প, তার নদ-নদী, বন, পর্বত, সমাজ, ধর্ম, সভ্যতা, তার দর্শন, তার আধ্যাত্মিকতা সব আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠত আর হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনুভব করতুম তার উপর একটা অভূতপূর্ব ভালবাসা। 'গুরু' কাকে বলে আমরা তখনো তা জানি না, কিন্তু প্রাণে প্রাণে বুঝেছিলাম যে জন্ম-জন্মান্তরের প্রতীক্ষার পর এতদিনে আমরা সেই

ঠিক ঠিক শিক্ষক পেয়েছি—যাঁর সংস্পর্শে মানুষ তাঁর জীবনের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করে কৃতকৃতার্থ হয়। আমরা অবশ্য তখনো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ করবার সুযোগ পাইনি, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি ছিল না। কারণ, যেটুকু শুনেছিলুম সেইটুকুই হজম করতে যে অনেক বছরের দরকার। যাক্, সে সুযোগও কিন্তু শীঘ্রই এসে গেল; আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর সম্পূর্ণ এক অপ্রত্যাশিতভাবে। সহস্র দ্বীপোদ্যানে আমাদের স্বামীজির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা 'দেববাণীতে' মিসেস ফাঙ্কি লিপিবদ্ধ করেছেন।

*　　　*　　　*

যে কয়েক সপ্তাহ সহস্র দ্বীপোদ্যানে স্বামীজির সঙ্গে বাস করবার সুযোগ হয়েছিল, সেগুলো কী এক অপার্থিব দিব্য আনন্দের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে, তা সম্যক বর্ণনা করতে আজ ভাষা খুঁজে পাইনে। তিনি নিজে স্বভাবতঃই যে উচ্চ ভাবরাজ্যে বাস করতেন আমাদের মনগুলোকেও যেন তখন ঠেলে সেখানে তুলে নিয়েছিলেন। সহস্র দ্বীপোদ্যানে তিনি যে একটা খুব গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের নেশায় রাতদিন মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন একথা তাঁর নিজের মুখেও পরে শুনেছিলাম। যা হোক ভবিষ্যতে তাঁর বাণী প্রচারের একটি পথ যেন স্বামীজি এখন দেখতে পেলেন—সেটি হচ্ছে যারা এসে জুটেছিল তাদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে ঠিক্ ঠিক্ তৈরী করে তোলা। এই দুঃখপূর্ণ সংসারের পারে সেই অমৃতের পথ দেখিয়ে দিতে তাঁর কী আগ্রহই প্রকাশ পেত! ভাবে গদগদ হয়ে কতবার তাঁকে বলতে শুনেছি, আহা—একটিবার স্পর্শ করে যদি তোমাদের মুক্ত করে দিতে পারতুম!

স্বামীজির ইচ্ছা ছিল যে তাঁর আমেরিকার প্রচার আজ আমেরিকান-দের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তাঁর নিজের ঘরের ছোট বারান্দাটিতে সকলকে জড করে মাঝে মাঝে আমাদের বক্তৃতা করতে বলতেন।

যাতে আমরা নিজে নিজে চিন্তা করতে শিখি, এটি তিনি খুব চাইতেন। অবশ্য ভুবনপ্রসিদ্ধ বাগ্মী স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে বক্তৃতা করতে প্রথম প্রথম আমাদের খুবই অসুবিধা হ'ত। কিন্তু এতে লাভ হয়েছিল প্রচুর। অন্তর্যামী গুরুদেব বুঝেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর সামনে নিঃসঙ্কোচে নির্ভয়ে কথা কইতে শিখবে, জগতে যে কোন প্রকার শ্রোতার কাছেই তার বক্তৃতা দিতে আর কোন বাধা থাকবে না। একটি ছোট্ট সম্মিলনীগুলোতে মাঝে মাঝে রাত দুটো পর্যন্তও বেজে গেছে। কোন্ দিক দিয়ে সময় কেটে যেত আমরা আদৌ টের পেতাম না। বারান্দাটির এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড চেয়ারে ছিল তাঁর আসন। মাঝে মাঝে সেইটিতে বসে তিনি গভীর ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন। আমরাও অবশ্য তখন তাঁর আশেপাশে ধ্যান করতে বসতুম বা চুপচাপ বসে থাকতুম, মাঝে মাঝে স্বামীজি আমাদের প্রশ্নাদি তুলতে খুব উৎসাহিত করতেন। তার উত্তর আবার আমাদেরই কাউকে দিতে হ'ত। সে সব উত্তরে অবশ্য ভুল-ত্রুটি অনেক থাকত—আমাদের পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার প্রাবল্যই সাধারণতঃ তার জন্য দায়ী—কিন্তু কৃপাময় গুরুদেব সযত্নে সে সব ত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে কী অসীম ধৈর্য ও করুণাই তাঁর মধ্যে দেখেছি!

যাঁরা সেই গ্রীষ্মে স্বামীজির কাছে জুটেছিলেন, এবার তাঁদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। দলটির ভিতর বেশ রকমারী প্রকৃতির মানুষ ছিল। মিস্ ওয়াল্ডো, মিস্ রুথ আর ডক্টর ওয়াইট্ এই তিনজন নিউইয়র্ক থেকেই স্বামীজির ক্লাসে যেতেন। তার আগে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তাঁরা দর্শন বিষয়ে অসংখ্য বক্তৃতা শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্বামীজির বক্তৃতাতে কিন্তু তাঁরা এক অদ্ভুত নূতনত্ব দেখতে পেয়েছিলেন যা তাঁদের ত্রিশ বছরের জমাট মনের একঘেয়ে অসাড় ভাবটাকে একেবারে দূর করে দিয়েছিল। তাই নূতন কেউ আসলে

ডাক্তার ওয়াইট্ খুব ভরসা দিয়ে বলতেন যে স্বামীজির উপদেশে তিনি জীবনে অপূর্ব একটা আলোক নিশ্চয়ই পাবেন। অনেক দিন ধরে বক্তৃতা শুনতে শুনতে মিস্ ওয়াল্ডোর একটা বিশেষ ক্ষমতা জন্মেছিল—যে কোন একটি সম্পূর্ণ বক্তৃতা গোটা কতক কথাতে সংক্ষেপ করে প্রকাশ করতে পারা। এই মিস্ ওয়াল্ডোর জন্যেই আজ আমরা 'দেববাণী'তে লিপিবদ্ধ স্বামীজির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছি। স্বামীজি বিলাত যাবার সময় কতকগুলি ক্লাস নেবার ভার এঁর উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। আর বিলাত থেকে তিনি ফিরে আসার পরও মিস্ ওয়াল্ডো তাঁর অনেক কাজে লেগেছিলেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাখ্যাগুলি ইনিই লিপিবদ্ধ করেন। কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ প্রকাশ করার সময়েও ওয়াল্ডো অনেক সাহায্য করে-ছিলেন। বিচারশীল দৃঢ় মন আর শ্রীগুরুর উপর অগাধ ভালবাসা তাকে স্বামীজির একজন উপযুক্তা সহকারিণী করেছিল। রুথ এলিস্ নিউইয়র্কের একটি খবরের কাগজের আফিসে কাজ করত। নিরীহ শান্তশিষ্ট মেয়েটি—কথাবার্তা বেশী বলত না—কিন্তু অন্তরে স্বামীজির ওপর একটা অসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তার প্রতি চাল-চলনে আমরা বুঝতে পারতুম।

ডাক্তার ওয়াইটের বয়স সত্তর অতিক্রম করে গিয়েছিল। কিন্তু শরীর মনে তার তখনো যুবকের উৎসাহ, উদ্যম পূর্ণমাত্রায়। ক্লাসের পর সাধারণতঃ একটু বিরাম থাকত। এই অবসরে বৃদ্ধ টাক মাথাতে হাত বুলোতে বুলোতে তাঁর স্বাভাবিক নাকী সুরে প্রশ্ন করতেন, 'আচ্ছা স্বামীজি, তাহলে আসল কথাটি ত এই যে আমি হচ্ছি সেই পূর্ণ ?' প্রত্যেক ক্লাস শেষ হবার পরই আমরা বৃদ্ধের এই অভিনয়ের জন্য কান খাড়া করে রাখতুম। স্বামীজিও তাঁর পিতৃস্নেহে রঞ্জিত মধুর হাসি হেসে এই বুড়ো ছেলেটির মতে সম্মতি দিতেন। বাস্তবিক এইসব ক্ষেত্রে স্বামীজির ত্রিশ বছর বুড়োর সত্তর বছরের

চেয়ে যেন কত বেশী মনে হ'ত। মনে হ'ত যেন ঐ ত্রিশ বছরের শরীরকে অবলম্বন করে ত্রিকালের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী কোন এক জন্মহীন মরণহীন সনাতন স্থবিষ্ঠ পুরুষপ্রবর সেখানে বিরাজ করছেন। মাঝে মাঝে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে বলতেও শোনা যেত, 'মনে হচ্ছে যেন আমার বয়স তিনশ বছর।'

মিসেস ফাঙ্কি সম্বন্ধে স্বামীজি বলতেন, 'ও আমাকে বেশ একটা স্বচ্ছন্দতা দেয়। বাস্তবিক স্বামীজির সামনে এলে যেন তাঁর ভিতরকার যত উৎসাহ, উদ্যম, স্ফূর্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেত। অপর সবাইকার চেষ্টা ছিল স্বামীজির কথাগুলো কেমন করে হজম করা যায়; ফাঙ্কি কিন্তু উপদেশ শোনার অত ধার ধারতেন না। তিনি বরং চেষ্টা করতেন স্বামীজিকে কেমন করে একটু আমোদ দেওয়া যায়। তাই কখনো হাসির গল্প করে, কখনো বা ফাঁকা কথাবার্তা করে, নানা উপায়ে ফাঙ্কি স্বামীজির মনের উচ্চ ভাব নামিয়ে তাঁকে একটু তাজা করে তুলতেন। আজ ফাঙ্কি বৃদ্ধা—শরীর তাঁর অপটু; কিন্তু যৌবনের সেই স্ফূর্তি ও চরিত্রের সেই অনুপম মাধুর্য কখনো কিছুমাত্র কমেনি। তাই স্বামীজির প্রসঙ্গ পেলে বৃদ্ধা আজও উৎসাহে মেতে ওঠেন। স্বামীজি তাঁর হৃদয়ে চির জাগ্রত। 'কিছু আদায় করে নেব'—এই রকম একটা লেন-দেন ভাব কখনো রাখেননি বলেই কি আচার্যদেবের ব্যক্তিত্ব এত গভীরভাবে তিনি ভেতরে বসিয়ে নিতে পেরেছেন? আর সেই দয়াময় গুরু শরীররূপ দুঃসহ ভারে আজ ভারগ্রস্ত এই প্রিয় শিষ্যার অন্তিমকালে তার সকল সংসারস্বপ্ন দূর করে আঁধারের পারে চির-ঈপ্সিত সেই মুক্তির আস্বাদন যে তাকে করিয়ে দেবেন এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। জয় গুরু!

এইবার আমাদের আর দুটি বন্ধুর পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব; মেরি লুই ও লিয় ল্যান্সবার্গ। স্বামীজি বলতেন যে গোঁড়ামি

হচ্ছে মানুষের একটা খুব প্রবল শক্তি, তবে বিপথে চালিত।—কিন্তু ঐটির মোড় যদি কোন উপায়ে ফিরিয়ে দিতে পার তবে তা অদ্ভুত কাজে লাগতে পারে। আর হাতে-কলমে এই বিষয়েরই এক পরীক্ষা দেখাতে, উক্ত বন্ধু দুটিকে তিনি শিষ্যরূপে বেছে নিয়েছিলেন —কারণ গোঁড়ামি জিনিসটা অতি ভীষণ মাত্রায় এঁদের ভেতর ছিল। মেরি লুই-এর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। খুব লম্বা চেহারা—চুলগুলো ছোট ছোট করে কাটা, হাব-ভাব ঢং-ঢাং, এমন কি গলার সুরটি পর্যন্তও তাঁর পুরুষের মত হয়ে উঠেছিল। আমাদের ছোট দলটির মধ্যে হাঁকডাকে এঁরই ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে প্রবল ছিল বলতে হবে। তিনি বলতেন যে, তিনি খুব উচ্চ অধিকারী কাজেই তাঁর পথ হচ্ছে জ্ঞানযোগ। বিদ্যাবুদ্ধি এবং বাগ্মিতাও তাঁর একটু-আধটু ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর দাম্ভিকতাই শেষে শিষ্যত্বের প্রতিরোধী হোল—স্বামীজির আন্দোলনের কোন কাজেই তিনি আসতে পারেননি। সহস্র দ্বীপোদ্যানে আমাদের সকলের সম্বন্ধ ত্যাগ করে গিয়ে, প্রথমে ক্যালিফর্নিয়ায়, তার পর ওয়াশিংটনে স্বতন্ত্রভাবে তিনি বেদান্তের কেন্দ্র খুলেছিলেন।

ল্যান্সবার্গের চরিত্র ছিল কিন্তু ভিন্ন রকমের। আমাদের দলের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বিদ্বান। আমেরিকার অধিবাসী ছিল বটে কিন্তু জন্মসূত্রে সে রুশীয় য়ীহুদী। ভাবপ্রবণতা, কল্পনাশক্তি, বিদ্যানুরাগ আর মহত্তের পূজা—তার জাতের এই গুণগুলি সবই সে পেয়েছিল। আর সবচেয়ে প্রবল বৃত্তি তার ছিল দরিদ্রে দয়া। এই জন্যই বোধহয় করুণাবতার স্বামীজির সঙ্গে তার অত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিন বছর সে তাঁর নিত্য সহকারী, বন্ধু, সেক্রেটারী ও সেবকরূপে ছিল। নিউইয়র্কে ৩৩ নম্বর রাস্তার উপর সে ও স্বামীজি একসঙ্গে অনেককাল বাস করেছেন। তাঁদের উভয়ের একই ফণ্ড ছিল। ল্যান্সবার্গের আয় ছিল সামান্য। কখনো কখনো দু'জনের

খরচের মত টাকা হয়তো থাকত, কিন্তু এমনও অনেক দিন গেছে যখন থলি একেবারে শূন্য ; ক্লাস শেষ হবার পর দু'জনে তখন বেড়াতে বের হতেন আর ফিরে আসবার সময় সামান্য কিছু মুখে দিয়ে, নৈশভোজন সমাপ্ত করতেন। কিন্তু কোনদিন তাঁদের আনন্দের কমতি হয়নি। তাঁরা জানতেন দরকার মত অর্থ কোথাও-না-কোথাও থেকে জুটবেই।

ল্যান্সবার্গ ছিল য়ুরোপের মূর্ত প্রতীক। সেখানকার দর্শন, সাহিত্য, কাব্য সব তার চরিত্রের ভিতর দিয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছিল। আর স্বামীজি বই-এর চেয়ে মানুষই যেন পড়তে ভালবাসতেন। তারপর য়ীহুদী সভ্যতার ছাপও তার মধ্যে বেশ পাওয়া যেত। এই হিসেবে স্বামীজি ও তার মিলন যেন জগতের দুই প্রাচীনতম জাতির শুভ সম্মিলন জানিয়ে দিত।

সহস্র দ্বীপোদ্যোনে গোড়াতেই যাঁরা এসে স্বামীজির কাছে দীক্ষা পেয়েছিলেন, ল্যান্সবার্গ তাঁদের অন্যতম। চরিত্রে অসীম করুণাগুণের বিকাশ দেখে, স্বামীজি তাঁর নাম দেন কৃপানন্দ। তাঁর পথ ছিল ভাব, ভক্তি, পূজা প্রভৃতি সহায়ে উপাসনা। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবপ্রবণতা এই দিক দিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করবে সর্বজ্ঞ গুরু তা বুঝতে পেরেছিলেন। কৃপানন্দকে এই সর্বপ্রথম স্বামীজি প্রচারকার্যে পাঠান।

* * *

সহস্র-দ্বীপোদ্যানে আসবার কয়েকদিন পরেই স্বামীজি আমাদের কয়েকজনকে দীক্ষা দিতে সঙ্কল্প করলেন। তার আগে আমাদের বললেন যে, মানুষের মনের ভিতর কি আছে তা জানবার তাঁর একটা গুহ্যশক্তি আছে। অবশ্য যদিও এ শক্তি তিনি খুব কমই ব্যবহার করেন,—কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যদি রাজী হই তাহলে তিনি একবার আমাদের মনগুলো একটু দেখে নেন। বলা বাহুল্য, আমরা এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হই। পরীক্ষা যখন শেষ হ'ল, তখন তিনি

আমাদের মন্ত্র দিলেন। আমরা তাঁর শিষ্য হলাম। পরীক্ষাতে তিনি বেশ খুশীই হয়েছিলেন। কি দেখলেন, জিজ্ঞাসা করাতে পরে বলেছিলেন যে, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গোটা ছবিটা তাঁর চোখের সামনে হাজির হয়েছিল। দেখলেন যে আমাদের অনেকেই তাঁর প্রতি খুব বিশ্বস্ত থাকবে এবং অনেকেরই বেশ আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। নানা নূতন নূতন জায়গার দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভাসতে লাগল—এর অর্থ এই যে, প্রাচ্য দেশের নানা জায়গায় আমাদের খুব ভ্রমণ করতে হবে। কোন্ কোন্ বাড়িতে কি রকম অবস্থার মধ্যে আমাদের থাকতে হবে, একথাও তিনি বললেন। দেখলেন যে আমাদের মধ্যে একজনকে ভারতের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে থাকতে হবে। এই রকম, প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ভবিষ্যতের আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও অন্তর্যামী গুরুদেব দেখতে পেয়েছিলেন। সেই সবই ঠিক ঠিক পরে ঘটেছে।

সহস্র দ্বীপগুলোর মধ্যে আমাদের এই 'উদ্যান' দ্বীপই সবচেয়ে বড়। এর দৈর্ঘ হচ্ছে নয় মাইল আর প্রস্থে প্রায় দুই মাইলের কাছাকাছি। সে সময় সেখানে জনমানব খুব বেশী ছিল না। আমাদের বাড়ীটি ছিল এক টিলার উপর ; সামনে দোতলা কিন্তু পেছনের দিকে তিন-তলা। আর বাড়ীর চতুর্দিকে খুব ঘন জঙ্গল। কাছেই বাইরের গণ্ডগোল ছিল না বললেই হয়—কচিৎ কোন বাইরের মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ত। স্বামীজি মাঝে মাঝে কেবল ল্যান্সবার্গকে নিয়েই বেড়াতে বেরুতেন। কখনো কখনো আমাদের দু-একজনকেও সঙ্গে যেতে বলতেন। আবার সময়ে সময়ে আমরা সকলেই একসঙ্গে দল করে বের হতাম। বেড়াতে বেড়াতে নানারকম গল্প হ'ত। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য জটিল তর্কাদি প্রায়ই হ'ত না। নির্জন বন দেখে স্বামীজি ভারতে অরণ্যানীর মধ্যে অতীতে সেই একান্ত বাস ও তপস্যার স্মৃতি উদ্দীপিত হ'ত—আর তখনকার সেইসব অনুভূতির কথা আমাদের শোনাতেন।

স্থানটি সব দিক দিয়েই আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হয়েছিল। আমেরিকাতে যে ঐ রকম একটা জায়গা পাওয়া যেতে পারে, এটা আমাদের বিশ্বাসই হয়নি। আর কী সব উচ্চ চিন্তাধারার সেখানে উদ্ভব হয়েছিল! কী দৈবশক্তির প্রকাশ আমরা সেখানে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেছি! কী অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ভাবরাশি সেখানকার বায়ুতে খেলে গেছে! নমস্কার সেই পুণ্যস্থানকে! আজ শত শত নমস্কার করি! সেখানে আমাদের গুরুদেবের ভেতরটা আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কত সব চিন্তা সেখানে আমাদের সামনেই অঙ্কুরিত হোল—পরে যেগুলি বড় বড় কার্যে রূপান্তরিত হয়েছে। সে কী পরম শুভ সুযোগ—দুর্লভ পুণ্য অভিজ্ঞতা আমাদের ভাগ্যে জুটেছিল! মিস ওয়াল্ডো তাই বলেছিলেন, 'কী আমাদের সুকৃতি যার বলে আমরা এতটা পেয়েছি?'

প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে যাঁরা সেখানে থাকতেন তাঁরা রান্নাবান্না ও অপরাপর গৃহকাজ সব নিজেরাই করে নেবেন—কোন চাকর রাখা হবে না। কিন্তু দেখা গেল আমাদের অধিকাংশই ঐসব ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ। ফলটা প্রথম প্রথম বেশ মজার—তারপর দস্তুরমত ভয়ের হয়ে উঠল। কয়েকখানা প্লেট ধুতেই কেউ হাঁফিয়ে উঠতেন—একটা রুটি টুকরো টুকরো করে কাটতেই কারুর বা ঘাম বের হ'ত—কেবল কাঁদতেই বাকী রাখতেন। যা হোক, এইসব ছোট-খাটো ব্যাপারে চরিত্রের কি রকম পরীক্ষা হয়, সেইটিই দেখবার। সমস্ত জীবন ধরে যে সব দুর্বলতা ভিতরে লুকিয়েছিল এই সমষ্টি-জীবনের একটি দিনেই তা আত্মপ্রকাশ করে ফেলত। ব্যাপারটা কিন্তু স্বামীজির ওপর গিয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ উল্টো রকমে। দলের মধ্যে একজন বাদে সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড় হলেও, ধৈর্য ও করুণায় তাঁকে আমাদের মনে হ'ত পিতা—বা স্নেহময়ী জননী। আহা, সে কী অসীম হৃদয়বত্তা! গোলমাল হয়ত যখন খুব পাকিয়ে উঠেছে তখন স্বামীজি তাঁর সব মাধুর্য ঢেলে, মৃদু হেসে বলতেন, 'আচ্ছা,

আজ আমিই রান্না করব।' ল্যান্সবার্গ অমনি লাফিয়ে বলে উঠত, 'বাপ্‌রে রক্ষা করুন—!' কথাটার পূর্বক্রম হচ্ছে এই যে, স্বামীজি ও তার নিউইয়র্কে থাকবার সময়, স্বামীজি যেদিন রান্না করতেন, তাকে সেদিন পরে চুল ছিঁড়তে হ'ত—কারণ তাঁর রান্না ঘরে ঢোকা মানে রান্নার পর, বাড়ির যত থালা বাসন সব তাঁকে মাজতে হ'ত। যা হোক্, আমাদের ঘরকন্নাতে অনেক অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার পর, একজন লোক নিযুক্ত করা হোল; অবশ্য একটু আধটু সাহায্য আমরা তাকে করে দিতাম। এবার সকলে অনেকটা শান্তিবোধ করতে লাগলেন।

কাজকর্ম নিয়ে গোলমাল যাই হোক, সে সব শেষ করে আমরা যখন ক্লাসঘরে জড় হতাম তখন কিন্তু ভাবটা সম্পূর্ণ বদলে যেত। এ জড়জগতের কোন কোলাহল সেখানে একেবারেই পৌঁছাত না। মনে হ'ত, আমরা যেন আমাদের দেহ আর দেহবুদ্ধি দুটোকেই বাইরে রেখে ঘরের ভেতর ঢুকেছি। অর্ধবৃত্তাকারে বসে আমরা অপেক্ষা করতাম—অনন্তের কোন্ দরজাটা আজ আমাদের সামনে উন্মুক্ত হবে? কোন্ দিব্যদৃষ্টি আজ আমরা গুরুকৃপায় লাভ করব? বাক্য ও মনের পারে শোক-সন্তাপহীন অসীমের রাজ্যের নূতন নূতন ছবি, নিত্য নূতন আশা, নূতন সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের চোখের সামনে হাজির হ'ত। আমাদের দূর-আশা, যা কল্পনাও করতে পারেনি গুরুদেব সেই অজানা রাজ্যের, দূর হতে দূরতর প্রদেশে নিত্য আমাদের নিয়ে যেতেন। তারপর আমাদের কার কতটা অনুভূতি হয়েছে না-হয়েছে জানি না, কিন্তু এইটুকু বলতে পারি যে জীবনে যত দুঃখকষ্ট, বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, সেগুলিকে কোনদিনই বাস্তব বলে মনে হয়নি।

তাঁর কাছে সেই গল্পটি শুনেছিলুম—কয়েকজন ভ্রমণে বেরিয়ে আনন্দ-মেলার প্রাচীর দেখতে পেলে। একজন তার ওপর উঠে ভেতরকার ব্যাপার দেখে লাফিয়ে পড়ল—সেখানকার আনন্দোৎসবে ভিড়ে গেল,

আর ফিরল না—পেছনের বন্ধুদের কথা তার মনেই রইল না। তারপর একজন—তারপর আর একজন—সকলেরই ঐ দশা। আমাদের কিন্তু কি অসীম সৌভাগ্য, আমরা এমন একজন বন্ধুকে পেয়েছিলাম যিনি আনন্দের মেলায় পৌঁছে আত্মবিস্মৃত হয়ে যাননি, আমাদেরও সেখানে নিয়ে যাবার জন্য করুণায় আবার ফিরে এসেছিলেন। সকাল থেকে মাঝ-রাত্রি পর্যন্ত চলত সেই আনন্দের বার্তা শোনানো। যখন দেখতেন তাঁর কথাগুলো খুব গভীরভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে—আমরা স্তব্ধ হয়ে গেছি, তখন মৃদু হেসে বলতেন—'গোখরো সাপে তোমাদের ধরেছে—আর নিস্তার নেই' বা কখনো কখনো বলতেন—'জালে তোমাদের ফেলেছি—কোথায় পালাবে?'

বাড়ির মালিক মিস্ ডাচার ছিলেন একজন গোঁড়া মেথডিস্ট। তিনি কি করে আমাদের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লেন, এটা একটা রহস্যকর ব্যাপার বটে—এবং সহজে বিশ্বাসযোগ্য নয়—কিন্তু সরল অকপট প্রাণীমাত্রকেই আকর্ষণ করবার স্বামীজির যে অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তার পরিচয় যিনি পেয়েছেন, তাঁর কাছে এটি তত আজগুবী বলে মনে হবে না। তাঁকে একবার দেখবার এবং তাঁর কথা শোনবার পর, তাঁকে অনুসরণ না করে থাকা বাস্তবিকই অসম্ভব ছিল। মানুষ মায়ার বশে যে দেবভাব হারিয়েছে, তা তার অন্তরতম প্রদেশ থেকে সর্বদাই তাকে আহ্বান করছে—'নাও, নাও, আমাকে ফিরিয়ে নাও'; যতদিন মানুষ তা ফিরে না পাবে—তার এই আহ্বানের ক্ষান্তি হবে না। আর স্বামীজি যে মানুষের অন্তর্নিহিত এই দেবত্বের পূর্ণ প্রকাশ—তাকে জাগাবার জন্য দেবত্বে তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মূর্ত মানুষ-বিগ্রহে অবতীর্ণ! তাই মিস ডাচার এই প্রবল শক্তির সামনে নিজের স্বাতন্ত্র্য আর বজায় রাখতে পারেননি। তাঁর পূর্বেকার আদর্শ, জীবনের হিসাব, চিন্তাধারা সব স্বামীজির সান্নিধ্যে ওলট্‌পালট্ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে হয়তো তিন চারদিন তিনি গা ঢাকা দিয়ে থাকতেন। স্বামীজি

বলতেন, 'দেখছ না—রোগটি ত সোজা নয়; মনের ভেতর ওর যে ঝড় চলেছে শরীর তার ধাক্কা সামলাতে পারছে না।' একটা ধাক্কা একবার খুব প্রবল রকমে হয়েছিল। ক্লাসে একদিন কথাপ্রসঙ্গে ডাচার স্বামীজির কি একটা কথার মৃদু প্রতিবাদ করে বলতে যাচ্ছিলেন, 'আমাদের কর্তব্য কি নয় যে......?' স্বামীজি গর্জে উঠলেন, 'কর্তব্যের ভাবটা হচ্ছে মহা দুঃখের জন্মদাতা—মধ্যাহ্ন সূর্যের মত জীবাত্মাকে পুড়িয়ে মারে।' কোন বিষয়ে গোঁড়ামী মাত্রকেই এমনি জোর আঘাত করে স্বামীজি ভেঙে চুরমার করে দিতেন।

স্বামীজির শিক্ষা দেওয়ার ধরন ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে। শিষ্যত্ব স্বীকার করবার ইচ্ছা খুব স্পষ্টতঃ প্রকাশ না করলে, কারও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হাত দিতেন না। একবার আমাদের অপরিচিত একটি লোকের কথায় তিনি বললেন, 'উনি হচ্ছেন বন্ধু—শিষ্য নন।' আর এই 'বন্ধু' ও 'শিষ্য'র মধ্যে কি প্রভেদ তা খুব বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। প্রভেদ আকাশপাতাল। 'বন্ধু'র বাইরের দোষ, কুসংস্কারগুলি থাকতে পারে; তাতে তাঁর বলবার কিছুই নেই, কিন্তু যে তাঁর শিষ্য হয়েছে, তার ইহকাল পরকালের সকল ভাবনা তাঁকে ভাবতে হবেই। বেশ মনে পড়ে যে কারও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করলে, এ অনধিকার চর্চাটাকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারতেন না; কিন্তু সেই তিনিই আবার তাঁর শিষ্যদের চিন্তা ও চরিত্রের ত্রুটিগুলির কি কঠোর প্রতিবাদই করতেন। শিষ্যদের কেউ কেউ ছিলেন খুব আশাবাদী—যা কিছু সবই সুন্দর; সবই সৎ, সবই মঙ্গলময়, খারাপ কিছু নেই জগতে,—এই ভাবের ভাবুক তাঁরা। আজ মনে পড়ে স্বামীজি এইসব নবোৎসাহীদের রঙিন কল্পনা কী নির্দয়ভাবেই চুরমার করে দিতেন! ভালটা যেমন সত্য, মন্দটাও তেমনই সত্য। একটা জিনিসেরই দুটো দিক হচ্ছে ওই দুটো। দুটোই হচ্ছে মায়ার অন্তর্গত। বালিতে মুখ লুকিয়ে

বলো না—'সব ভাল, মন্দ কিছু নেই।' ভালকে যেমন পূজো করছ, মন্দকে, ভীষণকেও তেমনি পূজো করতে শেখ। তারপর ভালমন্দ দুটোরই পারে চলে গিয়ে বল 'ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।'

'বিপদের মুখে কি তুমি বলতে পার যে জগৎ খুব সুন্দর? তুমি যখন জগৎকে সুন্দর বলছ তখনও কি লক্ষ লক্ষ লোক কত কষ্ট পাচ্ছে না? তাদের কাছে জগৎটা কি রকম মনে হচ্ছে ভেবে দেখেছ কি? জগতে ত কেবলই দুঃখ। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ত জগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবুও কি করে বল 'জগৎ সুন্দর'? এই সব দেখেশুনেও যে জগৎকে সুন্দর বলতে সাহস করে, সে হয় অজ্ঞান, নয়ত অপরের দুঃখকষ্টে উদাসীন, ঘোর স্বার্থপর সে।'

এই কঠোর সত্যের শিক্ষা আমাদের হৃদয়কে আঘাত করত, খুব সজোরে সন্দেহ নেই, কিন্তু অতীন্দ্রিয় কিছুর আভাস অল্পদিনেই আমরা একটু পেতে আরম্ভ করলাম। জন্মমৃত্যুর পারে হচ্ছে অমৃতত্ব, সুখ-দুঃখের পারে হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ, যা মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, আর সদা পরিবর্তনশীল এই জীবনপ্রবাহের পশ্চাতে রয়েছে সেই অপরিবর্তনীয় সত্তা। এইসব বিরাট ভাবগুলি যখন আমাদের চিন্তার অন্তর্গত হতে লাগল, তখন এক নূতন গগন, এক নূতন পৃথিবী আমাদের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত হোল। স্বামীজি কখনও উপদেশ দিয়ে আমাদের বলেননি, 'সত্যনিষ্ঠ হও, অকপট হও, একপ্রাণ হও।' কিন্তু ঐসব গুণগুলিকে আয়ত্ত করতে তবুও কী ঐকান্তিক আগ্রহ আমাদের জেগেছিল! চোখের সামনে সত্য, সারল্য একতানতার যে জীবন্ত বিগ্রহকে অহোরাত্র দর্শন করছিলাম, তার শক্তি কি আর বাক্যের অপেক্ষা করে?

'সংসারটা হচ্ছে কাদার ভেতর খেলা করা, এর বেশী কিছুই নয়'—এই বলে জগতের ওপর স্বামীজি যেদিন আমাদের বিতৃষ্ণাবুদ্ধির উদয় করতে চেয়েছিলেন, মনে পড়ে সেদিন কথাগুলি আমাদের বহির্মুখ মনকে বড় জোর আঘাত করেছিল। তাঁর সর্ব-ভোগ ভুক

কঠোর সন্ন্যাসের আদর্শ, আমাদের পক্ষে অত্যধিক উঁচু মনে হচ্ছিল, তাই ঐ সূচিমুখ কথাগুলোর যে অল্পবিস্তার প্রতিবাদও আমরা তখন করিনি—এমন নয়। তারপর বহু বর্ষ কেটে গেছে। আজ মনে হয়, জগৎরূপ কাদার ভেতর হুটোপুটি খেয়ে মহিষের কদর্য আনন্দ উপভোগের চেয়ে বাস্তবিকই মানুষের অনুশীলন করবার কিছু নিশ্চয়ই আছে। মানুষ যে ভূমার অধিকারী,—তার অল্প, পরিচ্ছন্ন, জগৎসুখে মেতে থাকা একেবারেই শোভা পায় না।

আমাদের সমস্যাগুলি আগাগোড়া সমাধান করে নিতে স্বামীজি নারাজ ছিলেন। সূত্রটা কেবল তিনি ধরিয়ে দিতেন—বাকী আমাদের করে নিতে হবে। বজ্র নির্ঘোষে তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত—'নিজের পায়ে দাঁড়াও—সব শক্তি তোমার ভেতরই রয়েছে। শক্তি! শক্তি! শক্তি! বলবীর্য ভিন্ন আমার বলবার আর কিছুই নেই—আর কিছুই নেই—আর তাই আমি উপনিষদ প্রচার করি।'

পুরুষের নিকট তিনি চাইতেন পুরুষত্ব—পুরুষোচিত তেজ; ওজস্বিতা নির্ভীকতা। নারীর নিকটও ঐ রকমই একটা নারীজনোচিত ভাব আশা করতেন—অবশ্য তার প্রতিশব্দ আমি দিতে অক্ষম। সে গুণ যাই হোক তা যে নিষ্ফল আত্মবিলাপ, ভীরুতা ও দৌর্বল্যের উল্টো, তা নিশ্চিত। স্বামীজির এই ভাব, সকলের কাছে একটা জোর সালসার কাজ করত। বহুদিনকার সুপ্ত-শক্তি জেগে উঠত, আর তার সাথে আসত অদ্ভুত বল, অপূর্ব স্বাধীনতা।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা মণি বাগচী

স্বামী বিবেকানন্দের দেশব্যাপী জন্মশতবার্ষিকীর দিনে আমরা তাঁর মানস-কন্যা নিবেদিতার কথা স্মরণ না করে পারি না। নিবেদিতাকে তাঁর আচার্যদেবের পরমাশ্চর্য জীবনের সার্থক উপসংহার বলা যেতে পারে, কারণ, সেই বীর বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর জীবনের অসমাপ্ত কর্ম বা চিন্তা, তাঁর এই শিষ্যাটির কর্ম ও চিন্তার মধ্যেই একটি সুষ্ঠু পরিণতি ও পরিসমাপ্তি লাভ করেছিল। বাঙালী তথা ভারতবাসীর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের যে স্থান, এবং আমাদের কর্মে ও চিন্তার মধ্যেই একটি সুষ্ঠু পরিণতি ও পরিসমাপ্তি লাভ করেছিল। বাঙালী তথা ভারতবাসীর জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের যে স্থান, এবং আমাদের কর্মে ও চিন্তায় তাঁর ভাবধারার যে প্রভাব আমরা অনুভব করি (অন্তত অনুভব করা উচিত বললেই ঠিক হয়), ভগিনী নিবেদিতা-সম্পর্কেও ঠিক সেই একই উক্তি নির্ভয়ে করা যেতে পারে। আমি এই মহীয়সী মহিলার জীবন-কথা আলোচনায় যখন সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, তখন থেকেই এই নারী-চরিত্রটি আমাকে যারপরনাই মুগ্ধ করে। নিবেদিতার কথা যেন শতমুখে শতবার কীর্তন করেও শেষ করা যায় না। বিবেকানন্দকে বুঝতে গেলে সর্বাগ্রে নিবেদিতাকে বুঝতে হয়, এই কথাটা আমরা যেন বিশেষভাবে মনে রাখি।

সন্ন্যাসীর জীবনকাব্যের সবচেয়ে সুষমামণ্ডিত অধ্যায় নিবেদিতা। বিবেকানন্দের ভারত-স্বপ্নের মূর্তিমতী প্রতিমা এই বিদেশিনী মহিলা। এই বিদুষী আইরিশ মহিলাকে যখন তিনি লণ্ডনে প্রথমে দেখেছিলেন, তখন তার সঙ্গে পরিচিত হোয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। লিখেছিলেন এক পত্রে: 'ভারতবর্ষের জন্য যে কাজ তুমি করবে,

তার বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। পুরুষ নয়, সিংহিনীর মতো শক্তিময়ী একটি নারী চাই।' মিস মার্গারেট নোবেলের মধ্যে বিবেকানন্দ এই শক্তিময়ী নারীকে প্রত্যক্ষ করেই তাঁকে গ্রহণ করে নির্মাল্য হিসাবে নিবেদন করেছিলেন ভারতমাতার বেদীমূলে। এঁর শিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানবপ্রেম আর সংকল্পের দৃঢ়তা—এইসব দেখেই কি বিবেকানন্দ সেই সুন্দর উক্তিটি করেছিলেন: Nivedita is the fairest flower of my work in England,'—এমন কথা তিনি তাঁর আর কোনো বিদেশী শিষ্য বা শিষ্যা-সম্পর্কে বলেননি। ভারতের প্রতি পাশ্চাত্ত্য জগতের সেদিন এইটিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ উপঢৌকন—এতবড়ো উপঢৌকন য়ুরোপ থেকে আমরা আজ পর্যন্ত আর দু'টি পাইনি। তাই বলছিলাম, নিবেদিতার কথা আজ নতুন করে স্মরণ করবার, আলোচনা করবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বোপরি ভারতপ্রেমিক। স্বামীজির ভারতপ্রেম তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, আন্তরিকতায় মহৎ—এত মহৎ যে তা' সহজে ধারণা করা যায় না। বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম বুঝতে হোলে তাঁর ভাবে ভাবিত হোতে হয়। যাঁরাই তাঁর ভারতচিন্তা গভীরভাবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করেছেন, তাঁরাই এটা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সন্ন্যাসীর ভারতপ্রেম ভারতের অতীত গৌরবের রোমন্থনমাত্র ছিল না; তাঁর ভারতপ্রীতির মধ্যে আভাসিত হয়েছে দুর্জয় পৌরুষ, অসামান্য আত্মিকশক্তি আর অতুলনীয় ধী-শক্তি। তাঁর জীবনচরিত পাঠ করে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, সর্বকালীন ভারতের দুর্দশা, তার পরাধীনতা, তার লাঞ্ছনা স্বামী বিবেকানন্দকে পাগল করে দিয়েছিল বেদনায়। কেমন করে ঘুচবে তাঁর স্বজাতির রাজনৈতিক পরাধীনতার দুর্বিষহ অপমান আর হীনতা, এই ছিল সেই সন্ন্যাসীর দিনের

চিন্তা—রাত্রির স্বপ্ন। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে নিভৃতে ধ্যান-জপ নিয়ে কিম্বা আধ্যাত্মিকতার চর্চা করে বিবেকানন্দ তাঁর জীবন অতিবাহিত করেননি বা তাঁর সতীর্থদের করতেও বলেননি। এ কথা আজ আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলব যে, স্বামীজির সাধনার প্রাণবায়ু ছিল ভারতবর্ষের মুক্তি, সে মুক্তি শুধু ধ্যান-ধারণার দ্বারা ব্যক্তির উপলব্ধিমূলক মুক্তি নয়, সে মুক্তি জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি।

বিবেকানন্দের এই চিন্তাধারার উত্তরাধিকারিণী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর জীবনে যে তাঁর আচার্যদেবের রাজনৈতিক সত্তার প্রবল ছাপ পড়বে, সেটি সহজেই অনুমেয়। কেল্‌টিক রক্ত প্রবাহিত ছিল নিবেদিতার ধমনীতে, আইরিশ বিপ্লবের কোলে আবাল্য লালিত-পালিত হওয়ার ফলে ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল তাঁর জাতিগত সংস্কার। জাতীয় মুক্তিকে আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেখা যেমন সম্ভব ছিল না বিবেকানন্দের পক্ষে, তেমনি সম্ভব ছিল না নিবেদিতার পক্ষে। গুরু ও শিষ্যার মন এক্ষেত্রে যেন একসুরে বাঁধা ছিল। বিবেকানন্দকে লণ্ডনে প্রথমে সন্দর্শনের পর তাঁর কাছে এই বিদুষী আইরিশ কুমারীর আত্ম-সমর্পণের ইতিহাস সুপরিচিত। ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁকে ভারতমাতার চরণতলে উৎসর্গ করে বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন : 'যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক! আর যদি ইহার মূলে সেই পরমাশক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও। তোমার জয় হউক।' বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্কটি বুঝবার পক্ষে স্বামীজির এই উক্তিটি আমাদের বিশেষ সহায়ক। সত্তার শিখর থেকে এমন মহত্তম বাণী পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত খুব কমই উচ্চারিত হয়েছে।

কুমারী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল [১৮৬৭-১৯১১] বিদুষী ও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালিনী নারী ছিলেন। স্বাধীন প্রকৃতি ও সর্বসংস্কারমুক্ত শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ কলকাতায় ওকাকুরার অভ্যর্থনা-সভায় আমেরিকান কনসালের বাড়িতে প্রথম যখন এই বিদেশিনীকে দেখেন তখন তাঁর মনের ভাব তিনি তাঁর অনন্যুকরণীয় ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করেছেন: 'কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন নিবেদিতা।···গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে শাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা; ঠিক যেন শাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি।·· সে যে কি দেখলুম কি করে বুঝাই। নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাঁদের সৌন্দর্যফ্যাশানে চারদিকে ঝলমল করছে। তাঁদের মধ্যে নিবেদিতা যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হোল। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল।·· আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল। নিবেদিতা যেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা।'

শুধু সৌন্দর্যের নয়, গুণেরও পরাকাষ্ঠা ছিলেন এই ভারত-দুহিতা। তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ-বিষয়ে এবং এই দেশের নর-নারীর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আন্তরিকতা সবই অতুলনীয় ছিল। পাশ্চাত্ত্য জগতের নিকটে গুরুর মৃত্যুর পর, সকল বিষয়ে তিনিই ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠা মুখপাত্রী। নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের মধ্যে বয়সের ব্যবধান মাত্র চার বছর নয় মাস। এই মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী তাঁর জীবনের গতি এমনভাবেই পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন যার ফলে নিবেদিতা তাঁর গুরুর চিন্তায় একাত্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর সমগ্র জীবন এই দেশের মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন। আত্ম-উৎসর্গের এমন মহিমময় ইতিহাস আর কখনো

দেখা যায়নি। এই আশ্চর্য চরিত্রের নারীর জীবনেতিহাস আমি যতই আলোচনা করেছি, ততই আমার মনে হয়েছে যে, তাঁর স্বাধীন প্রকৃতি ও আইরিশ মনোভাবের সঙ্গে মিলেছিল তাঁর গুরুর স্বাধীন প্রকৃতি ও স্বদেশ-প্রীতি। পরবর্তীকালে এই কুমারী মার্গারেটের ভিতর থেকে যখন নিবেদিতা-সত্তার আবির্ভাব হোল, তখন দেখা গেল যে, বিবেকানন্দের ভারতপ্রীতি শিষ্যার মধ্যে পরিপূর্ণভাবেই সংক্রামিত হয়ে গিয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বামীজির নতুন জীবনদর্শনের মধ্যে তিনি এমন কিছু পেয়েছিলেন যার ফলে এই আইরিশ- তনয়ার জীবনপ্রবহণ এক নতুন পথে প্রবাহিত হয়। কুমারী এলিজাবেথ মার্গারেট নোবেল হলেন ভারত-দুহিতা নিবেদিতা। এই নামের মধ্যেই তাঁর নবজন্ম। ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসে এ ছিল একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। এর আগে আর কোনো বিদেশী মহিলা এমনভাবে গোত্রান্তরিত হয়ে সন্ন্যাসিনী সাজেননি।

সেদিন এই বিদেশিনী শয্যার কাছে বিবেকানন্দের এই প্রত্যাশা ছিল : 'ভবিষ্যৎ ভারত যেন তোমা মাঝে পায়, একাধারে শিক্ষাগুরু-সেবক-সবায়।' স্বামীজির এই আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়নি। বাংলা ও ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের ইতিহাসে এঁর রাজনীতি, শিক্ষা ও সমাজ, সংস্কৃতি ও শিল্প, এমন কি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিবেদিতার প্রভাব অনস্বীকার্য। এই মহীয়সী মহিলার জীবনেতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরাই দেখেছেন নিবেদিতার সমগ্র জীবনই ছিল তাঁর গুরু-প্রদত্ত মন্ত্রের সাধনা। তাঁর আত্মবিলোপ গুরুর আদর্শের মধ্যেই আত্মবিলোপ। নিবেদিতা নিজেই বলেছেন, 'ইনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন, তা আমি প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিলাম এবং তাঁর স্বজাতি-প্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে ইচ্ছুক হয়েছিলাম। কিন্তু এই যে আমার আনুগত্য স্বীকার, এ শুধু তাঁর

চরিত্রের নিকটেই। আচার্যদেবের চরিত্র-মাহাত্ম্যে অতীব মুগ্ধ হয়েই আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম।' ব্যক্তিত্বসম্পর্কহীন এক মহাপ্রেমই সেদিন এই বিদেশিনীকে কন্যারূপে, কল্যাণীরূপে এই দেশের প্রতি আকর্ষণ করেছিল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ, ৪ঠা জুলাই। বিবেকানন্দের মহাসমাধি হোল। গুরুর তিরোধানের পর নিবেদিতা প্রথমেই বিবেকানন্দ-প্রচারে অগ্রসর হোলেন। তাঁর জীবনের 'মিলন' ছিলেন বিবেকানন্দ, অন্য কিছু নয়। তাঁর গুরু বিশ্ববিজয়ী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, কিম্বা তিনি রামকৃষ্ণের ভক্ত, এই গতানুগতিকভাবে গুরুর মহিমা-প্রচারের কথা নিবেদিতার আদৌ মনে হয়নি। তিনি তাঁর গুরুকে চিনেছিলেন, বুঝেছিলেন সত্য করে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে যে বিপ্লবী বিবেকানন্দ ছিল তারই সাম্যঘন আগ্নেয়রূপ তিনি বাঙালীর নিকট, ভারতবাসীর নিকট এইবার তুলে ধরতে চাইলেন। সেই বিপ্লবী বিবেকানন্দ স্বদেশাযুগের উষার আহ্বানমাত্র করে গিয়েছেন, এখন তাঁর স্বদেশপ্রেমের জীবন্ত ভাবধারা তাঁর স্বজাতির নিকট বিশেষ করে প্রচারিত হওয়া দরকার, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে নিবেদিতার কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি। বিবেকানন্দের তিরোধানের অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতার এক জনসভায় নিবেদিতা স্বামীজি-সম্পর্কে একটি ভাষণ দিলেন।' সেই ভাষণে তিনি বিবেকানন্দকে একেবারে মিশনের গণ্ডীর বাইরে এনে ঘোষণা করলেন: 'স্বামীজিই আমার ধর্ম, আমার দেশ-হিতৈষণা, সব··· স্বামীজি আমাদের মহান্ জাতীয় নেতা।' ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়েই সেদিন তিনি এই ঘোষণা করেছিলেন। এর সেদিন প্রয়োজন ছিল।

গুরুর তিরোধানের পর দেখা গেল তাঁর ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে নিবেদিতা গুরুপূজা করে সময় কাটাননি, অথবা নিভৃতে শোকের বিলাপ করে কালহরণ করেননি। এই মহাপুরুষের

অকালতিরোধানে সারা ভারতের সংবাদপত্রে শোকের একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্লাবন বয়ে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু যে উদ্দীপনা, যে উৎসাহ নিয়ে স্বামীজি নিদ্রিত ভারতকে জাগাতে চেয়েছিলেন, নিবেদিতা অত্যন্ত বেদনাহতচিত্তে লক্ষ্য করলেন, তা' যেন তাঁর তিরোধানের পরে অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তিনি আরো অনুভব করলেন যে, ভারতের প্রাণের কথা যাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলতো, যাঁর জীবনদর্শন জীবনের নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে গিয়েছে, সেই বীর্যবান্ ভারত-প্রেমিক সন্ন্যাসী জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা যেন শূন্যে বিলীন হোতে চলেছে। রামকৃষ্ণ-মিশন নীরব—তাঁরা স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদ বা স্বদেশপ্রেম কোনোটাকেই স্বীকার করলেন না; এমন কি, বিবেকানন্দ-প্রচারে মিশনের কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের কোনো আগ্রহ পর্যন্ত দেখা গেল না। বিবেকানন্দ দেশব্যাপী যে আলোড়নের সৃষ্টি করে গেছেন, দৃশ্যতঃ তা' ভিন্নমুখী হোতে চলেছে। সর্বোপরি, এই সন্ন্যাসী-সম্পর্কে দেশের মধ্যে তখনো নানা লোকের নানা মত। সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মপ্রচারকের উপর কেউ তাঁকে যেন স্থান দিতেই চায় না। নিবেদিতা এসবই লক্ষ্য করলেন, গভীরভাবে চিন্তা করলেন — কিছুটা বিচলিতও হোলেন। তখনই তিনি বুঝলেন, এখন দরকার বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর বিশ্লেষণ, ব্যাখান ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচার।

বিবেকানন্দের জীবনব্রতের উত্তরাধিকারিণী নিবেদিতা গ্রহণ করলেন এই গুরুদায়িত্ব। জনসভায় বক্তৃতা করে, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে আর দেশের বিভিন্ন স্থানে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' গঠন করে নিবেদিতা কিভাবে বিবেকানন্দ-প্রচারের দুরূহ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন সে-ইতিহাস জানবার মতন। গুরুর দেহত্যাগের সপ্তাহকাল পরে তাঁর সম্পর্কে ইংরেজিতে প্রথম যে প্রবন্ধটি তিনি রচনা করেন সেটির নাম: *The National Significance of the Swami Vivekananda's Life and Work* অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের

জীবন ও কর্মের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। প্রবন্ধটি মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিবেদিতা তাঁর গুরুকে কতখানি সত্য করে চিনেছিলেন। বুঝেছিলেন তার পরিচয় আছে এই প্রবন্ধটির ছত্রে ছত্রে। এই প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখেছেন :

'Man-making was his own stern brief summary of the work that was worth-doing. Burning renunciation was chief of all inspirations that spoke to us through him···. Vivekananda was at once a sublime expression of superconscious religion and one of the greatest patriots ever born. In him the national destiny fulfilled itself. To him his country's hope was in herself. Never in the alien. To him nothing Indian required apology. To Vivekananda, again, everything Indian was absolutely and equally sacred.'

বিবেকানন্দ সম্পর্কে এইরকম দৃষ্টিভঙ্গী, সেদিনও যেমন, আজো তেমনি বিরল। এইভাবেই নিবেদিতা জাতির নিকট বিবেকানন্দকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। এ কাজ তিনি ভিন্ন আর কেউ করতে পারত না। জাতীয়তার যে অগ্নিমন্ত্রে স্বীয় আত্মসৃষ্ট কন্যাকে বিবেকানন্দ দীক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন ; নিবেদিতা তাঁর অন্তর দিয়ে তার সবটুকু গ্রহণ করেছিলেন। সেদিন ভারতের জনসমাজের দ্বারে দ্বারে অক্লান্তভাবে বিবেকানন্দের স্বদেশ-প্রেমের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। কথিত আছে, একদিন গভীর রাত্রে বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের সেই জীর্ণ বাড়িতে একটি স্বল্পালোকিত কক্ষে বসে নিবেদিতা যখন 'হিন্দু' পত্রিকার জন্য এই প্রবন্ধটি শেষ করে টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত স্বামীজির ফটোখানির দিকে তিনি একবার তাকালেন। একদা এই

ফটোখানি স্বহস্তে শিষ্যার হাতে দিয়ে বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন : 'ভারতের পুনরুত্থানকল্পে তোমার সেবা যেন সার্থক হয়।' গুরুর ছবিখানির দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে সেই কথাটি দ্বিতীয়বার নিবেদিতার মনে পড়েছিল নিশ্চয়ই। বিবেকানন্দকে তাই তিনি বিস্মৃত হোতে দেননি। আমরা, তাঁর স্বদেশবাসী, বিবেকানন্দকে কিন্তু বিস্মৃত হয়েছি, এই কঠিন সত্যটি আমরা যেন অকুণ্ঠচিত্তেই স্বীকার করি।

নারীশিক্ষা ও স্বামী বিবেকানন্দ রমা চৌধুরী

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন একদিকে ছিলেন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ধর্মগুরু, অন্যদিকে ঠিক তেমনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সমাজসেবক ও জনত্রাতা। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, দর্শন ও ধর্ম কেবল তাত্ত্বিক বিদ্যাই মাত্র। কিন্তু স্বামীজি সজোরে বারংবার বলেছেন যে, দর্শন ও ধর্মের তুল্যমূল্য ব্যবহারিক দিকও আছে।

'আমি একজন প্রতীকই মাত্র। আমি একজন ত্যাগী সন্ন্যাসীই মাত্র। আমি কেবল একটি জিনিসই মাত্র কামনা করি। আমি সেই ঈশ্বর বা সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না, যিনি বিধবার চোখের জল মোছাতে বা অনাথের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেন না।'

কি অপূর্ব সুন্দর কথা এটি!

এরূপে, তত্ত্বের দিক্ থেকে যা বিশ্বাত্মবাদ, ব্যবহারের দিক্ থেকে বিশ্বসেবাবাদ। সেজন্য অদ্বৈত বেদান্তবাদী স্বামীজির সুধন্য-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল জনসেবা। বিশেষ করে, সমাজের অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত, উৎপীড়িত জনগণের জন্য ছিল তাঁর সহানুভূতি প্রচুর, এবং সেজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাদীক্ষাহীনা, অত্যাচারিতা, সামাজিক অধিকারবিহীনা নারীদের প্রতিই তাঁর সহৃদয় দৃষ্টি সর্বপ্রথম পতিত হয়। তিনি নারীসমাজের উন্নতির জন্য যে প্রাণপাত প্রচেষ্টা করেন, তা' ভারতবর্ষের নারী-প্রগতির ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে, নিঃসন্দেহ। তিনি বারংবার বলতেন: 'নারী জাতির উন্নতি ও জনগণের জাগরণ—এই দু'টিরই প্রয়োজন সর্বপ্রথম এবং তখনই কেবল দেশের, ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে।'

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ: *The Master as I*

saw Him'-এ আবেগভরে বলেছেন : 'অন্তত: আমার গুরুদেব মনে করতেন যে তিনি সে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শাশ্বত, মহাব্রত হল 'নারী ও জনগণের' জন্য প্রাণপাত করা। তিনি যখন খেত্‌ড়ির রাজাকে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন, তখন এই কথাই তাঁর মুখে স্বতঃই এসে গিয়েছিল। বিদেশে যখনই তিনি অনুভব করতেন যে, মৃত্যু তাঁর নিকটবর্তী, তখনই তিনি শিষ্যদের বলতেন : 'কোনো দিনও ভুল না—'নারী ও জনগণ'— এই ত হল মূলমন্ত্র'। [পৃঃ ৩৫৬, তৃতীয় সং]

নারী-প্রগতির উপায় উদ্ভাবন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন বৈদিক যুগের উচ্চ আসন থেকে তাঁদের পতনের কারণ নির্ণয়। নিশ্চয়ই নানাবিধ কারণ আছে—যথা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তারই ফলস্বরূপ ভীতচকিত সমাজপতিগণ কর্তৃক অন্যায় বিধি-বিধান-প্রবর্তন। কিন্তু মূলগত কারণ কি? মূলগত কারণ হল উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। যে কোনো কারণেই হোক্ না কেন, লুপ্তবুদ্ধি সমাজপতিগণ যে মুহূর্তে নারীশিক্ষার পথ রুদ্ধ করেছেন, সেই মুহূর্তেই তাঁরা নারী-প্রগতি তথা দেশ-প্রগতির পথেও নিক্ষেপ করেছেন জগদ্দল প্রস্তর। সেজন্য নারী-প্রগতির একমাত্র পন্থাই হল নারীশিক্ষা-বিস্তার। স্থির বিশ্বাস-ভরে স্বামীজি বলেছেন : 'তাঁদের অসংখ্য ও গুরুতর সমস্যা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এরূপ কোনো সমস্যা তাঁদের নিশ্চয়ই নেই, যার সমাধান এই শিক্ষার যাদু স্পর্শে না হয়।' বারংবার তিনি সজোরে বলেছেন : 'স্থির জেনো যে, নারীদের বর্তমান অবস্থার উন্নতি কোনক্রমেই হবে না, যদি না সর্বপ্রথম তাঁদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয়।'

অবশ্য নারী-প্রগতির জন্য শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথা সকল দেশের সকল সমাজসেবকই বলেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজির বৈশিষ্ট্য হল এক অভিনব প্রণালীর শিক্ষার বিধি দেওয়া। কারণ, সাধারণতঃ সমাজ-সংস্কারের দিক্ থেকে যে শিক্ষার কথা বলা হয়,

তা' ব্যবহারিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা নয়। কারণ, সাধারণ সমাজ-সেবকগণ মানুষের দেহমনের কথাই কেবল চেন্তা করেন, আত্মার কথা একেবারেই নয়। কিন্তু স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদের মূলীভূত, অপরূপ বৈশিষ্ট্য হল এর আধ্যাত্মিক ভিত্তি অথবা দেহমনের উপরেও আত্মাকে কেন্দ্রীভূত স্থানে স্থাপন। এই কারণে, স্বামীজির মতে শিক্ষার মূল কথা হল—শক্তি, দৈহিক শক্তিই কেবল নয়, অর্থনৈতিক প্রাধান্যই কেবল নয়, রাজনৈতিক প্রভুত্বই কেবল নয়, কিন্তু আত্মিক শক্তি, আধ্যাত্মিক বিকাশ, 'শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ-স্পর্শজনিত মহাবল।'

এই আধ্যাত্মিক দিক থেকে, নরনারীতে কোনরূপ ভেদের প্রশ্নই উঠতে পারে না। বারংবার, সজোরে স্বামীজি বলেছেন :

'মনে রাখবে, স্ত্রী পুরুষ দুই চাই। আত্মায় স্ত্রী পুরুষে ভেদ নেই।'

সেজন্য এই দিক্ থেকে স্বামীজি স্বপ্ন দেখেছিলেন সম্পূর্ণরূপে স্ত্রী-পরিচালিত স্ত্রী-মঠের। পুরুষদের জন্য মঠে যেমন থাকবেন কেন্দ্র-স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নারীগণের জন্য মঠে ঠিক তেমনি থাকবেন প্রাণপ্রতিম হয়ে মহাজননী শ্রীসারদামণি দেবী। তাঁরই পুণ্য আদর্শে অনুপ্রাণিতা, পরার্থে জীবনোৎসর্গকারিণী ব্রহ্মচারিণীগণ সমবেত হবেন বেলুড় মঠের বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরে এই পবিত্র মঠে। পুরাকালে নারী-ঋষিদের মতই তাঁরা উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলনে হবেন অগ্রণী, এবং সেই জ্ঞান অকাতরে বিতরণ করবেন সাধারণ নারীদের মধ্যে। এই স্ত্রী-মঠের সঙ্গে একটি বালিকা বিদ্যালয় থাকবে। তাতে শাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ এবং ইংরাজী পড়ানো হবে। তা'ছাড়া সেলাই, রন্ধন, সাংসারিক কাজকর্মও শিক্ষা দেওয়া হবে। এই সঙ্গে জপ, উপাসনা, ধ্যান প্রভৃতিও শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপেই গৃহীত হবে। ছাত্রীরা মঠেই বসবাস করবেন এবং মঠ থেকেই তাঁদের ভরণপোষণের

ব্যবস্থাদি করা হবে। যাঁরা এভাবে থাকতে পারবেন না, তাঁরা স্বগৃহ থেকে এসেও শিক্ষালাভ করে যেতে পারেন এবং মধ্যে মধ্যে মঠাধ্যক্ষার অনুমতিসাপেক্ষে মঠে কিছুদিন থেকেও যেতে পারেন। বয়স্কা ব্রহ্মচারিণীগণ ছাত্রীদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেবেন। মঠে এই ভাবে পাঁচ ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পরে, ছাত্রীগণের অভিভাবকরা তাদের বিবাহও দিতে পারেন। কিন্তু যদি তারা যোগ ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য সমর্থা বলে বিবেচিত হয়, তা'হলে অভিভাবকগণের অনুমতিসাপেক্ষে, তারা ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বন করে মঠে স্থায়ীভাবে থেকেও যেতে পারে। এই সকল ব্রহ্মচারিণীগণই ভবিষ্যতে মঠের শিক্ষয়িত্রী ও ধর্মপ্রচারিকা হবেন। শহর ও গ্রামে, তাঁরা নারীশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে নারীশিক্ষাপ্রচারে ব্রতিনী হবেন। এরূপ অদর্শচরিত্রা, পবিত্রস্বভাবা, পুণ্যশ্লোকা সন্ন্যাসিনীগণের মাধ্যমেই দেশে প্রকৃতরূপে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়াস হবে। স্ত্রী-মঠেরও মূলভিত্তি হবে ব্রহ্মচর্য। মঠের ছাত্রীগণের মূলমন্ত্র হবে আধ্যাত্মিকতা, আত্মোৎসর্গ, আত্মসংযম ; এবং সেবাধর্মই হবে তাদের প্রধান ব্রত। তখন তাদের প্রতি আর অবিশ্বাস কার হবে? যদি দেশের নারীদের জীবন এইভাবে গঠিত হয়, তা'হলেই ত সীতা, সাবিত্রী, গার্গী প্রভৃতির মত আদর্শচরিত্রা নারীগণের পুনরাবির্ভাব হতে পারে।

নারীদের অবশ্য পঠনীয় বিষয়গুলির মধ্যে স্বামীজি উল্লেখ করেছেন, 'ইতিহাস, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, রন্ধন, সেলাই, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি।'

চির-আশাবাদী স্বামীজি পরম-আশাভরে বলছেন: 'ত্যাগ ব্যতীত পৃথিবীর কোন মহৎ কর্মই সাধিত হয়নি। বটবৃক্ষের অতি ক্ষুদ্র চারাটিকে দেখে, কেই-বা কল্পনা করতে পারে যে, কালপ্রবাহে তাই পরিণত হবে একটি অতি বিশাল বটবৃক্ষে? বর্তমানে আমি এইভাবেই মঠটি স্থাপিত করব। পরে, দু'এক পুরুষ পরে, দেশের

লোক এই মঠকে সমাদর করবেন নিশ্চয়ই। আমার নারী-শিষ্যেরা এর জন্য জীবনোৎসর্গ করবেন। ভয় ও কাপুরুষতা বিসর্জন দিয়ে তোমরাও এই পবিত্র কার্যে যোগদান কর এবং সকলের সম্মুখে এই আদর্শ তুলে ধর। তোমরা দেখবে যে, সময়ে এই স্ত্রী-মঠ সমগ্র দেশের উপরই আলোক-সম্পাত করবে।'

অতি দুঃখের বিষয় যে, স্বামীজির জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রী-মঠ স্থাপনের এই মহান্ স্বপ্ন সফল হয়নি। তা'হলেও এই ইচ্ছা যে তাঁর কত বলবতী ছিল, তা' বোঝা যাবে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি থেকে : 'সুতরাং, আমাদের শ্রীমায়ের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতেই হবে। প্রথমে, মা এবং মায়ের মেয়েরা ; পরে বাবা ও বাবার ছেলেরা। তোমরা কি এটি বুঝতে পারবে? আমার কাছে, মায়ের কৃপা, বাবার কৃপার চেয়ে শতসহস্রগুণ অধিকতর মূল্যবান। মায়ের প্রসাদ, মায়ের আশীর্বাদই আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাকে ক্ষমা করো যদি আমি এ বিষয়ে, মায়ের বিষয়ে কিছুটা অন্ধ হই।'

এরূপে, সমগ্র নারীজাতির প্রতিই ছিল তাঁর শ্রদ্ধা অসীম ; এবং প্রত্যেককেই তিনি দর্শন করতেন জগন্মাতার মূর্ত প্রতীকরূপেই। সেজন্যই তিনি সগৌরবে ঘোষণা করেছিলেন : 'অতএব, পরিবারের এই সকল দেবীর উপাসনার জন্য, তাঁদের অন্তঃস্থ ব্রহ্মকে প্রকাশিত করবার জন্য আমি একটি স্ত্রী-মঠ স্থাপন করে যাব।'

বর্তমান অত্যাধুনিকতার যুগে, অবিশ্বাসের যুগে, আত্মম্ভরিতার যুগে, স্বামীজির এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের নারীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করুক ; এবং আমরাও যেন স্বামীজির সঙ্গে সুর মিলিয়ে, স্থির বিশ্বাসভরে বলতে পারি : ধর্ম, এবং একমাত্র ধর্মই ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপ ; এবং যদি তা' চলে যায়, তা'হলে ভারতও প্রাণত্যাগ করবে—অর্থনীতি, সমাজসংস্কার, কুবেরের ঐশ্বর্য, কিছুই আর তাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

পরিশেষে, নারীদের উদ্দেশ্যে স্বামীজির সেই অমৃতময়ী বাণী শ্রদ্ধার

সঙ্গে স্মরণ করে সমাপ্ত করছি : 'আমি পুরুষদের যা বলে থাকি, নারীদেরও ঠিক সেই কথাই বলব' : 'ভারত ও ভারতীয় ধর্মে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন কর ; তেজস্বিনী হও ; আশায় বুক বাঁধ। ভারতে জন্মগ্রহণ করেছ বলে, লজ্জিত না হয়ে গৌরব অনুভব কর। আর, স্মরণে রেখো, আমাদের অন্যান্য জাতির নিকট থেকে কিছু নেবার আছে নিশ্চয়। কিন্তু জগতের সকলের অপেক্ষা আমাদের দেবারও আছে অনেক বেশী।'

নারীজাতি ও বিবেকানন্দ

আশাপূর্ণা দেবী

'—মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে, যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সে দেশ সে জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিনকালে পারিবেও না।' নারীজাতি সম্পর্কে এই সশ্রদ্ধ ও সতেজ উক্তি যুগমানব বিবেকানন্দের।

ভাবপ্রবণতার 'মৌখিক পূজা' বা শুধু নারীকে 'দেব-দেবী' বলেই কর্তব্য সমাধা নয়, জাতীয় জীবনে নারীর যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা রক্ষাকেই তিনি পূজা আখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, যে দেশে মেয়েদের সম্পর্কে সম্যক মর্যাদাবোধ নেই, সেই দেশ যথার্থ বড় বলে গণ্য হতে পারে না।

বিশ্বাস করতেন অথবা গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন বলেই স্বামীজি অবিরত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই দেশের মেয়েদের অবস্থার তুলনা করেছেন এবং দুই দেশেরই সমাজ-ব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনা করে তাদের কোন্‌খানে ত্রুটি, কোন্‌খানে অন্যায়, তা সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সব সমালোচনায় একদেশ-দর্শিতার প্রকাশ নেই। একই প্রবন্ধের মধ্যে দেখা যায় স্বামীজি বলেছেন, 'এখানে বালবিধবার অশ্রুপাতে ধরিত্রী আর্দ্র হয়, পাশ্চাত্ত্য দেশের বায়ু অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘশ্বাসে বিষাক্ত হয়।...পাশ্চাত্ত্যের মেয়েরা কেমন স্বাধীন, সকল কার্য ইহারাই করে। স্কুল, কলেজগুলি মেয়েতে ভরা, আর আমাদের পোড়া দেশে ? মেয়েদের পথে পর্যন্ত চলিবার জো নাই।'...আবার তার সঙ্গে এও বলেছেন, 'পাশ্চাত্ত্যে নারী স্ত্রী-শক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে মাত্র স্ত্রী-শক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ভারতের একটি সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারীশক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত। প্রাচ্য পরিবারে মাতা

কর্ত্রী, স্ত্রী অবহেলিতা, পাশ্চাত্ত্য পরিবারে স্ত্রী কর্ত্রী, জননী উপেক্ষিতা।'

এই যে তুলনা, এর মধ্যেই রয়েছে মেয়েদের প্রতি তাঁর দরদের একান্ত আকুলতা। কোন ব্যবস্থাটিই তাঁর কাছে 'নির্ভুল' বলে মনঃপূত হয়নি। যেন দু'টি ভাবধারার সংস্কার-সাধন ও সামঞ্জস্য-বিধান করে, তিনি এক নতুন জীবনের দরজা খুলে দিতে চান।

কালক্রমে প্রাচ্যের অবস্থার পরিরর্তন ঘটেছে। সেখানে অবরোধের দুঃখ, অধিকারহীনতার গ্লানি, সমাজব্যবস্থার শাসন-পাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে মেয়েরা, কিন্তু এও অস্বীকার করা যায় না, তার সঙ্গে প্রাচীন প্রাচ্যের ভাবধারার সংমিশ্রণ হচ্ছে না। একটা পরানুকরণের ছাঁচ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কে জানে এই ছাঁচটি এদেশের মেয়েদের যথার্থ কল্যাণসাধন করছে কি না।

স্বামীজি এই ছাঁচটি চাননি। তিনি সামঞ্জস্যের মধ্যে কল্যাণ অন্বেষণ করেছিলেন।

কী এদেশ, কী ওদেশ, তাঁর কাছে তারতম্য নেই। তাঁর কাছে মেয়েরা মাত্রেই 'মা জগদম্বার জাত'। তাই পাশ্চাত্ত্য মেয়ের কর্মক্ষমতা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছেন, 'ইহারা সাক্ষাত জগদম্বা। এই রকম মা জগদম্বা যদি আমাদের দেশে এক হাজার তৈয়ার করিয়া মরিতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব।'

মহাপুরুষের সেই ইচ্ছার অঙ্কুর, সময়ের বাতাসে আর প্রয়োজনের জলসিঞ্চনে লক্ষশাখা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। মাত্র 'একটি হাজার' নয়, আজ ভারতের হাজার হাজার মেয়ে শিক্ষায় দীক্ষায় কর্মে উদ্দীপনায়, সর্বোপরি সাহসিকতায়, স্বামীজির ভাষায় 'মা জগদম্বা'র রূপ লাভ করেছেন, আর সন্দেহ নেই কোনও এক উর্ধ্বলোক থেকে তাঁদের মাথার উপর দেবতার প্রসন্ন আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এ যাত্রায় প্রথম যাত্রার সেই 'ইচ্ছার ইতিহাসটি' যেন আমরা না ভুলি। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে

সমগ্র নারীসমাজের যা' ঋণ তা' যেন স্বীকার করতে পারি। উপলব্ধি করতে পারি তিনি মেয়েদের কী মহৎ উপকার সাধন করে গেছেন। আজকের যুগের উচ্চশিক্ষা মেয়েদের জগতিক ও সামাজিক বহুবিধ উন্নতি এনে দিয়েছে। চিত্তের জড়তা ও চিন্তার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়েছে মেয়েরা। আজ গৃহগণ্ডি অতিক্রম করে নিজেদেরকে বৃহৎ বিশ্বের পটভূমিকায় দেখতে শিখেছে। কিন্তু নবলব্ধ এই শিক্ষা আর শক্তি যাতে ভুল পথে পরিচালিত না হয়, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে মেয়েদেরই।

বিশ্বের কর্মযজ্ঞে নারীর ভূমিকা কিছু কম প্রধান হলেও, জীবনযজ্ঞে তার ভূমিকা পুরুষের চেয়ে বেশী বললে হয়তো অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় চরিত্রের নিরিখ কষতে গেলে নারীকেই সে-চরিত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ বলা সঙ্গত। যে দেশে নারীচরিত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়, সে দেশের ক্ষয় অনিবার্য।

হয়তো এই দুর্বলতা সহসা ধরা পড়ে না। পুরানো ব্যবস্থার নৈতিক মানকে 'কুসংস্কার' বলে বোধ হয়, অবনতির লক্ষণগুলিই আধুনিকতা বলে গণ্য হয়, আর সেই অসাবধানতার সুযোগেই জাতির মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরে। এ' যুগে অনেক তথাকথিত সভ্যদেশের মধ্যে দেখা গিয়েছে এই ক্ষয়রোগের বীজ। ভেঙে যাচ্ছে গৃহ, ভেঙে যাচ্ছে প্রেমের বিশ্বস্ততা। মানুষ শান্তিহীনতার এক তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে লোভের পথে, বাসনার পথে, অধিকতর ভোগের পথে বৃথা শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ এই ভোগলিপ্সার উন্মত্ততা আর হতাশার যন্ত্রণা। তিক্ততা আর হতাশা, এ' যুগে টি. বি. ক্যানসারের মতই একটা মারাত্মক ব্যাধি। আজকের কাব্য, আজকের সাহিত্য, আজকের শিল্প এই ব্যাধির যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে। আজকের অন্বেষায় সুন্দরের সাধনা হাস্যকর—অসুন্দরের মধ্যে, বিকৃতির মধ্যে বীভৎসতার মধ্যে এ' যুগের সত্য-অন্বেষণ।

ভারতবর্ষও কি এ' ব্যাধিকে আদর করে নিজের ঘরে ডেকে আনবে? তথাকথিত এই সভ্যতার পরিণাম দেখে সতর্ক হয়ে নিজের ভাঁড়ারের সম্বলটি কাজে লাগিয়ে বেঁচে ওঠবার চেষ্টা করবে না? অপরের গড়া সেই 'ছাঁচে'র হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেবে?

সত্য বটে আধুনিকতার অতি চাকচিক্য আর জড়বিজ্ঞানের সীমাহীন সাফল্য আজ মানুষমাত্রকেই বিভ্রান্ত করে তুলেছে। কিন্তু এই বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার হতে না পারলে 'মানুষ'এর ধ্বংস অনিবার্য, মনীষারও পরিসমাপ্তি। এই উদ্ধার চিন্তায় এগিয়ে আসতে হলে আসতে হবে আগে মেয়েদেরই।

বিদেশ থেকে আমদানি এক যান্ত্রিক সাম্যবাদের ধুয়োকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে না থেকে তাকিয়ে দেখতে হবে ভারতবর্ষের মাটিতেও সাম্যবাদের বনেদ আছে কি না। দীর্ঘ অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে যদি নাও ধরা হয়, বর্তমানই কি নিষ্ফলা? মানুষে মানুষে বিভেদহীন এক অখণ্ড সাম্যের বাণী প্রচার করেননি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী? সুদীর্ঘ কালের ভুল শাস্ত্রব্যাখ্যা আর সমাজপতিদের স্বার্থান্ধ মূঢ়তায়, সমাজের স্তরে স্তরে যে গ্লানি জমে উঠেছিল, তাকে সবলে দূর করতে স্বামীজি এসেছেন এগিয়ে। উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন, 'হে ভারত, ভুলিও না, ভারতবাসী তোমার ভাই।......ভুলিও না, মুচি মেথর চণ্ডাল শূদ্র তোমার রক্ত!'

আজকের দিনে সেই শ্রেণী-কৌলিন্যের দাঁত হয়তো আর তেমন নেই। কিন্তু সেখানে এসে বাসা বেঁধেছে আর এক কৌলিন্য। জাতির মর্মের মধ্যে মনুষ্যত্বের চেতনা না এলে, শুভবোধের সৃষ্টি না হলে কেবলমাত্র যান্ত্রিক নিয়মের সাম্যবাদ কি সে সমস্যা দূর করে স্থায়ী কল্যাণ এনে দিতে পারবে?

কিন্তু সেকথা যাক। আমার আলোচনা বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে।

অস্বীকার করা যায় না, অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের অসন্তোষ, মেয়েদের অসহিষ্ণুতা, মেয়েদের বিলাস-বাসনা, পুরুষকে উত্তরোত্তর আকাঙ্ক্ষার পথে ঠেলে নিয়ে যায়। শ্রেয়কে ত্যাগ করে প্রেয়কেই আঁকড়ে ধরে। কেবলমাত্র জড়বস্তুর মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজতে গেলে এমনই হয়। এক্ষেত্রে মেয়েদের কল্যাণবুদ্ধি সজাগ হলে হয়তো দেশের লোভ আর দুর্নীতি কিছু কমতে পারে। কৃত্রিমতা আর পরানুকরণ স্পৃহা কেবল লোভেরই প্রসার ঘটায়।

অবশ্য স্বামীজি কোনদিনই জাতিকে নিছক ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে কেবলমাত্র কৃচ্ছ্রসাধনের পথ দেখিয়ে দেননি। তাঁর 'উন্নতি'র ধারণা ছিল সুস্থ। তাই তাঁর পরিকল্পনা ছিল, ভোগে আনন্দে সৌন্দর্যে বীর্যে পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ এক জাতির। তাঁর মতে তুষ্টির মধ্যে পুষ্টি, শোভার মধ্যেই শুভ, শক্তির মধ্যেই সত্য। কিন্তু প্রতিমার মধ্যেও কাঠামোর মত ভোগের মধ্যেও যেন একটি আদর্শ থাকে। একটি সংযমের রুচি থাকে। সেই আদর্শের জন্য, সেই রুচির জন্য ভারতকে কারো দ্বারস্থ হতে হবে না। সে বস্তু ভারতের ভাঁড়ারে আছে।

একথা ঠিক, নতুন কাল আসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে—নতুন বিচার নিয়ে—নতুন মতবাদ নিয়ে, তবু মানবধর্মের এমন একটি মূলভিত্তি আছে, যেটা সর্বকালের—সর্বদেশের।

দয়া ক্ষমা ত্যাগ সহিষ্ণুতা উদারতা সহমর্মিতা সততা বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মানবধর্মের বৃত্তিগুলি কোনও দেশে, কোনও কালে বা কোনও মতবাদেই অবহেলিত নয়। যে দেশের সমাজব্যবস্থা যেমনই হোক, বা রীতি-নীতি আচার-আচরণ যেমনই অদ্ভুত হোক, সে ব্যবস্থা মানবধর্মের এই মূলভিত্তিগুলির উপরেই গঠিত। বিকৃতি যদি দেখা দেয়, সেটা গঠনের দোষ নয়, পরবর্তীকালের মূর্খতার দোষ।

স্বামীজি সেই মূর্খতাকে দূর করতে হাত বাড়িয়েছিলেন। কল্পনা করেছিলেন সেই মানুষকে, বিশেষ করে সেই মেয়েকে, যে মেয়ে

মানবধর্মের এই মূল গুণগুলির সঙ্গে যুগোপযোগী শিক্ষা, শক্তি, সাহস এবং দৃঢ়তা নিয়ে বৃহৎ বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়াবে। তাই তাঁর ভিতরে দেখা গিয়াছে জীবনজিজ্ঞাসার অত তীব্রতা।

স্বামীজি কল্পনা করেছেন—পশ্চিমের বিজ্ঞান আর প্রাচ্যের ধ্যান, পশ্চিমের কর্মশক্তি আর প্রাচ্যের ধর্মবোধ, এই দুইয়ের একটি সুস্থ মিলন। যেন উভয় ধারার প্রেম-বিবাহ। সেই বিবাহ-জাত সন্তানই হবে ভাবী পৃথিবীর মানুষের মত 'মানুষ'। কিন্তু মানুষগড়ার প্রথম ভিত্তি তো মেয়েদের হাতেই। তাই তিনি যেমন প্রাচ্যের মেয়েকে পাশ্চাত্ত্যের সদ্‌গুণগুলি গ্রহণ করতে বলেছেন, তেমনি পাশ্চাত্ত্যের মেয়েকেও অনুধাবন করতে বলেছেন প্রাচ্যের ভাব, ধারণা ও আদর্শকে। এক কথায় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সংসারী মানুষদের চেয়ে অনেক বেশী করে ভেবেছেন মেয়েদের জন্যে। মেয়েদের সর্ববিধ উন্নতি ব্যতীত যে দেশের উন্নতি অসম্ভব, সেকথা উপলব্ধি করেছেন অন্তর দিয়ে।

মহামানবরা এইভাবেই দেখেন, চিন্তানায়করা এমনি দৃষ্টি দিয়েই চিন্তা করেন, কিন্তু স্বামীজির মত এমন মেয়েদের 'জ্যান্ত জগদম্বা' রূপে দেখতে ক'জন পেরেছেন; ক'জন তাঁর মত বলতে পেরেছেন, 'নারীদিগের সম্পর্কে আমাদের হস্তক্ষেপের অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত।…নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে; তাহাদের হইয়া অপর কাহারও এ' কার্য করিতে যাওয়ার প্রয়োজনও নাই, উচিতও নয়।…নারীদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা বলিবে। তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে?'

মেয়েদের উপর এই আস্থা, এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধা আর কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? এদেশে নারীকে 'দেবী' বলে আসা হয়েছে, নারী 'মাতৃশক্তি বলে স্বীকৃত হয়েছে, তথাপি তাদের জন্য

বিধিনিষেধের আর অন্ত নেই। তাদের প্রতি 'নাবালক তুল্য' মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। 'স্ত্রী শিশু' সমগোত্র। তাদের জন্য যদি কিছু করতেই হয় তো করুণা কর।

'তাহাদের ব্যাপারে তোমরা আবার কে?' এমন উদার বাণী দুর্লভ। নারীর মোহিনীশক্তির পূজক যে দেশগুলি শিভ্যাল্‌রি'-র মাধ্যমে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়, তাদের চিন্তার মধ্যেও এই আস্থা ও বিশ্বাস সচরাচর দেখা যায় না। অনেকের চিন্তায় নারীকে 'ভোগ্য' ভাবা নিন্দ্যনীয়, কিন্তু 'পোষ্য' ভাবা নিন্দ্যনীয় নয়। স্বামীজির মতে সেটাও কিছু মেয়েদের মর্যাদা বৃদ্ধিকর নয়। ওটাও একপ্রকার অপমান।

আজকের মেয়েরা যে ক্রমশঃ আত্ম-মোহিনীমায়া-মুক্ত হয়ে নিজেদেরকে পুরুষের আদরণীয় পোষ্য হিসেবে দেখতে লজ্জা বোধ করছে, 'কটাক্ষ'-এর চেয়ে 'কর্মদক্ষতা'-কেই জয়ের অস্ত্র বলে গণ্য করছে, পুরুষের চোখে আকর্ষণীয়া হওয়ার থেকে 'শ্রদ্ধেয়া' হওয়াকে অনেক বেশী মূল্য দিতে শিখছে, তার মূলে স্বামীজির বাণী, চিন্তা ও চেষ্টার অবদান বড় কম নয়।

হয়তো নারীসমাজের সর্বস্তরের এই ভাবের সঞ্চার হতে এখনো অনেক দেরি আছে, আধুনিকতা'র ভুল ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত অনেক মেয়েই এখনো পুরুষের সঙ্গে সমান বিদ্যা অর্জন করে কর্মক্ষেত্রে নেমেও কর্মদক্ষতার থেকে কটাক্ষতেই অধিক বিশ্বাসী, কাজ করে ওপর-ওয়ালাকে সন্তুষ্ট করার চাইতে সাজ করে মনোরঞ্জন করার দিকেই ঝোঁক প্রবল, তবু মনে হয় হয়তো ভারতের মাটিতে এ ভাব চিরস্থায়ী হতে পারবে না। কোন্‌টি মহৎ, কোন্‌টি শ্রেয়ঃ, কোন্‌টি সুন্দর, কোন্‌টি শোভন, সেটি চিনে নেবার 'বোধ' ভারতের আছে। তাই আশা করা যায় শক্তিরূপা নারীর অভ্যুত্থান ভারতে সুদূর নয়। স্বামীজি যে শক্তিরূপার ভাবসাধক, পরিকল্পনাকার, সেই ভাবটি কোথায় ছিল? কোথায় ছিল তার ভাষা?

দক্ষিণেশ্বর গ্রামে এক পাগলা ঠাকুরের সহধর্মিণী অবগুণ্ঠনের আড়ালে নিজেকে আবৃত করে আপন মহিমাকে রেখেছেন আড়াল করে, দামাল ছেলে খুলে ধরলেন মায়ের সেই অবগুণ্ঠন, সবাইকে ডেকে ডেকে বললেন জ্যান্ত জগদম্বা দেখবি তো আয়, বললেন, 'এই ভাব এই ভাষ্য। মন্ত্র দিলেন এক মহিমময়ী বিদেশিনী ভগিনীকে, দেশকে বললেন, ছ্যাখ, ভাব আর কর্মের মিলন। ছ্যাখ্, শেখ্, হ। শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের নারী জাতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী, 'ছ্যাখ, শেখ, হ'।

অনন্তকাল ধরে জগতে কোটি কোটি মানুষ জন্মাচ্ছে, মরছে তার মধ্যে ক'জনের ভিতর থাকে 'স্মরণীয়' হয়ে থাকবার মত উপাদান ?

বেশী থাকে না। কোটিতে এক। শত সহস্র কোটিতে এক।

স্মরণীয়কে স্মরণ করবার শুভবোধটুকু মানুষের মজ্জাগত। তাই কোনও স্মরণীয় চরিত্রকেই সে সহজে হারায় না। আকাশের নক্ষত্রগুলির মতই তার স্মরণাকাশে জ্বল-জ্বল করে স্মরণাতীতকালের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি। কত সহস্র বৎসরের ঝড়ঝাপটা সয়েও সেগুলি অক্ষয় হয়ে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা-সাহিত্য

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রতিভাবান তরুণ যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় না হইত এবং তিনি যদি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিয়া নবজন্ম লাভ না করিতেন, তাহা হইলে আমরা ব্রহ্মতেজে দীপ্ত, ক্ষাত্রশক্তিধর দিগ্বিজয়ী বীরসন্ন্যাসীকে পাইতাম না, কিন্তু হয়তো তিনি নব নব ঐশ্বর্যে বঙ্গবাণীকে অধিকতর সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, এক দিকে সাহিত্য ও অপর দিকে চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ললিতকলার প্রতি অনুরাগ নরেন্দ্রনাথ দত্তের পক্ষে ছিল স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার বাংলা রচনাবলী আয়তনে অল্প হইলেও উহার মধ্য দিয়াই তাঁহার শব্দ-চয়ন-কৌশল ও প্রকাশভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। স্বামীজির পক্ষে সাহিত্যসাধনা শুধু কল্পনাবিলাস ছিল না, তিনি স্বয়ংও হয়তো কলাকৈবল্যবাদে (Art for art's sake) বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁহার রচনাবলীর উৎস ছিল স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি-হিতৈষণা। তাঁহার কর্মবহুল স্বল্পপরিসর জীবনে সচেতনভাবে শিল্পসৃষ্টির অবকাশ ঘটে নাই, তথাপি তাঁহার বাংলা রচনাবলীতে—তাঁহার 'বর্তমান ভারত,' পরিব্রাজক,' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' ও 'ভাববার কথা'য়, এমন কি, কবিতা ও পত্রাবলীতে তাঁহার মহিমময় ব্যক্তিত্বের ছাপটি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ' অনলস, অতন্দ্রিত ভাবে কর্মের সাধনা করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত এবং তাঁহার সাহিত্যসাধনাও ছিল সেই কর্মসাধনারই অন্তর্গত। তিনি যখন বাংলা ভাষায় নিবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভা বঙ্গবাণীকে নব-নব ঐশ্বর্যে মহিমময়ী করিয়া তুলিয়াছে, বাংলার কাব্য-

সাহিত্যকুঞ্জ হইতে যুগস্রষ্টা মধুসূদনের তিরোভাব ঘটিয়াছে এবং বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় হেম-নবীনের কবিতায় তাঁহাদের নবজাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়া এই কবি-যুগলকে হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ গদ্যরচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের পথ-চিহ্ন অনুসরণ করেন নাই, তিনি সর্বত্রই বাগ্‌ভঙ্গি ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে—স্টাইল ও ডিক্‌শনে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

স্বামীজিই সর্বপ্রথম কথ্যভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয়ে প্রবন্ধ-রচনার পথ-প্রদর্শক। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন', ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' ও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশিত হয় সত্য, কিন্তু বিচ্ছিন্ন কথোপকথন এবং উপন্যাস বা নক্সাজাতীয় রচনা ভিন্ন নানারূপ তথ্য বা তত্ত্বমূলক রচনায়ও যে চলিত ভাষায় ব্যবহার করা যাইতে পারে, স্বামীজির 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে' ও 'ভাববার কথা'র অংশবিশেষে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা, মনীষী প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র'ই চলিত ভাষায় প্রবন্ধরচনার পথপ্রদর্শক, কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য, বীরবলী রচনা-রীতি ছিল স্বামীজির রচনারীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। স্বামীজি এক দিকে যেমন কথ্যভাষায় তথ্যমূলক বা তত্ত্বমূলক নিবন্ধ-রচনার পথপ্রদর্শক, অপর দিকে তেমনই স্বল্লাক্ষরে গ্রথিত অনাবশ্যক-শব্দবর্জিত গাঢ়বদ্ধ রচনারও প্রবর্তক। প্রথম শ্রেণীর রচনার নিদর্শন 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি গ্রন্থ, দ্বিতীয় শ্রেণীর নিদর্শন 'বর্তমান ভারত'।

বাংলার কথ্যভাষায় যে অফুরন্ত শব্দসম্পদ রহিয়াছে, উহাদের ভাব-প্রকাশের শক্তি সম্পর্কে স্বামীজি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায়

ক্রোধ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর – আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃতের গদাই-লস্করী চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।' [১৯০০ খৃষ্টাব্দে 'উদ্বোধন' পত্রের সম্পাদককে লিখিত।]

'পরিব্রাজকে' স্বামীজি বাংলা ভাষায় বহু চলিত বুলি ও প্রবচন প্রভৃতির ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—হালে পানি পাওয়া, কিস্তি বানচাল, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, গাঁয়ে মানে না আপনি মড়ল, ওছলপাছল, টালমাটাল, গদাইলস্করী চাল প্রভৃতি।

স্বামীজি চলিত ভাষার স্থানে স্থানে দীর্ঘসীমাবদ্ধ পদের ব্যবহার করিয়া উহাকে ওজস্বিনী ও প্রাণাবেগে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন। 'পরিব্রাজকে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশের মধ্য দিয়া আমরা যেন স্বামীজির উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি—

'আর্যবাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর আর যতই কেন তোমরা ডম্ম্ম্ বলে ডম্ফই কর, তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি !! যাদের চলমান শ্মশান বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতের যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর চলমান শ্মশান হচ্ছ তোমরা।···এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল, লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতে তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি

করচ কেন ? ভূত-ভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কাল-কুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না ?···তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে,—তাই পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারে ; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরে না, এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম !! অতীতের কঙ্কালচয়, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি, ফেলে দাও, এদের মধ্যে যত শীঘ্র পার ফেলে দাও ; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো ; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটিজীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি, ওয়াহ্ গুরু কি ফতে !'

স্বামীজির রচনা অনেক স্থলে হাস্যরসের দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজীতে যে জাতীয় ব্যঙ্গরচনাকে স্যাটায়ার বলে, সেই ধরনের রচনার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় 'ভাববার কথা'য়। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে লোকাচার ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে, আমরা শাস্ত্রের নির্দেশ বা অনুশাসন মানিয়া চলি না, কিন্তু লোকাচারের মর্যাদা রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট। স্বামীজি আমাদের

এই প্রবৃত্তিকে তীব্র কশাঘাত করিয়া আমাদের সুবুদ্ধির উদ্রেক করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

'সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সেই মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত? আর সেথা নাই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সুয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুঁচদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি নাই কি? আর বেদবেদান্ত দর্শন পুরাণ তন্ত্রে ঢের মাল আছে, যার এক একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়। আর লোকেরই বা ভিড় কি, তেত্রিশ কোটি লোক সে দিকে দৌড়েছে। আমারও কৌতূহল হোল, আমিও ছুটলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি, এ কি কাণ্ড! মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্ছে না, দোরের পাশে একটা পঞ্চাশ মুণ্ডু, এক শত হাত, দু-শ পেট, পাঁচ-শ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি খাড়া, সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম, যে, ওই ভেতরে যে-সকল ঠাকুরদেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুঁড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এর করা চাই—যিনি দ্বারদেশে, ঐ যে বেদবেদান্ত, দর্শন পুরাণ শাস্ত্র সকল দেখচ, ও মধ্যে মধ্যে শুনলে হানি নাই, কিন্তু পালতে হবে এর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তবে এ দেবদেবের নাম কি? উত্তর এলো—এঁর নাম লোকাচার।'

স্বামীজির 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' পরিব্রাজকে'র মতই চলিত ভাষায় লিখিত কিন্তু এই গ্রন্থের গোড়ার দিকে—যেখানে স্বামীজি ভারতের বাহ্যছবি অঙ্কিত করিয়াছেন বা প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যের এবং পাশ্চাত্ত্য সম্পর্কে প্রাচ্যের মনোভাবের কথা বলিতেছেন সেখানে—রচনারীতি 'বর্তমান ভারতে'র রচনারীতিরই অনুরূপ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই অংশে স্বামীজি 'গৌড়ীয় রীতি'র অনুসরণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সর্বত্রই স্বামীজির নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, বিশ্লেষণশক্তি ও মোহমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচয়

রহিয়াছে। প্রাচ্য বা প্রতীচ্য যেখানেই তিনি কোনও অকল্যাণের আদর্শ দেখিয়াছেন, সেখানেই তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব সৃষ্টি। ইহাতে এক দিকে যেমন স্বামীজির অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব বিশ্লেষণশক্তি ও দিব্য দৃষ্টির পরিচয় আছে, অপর দিকে তেমনি এক বিশিষ্ট রচনারীতির নিদর্শন আছে। বাংলা ভাষায় যথাসম্ভব অনাবশ্যক শব্দ বর্জন করিয়া কত স্বল্প কথায় বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করা যায়, স্বামীজি বর্তমান ভারতে তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে কোন প্রাক্তন মনীষীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই; নূতন পথে বিচরণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অবশ্য, এরূপ স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত গাঢ়বদ্ধ রচনা অনভ্যস্ত পাঠকের নিকট কিছু কঠিন বা দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে, তথাপি ইহা যে কাব্যগুণবর্জিত নয়, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি ভারবি অর্থ-গৌরবের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যকে নারিকেল ফলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। (নারিকেলফলসম্মিতং ভারবের্বচঃ।) নারিকেলের কাঠিন্যই উহার যথার্থ পরিচয় নয়, সেই কাঠিন্যের আবরণ ভেদ করিতে পারিলে যেমন স্নিগ্ধ পানীয় ও স্বাদু অথচ বলপ্রদ শস্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনই ভারবির কাব্যে দুর্বোধ্য ভাষায় আবরণ ভেদ করিতে পারিলে রসবস্তুর সন্ধান মিলে। 'বর্তমান ভারতে'র ভাষা সম্পর্কেও অনেকটা এই ধরনের মন্তব্য করা চলে।

'বর্তমান ভারতে'র প্রতিপাদ্য বিষয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ যথাক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। নানা দেশের ইতিবৃত্তের আলোচনা করিয়া স্বামীজি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও যথাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশ্যশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, বৈদিক ঋষির আধিপত্যলোপের পরে এ দেশে ক্ষাত্রশক্তির অভ্যুত্থান। এই ক্ষাত্রশক্তির আবির্ভাব সম্পর্কে

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, রাজশক্তিরূপ মহাবল যজ্ঞাশ্ব আর পুরোহিত-হস্ত-ধৃত-দৃঢ়-সংযত-রশ্মি নহে; সে এবার আপন বলে স্বচ্ছন্দচারী। এ যুগের শক্তিকেন্দ্র সামগয়ী, যজুর্যাজী পুরোহিতে নাই, রাজশক্তিও ভারতের বিকীর্ণ ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীপতিতে সমাহিত নহে; এ যুগের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী, অপ্রতিহত-শাসন আসমুদ্রক্ষিতীশগণই মানবশক্তিকেন্দ্র। এ যুগের নেতা আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ নহেন, কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মাশোক প্রভৃতি।'

'বর্তমান ভারতে'র ভাষা সম্পর্কে দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য, প্রথম—সমাসবদ্ধ পদের ভূরি-প্রয়োগ, দ্বিতীয়ত—যথাসম্ভব ক্রিয়াপদের বিলোপ। যেখানে স্বল্পকথায় অথচ অসন্দিগ্ধ ভাষায় অনেকটা সূত্রাকারে, বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে হয়, সেখানে সমাসের আশ্রয় গ্রহণ এবং অনাবশ্যক শব্দের বর্জন করিতেই হইবে। সকল দেশের মানুষই মনে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কোথাও পদ্য বা কবিতা, কোথাও বা গদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সূত্রাকারেও যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করা যায়, ইহা শুধু ভারতবাসীরাই জানিতেন। তাই আমাদের দেশে শুধু ব্যাকরণ নহে, ষড়্‌দর্শনও সূত্রাকারে গ্রথিত। কিন্তু দেবভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় সূত্ররচনা করা হয়তো সম্ভবপর নহে, সুতরাং সে প্রয়াস না করিয়া স্বামীজি কতকটা সূত্রলক্ষণাক্রান্ত ভাষায় প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভারতে বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থান সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন—

যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্ত মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের ন্যায় তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্য দেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাটকুলও কম্পমান, সংসার সমুদ্রের সর্বজয়ী এই

বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানস্বরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।'

অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারত-জয়ও নহে। পাঠান মোগলাদি সম্রাট্‌গণের ভারত-বিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিণীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তূরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর, এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিম্‌নি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্য বীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।'

এখানে স্বামীজি শুধু সযত্নে শব্দের মাল্য গ্রথিত করেন নাই, ভাষার মধ্যে একটা দুর্গম গতিবেগের সঞ্চার করিয়াছেন। স্বামীজির মধ্যে যে একটা বজ্রবিদ্যুন্ময় পুরুষসত্তা ছিল, ভাষা যেন এখানে তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। কিন্তু এই পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে তিনি প্রতীচ্য শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত বাঙালীর জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের সংঘর্ষের কথা বলিয়াছেন। এই বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, সেই দিগ্বিজয়ী বীর সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠের উদাত্ত ধ্বনি যেন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে :— 'একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি সংগ্রহরূপ প্রমাণ বাহন শত সূর্যজ্যোতিঃ, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা, অপর দিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষী উদ্ঘাটিত যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহা কোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপর দিকে এই মহা কোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে, পূর্বপুরুষদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ

করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী, নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গি, অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কষায়, কৌপীন, সমাধি আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপর দিকে আর্য সমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্ত্য উদ্দেশ্যে—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।'

স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর আলোচনা করিতে গেলে তাঁহার রচিত কবিতার কথাও উল্লেখ করিতে হয়। স্বামীজির রচিত সংস্কৃত বাংলাও ইংরেজী কবিতাবলী 'বীরবাণী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং সেগুলি সকলেরই বিশেষ পরিচিত। তাঁহার ইংরেজী কবিতার মধ্যে 'Song of the Sanyasin' (ও উহার অনুবাদ) এবং 'Kali the Mother' (ও উহার অনুবাদ 'মৃত্যুরূপা মাতা', কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই কবিতাটির অনুবাদ করেন) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু স্বামীজির বাংলা কবিতাই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য। তাঁহার রচিত 'সৃষ্টি', 'প্রলয় বা গভীর সমাধি' এবং 'গাই গীত শুনাতে তোমায়'—এই তিনটি কবিতাই কাব্য রসের চেয়ে তত্ত্ববস্তুই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, স্বামীজির সাধনালব্ধ অনুভূতিই এই তিনটি কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার দুইটি কবিতা কাব্যগুণে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—'সখার প্রতি' ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'। 'সখার প্রতি' কবিতাটিকে এক হিসাবে স্বামীজির আত্মচরিত বা 'জীবন-দর্শন' বলা চলে। এই কবিতায় যে দুঃখের সুর ধ্বনিত হইতেছে, উহা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বা কবির

দুঃখবাদ নহে, উহার মূলে রহিয়াছে ভারতীয় জীবনদৃষ্টি। স্বামীজি বলিতেছেন—

'বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুঃক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বত-গহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কি ধন করিনু উপার্জন ?

ইহা স্বামীজির আত্ম-বিশ্লেষণ। আর এই আত্ম-বিশ্লেষণের ফলেই তিনি বুঝিতে পারিলেন—

'ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ যে জন,
মৃত্যু মাগে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।'

তবে নিষ্ক্রিয়তাই কি মানব-জীবনের পরম পুরুষার্থ ? তাহাও নহে। পরার্থে আত্মত্যাগ, জীবে প্রেম—ইহাই মানব-জীবনের লক্ষ্য, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য আর কিছু হইতে পারে না। স্বামীজি বলেন—

'ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল,
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম,—অগ্নিশিক্ষা করি আলিঙ্গন।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয় ;
হে প্রেমিকা, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।'

'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় স্বামীজির জীবন-দর্শন অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কবিতাটিতে ললিত-মধুর ও রূঢ়-কঠোর ভাবরাশি পাশাপাশি স্থাপিত হইয়াছে। বাঙালী শুধু 'গোপবেশ, বেণকর, নবকিশোর নটবরের'ই উপাসনা করে নাই ; সে মৃত্যুরূপা কালীরও আরাধনা করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী দীর্ঘকাল ললিত-মধুর ভাবের অতিমাত্রায় অনুশীলন করিয়া সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট

হইয়াছে, সে যথার্থই ক্লৈব্যকে আশ্রয় করিয়াছে। তাই স্বামীজি বলেন—

'রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণ ধার, রুধির উদগার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী॥
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী।'

যথার্থ শক্তিসাধনার আদর্শ হইতে আজ আমরা ভ্রষ্ট, তাই আমরা দুঃখদৈন্যে সহজে বিচলিত হই, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আমাদের অভিভূত করে, বাধা বিঘ্ন আমাদের চলার পথকে রুদ্ধ করে। স্বামীজি আমাদিগকে বীর্যের সাধনায়, মনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন—

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোনার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা॥
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মাদ, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'

স্বামীজির গদ্য-রচনার মত কবিতারও স্থানে স্থানে স্বল্পাক্ষরে গ্রথিত বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—

'পুত্রতরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হবে, প্রেমের প্রেরণ!!'

ইহার তাৎপর্য এই, পুত্রের প্রতি স্নেহবশত মাতা অবলীলাক্রমে প্রাণ বিসর্জন দেয়, আবার মাতা-পিতা বা স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি ভালবাসা আছে বলিয়াই দস্যু পরস্ব অপহরণ করে। এরূপ স্থলে বাক্য স্বভাবতই পাঠকের পক্ষে একটু দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ প্রকাশভঙ্গি সমালোচকের দৃষ্টিতে সর্বত্রই দোষ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কখনও কখনও ইহা কাব্যগুণ বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশের জন্য স্বামীজিকে কখনও কখনও এমন দুই একটি বিশেষণ পদের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, যাহার অর্থ স্পষ্ট হয় নাই। এই জন্য 'বীরবাণী'র পাদটিকায় সেই সমস্ত পদের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যেমন—প্রাণসাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, (ক্রন্দনই যাহার অস্তিত্বের সাক্ষী বা প্রমাণ), স্বরময় পতত্রিনিচয় (পক্ষিসমূহ যেন কাকলীর সমষ্টি, তুলনীয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ—

O Cukoo ! Shall I call thee bird
Or but a wandering voice ?)

এরূপ শব্দপ্রয়োগে যে মুন্সীয়ানা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

স্বামীজির বাংলা রচনাবলী পাঠ করিলে স্বভাবতই মনে হয়, তাঁহার মধ্যে যতখানি সম্ভাবনা ছিল ততখানি সার্থকতা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক তাঁহার রচনার অনেক দোষত্রুটিও আবিষ্কার করিতে পারেন। তথাপি এ কথা সত্য যে, তিনি যথার্থ সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এবং তাঁহার বিচিত্র দানে বঙ্গবাণীকে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে আজও তাঁহার সাহিত্যকৃতি উপযুক্ত মর্যাদা বা স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই।

কবি বিবেকানন্দ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জগৎ ও জীবনের উপলব্ধিকে ভাষায় রূপ দেন যিনি, তিনিই কবি। যে বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যকর্মকে কবিতা বলি আমরা তা হ'ল কবিমনের বহ্য অভিব্যক্তি। চলতি দুনিয়ায় কবি-প্রতিভার বিচার অবশ্য হয় সেই রচনা ধরেই। কিন্তু প্রকৃত কবিতার বিচার নির্ভর করে কবির মানসিকতার ওপর, যা মুখর হ'লে ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই।

অর্থাৎ সেই পুরানো কথা : কবি নীরবও হ'তে পারেন, হ'তে পারেন অলেখকও।

এই মনোগত বৈশিষ্ট্য বিচার করেই কবি বলা যাবে স্বামী বিবেকানন্দকে। এমন কি, তাঁর সমকালীন কবি-নামধেয় অনেক সুবিদিত মানুষের চেয়ে বড় কবিও বলা যায় তাঁকে। তাঁর হৃদয়ে নিত্য নূতন ভাবের আবেগ। জগৎ-রহস্য ও জীবন-রহস্যের বিচিত্র দিক উদ্বেলিত আলোড়িত হয়েছে সেই তরঙ্গে। সে আবেগ নিজেই নিজের ভাষা তৈরি ক'রে প্রকাশমান হয়েছে, যা কখনো খাঁটি কবিতার মূর্তি ধরেছে, কখনো ধরেছে নিবন্ধ, বক্তৃতা বা চিঠির।

এই সব রকম অভিব্যক্তিকেই তাঁর কবিতা বলছি আমি, কারণ যুক্তিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব-তথ্যের উপকরণ যাই থাক তাতে, তার আদি প্রেরণা হ'ল ভাবাবেগ ও রসাবেশ, যা প্রকৃত কবিতার প্রাণবস্তু ব'লে স্বীকৃত।

একজন ফরাসী সমালোচক বলেছেন : কবিতার জন্মস্থান হ'ল হৃদয়, বিজ্ঞানের জন্মস্থান মস্তিষ্ক। আর কতকটা হৃদয় ও কতকটা মস্তিষ্ককে একসঙ্গে স্পর্শ ক'রে থাকে দর্শন ; বলা যেতে পারে তা উভয়ের সন্তান।

কথাটার নিঃসংশয় সৌন্দর্য লক্ষ্য করার মতো। কবিতা থেকে দর্শন-বিজ্ঞানের দূরত্ব যে বেশী নয়, আর এরা যে একে অন্যের সঙ্গে শুরু থেকেই একসূত্রে গাঁথা, এ-কথা স্বীকৃত হয়েছে উক্তিটির মধ্যে।

বিবেকানন্দের কবি-হৃদয় বুঝতে এই অভিমতটিকেই কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নিতে হবে। তীব্র হৃদয়ানুভূতি থেকে উৎসারিত হয়েই তাঁর বেশির ভাগ রচনা চলে গেছে হয় কোন তত্ত্ববিচারে, নয় কোন তথ্য-নিরূপণে এবং কল্পনায় আবেগে বিচারে ব্যাখ্যানে একাকার হয়েই তা গড়ে উঠেছে এক একটা আশ্চর্য সৃষ্টিরূপে। ব্যাপক বা সর্বাত্মক অর্থে নিলে এর সবগুলোকেই কবিতা বলা যাবে।

প্রাচীন আলঙ্কারিক মতেও কবিতা বলতে বোঝাত 'any impression of the soul of a noble and lofty character clothed in equally noble expression, is poetry proper.' —বলেছেন সিসেরো, অর্থাৎ মানবাত্মার যে-কোন মহৎ ও উচ্চ অনুভবের সমপরিমাণ মহৎভাষার মূর্তি পরিগ্রহ করাই হ'ল খাঁটি কবিতার কুললক্ষণ।

এই অর্থে ষড়্‌দর্শন, গীতা এবং উপনিষদ্‌ কবিতা। বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধাবলী, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক এবং শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস কবিতা। বিবেকানন্দের রচনাও কবিতা, এবং মহৎ কবিতা।

আমি জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, শিকাগো বক্তৃতা, প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্ত্য, পত্রাবলী···সমস্ত রচনার কথাই বলছি।

দৃশ্যতঃ এর কোনটা ধর্মতত্ত্ব, কোনটা দর্শন, কোনটা ইতিহাস, কিন্তু প্রাণতঃ কবিতা ; এবং ছন্দোবদ্ধ যে রচনাগুলি তাঁর কবিতার নিদর্শন হিসাবে 'বীরবাণী' নামক সংগ্রহে গ্রথিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী গম্ভীর ও দূরান্তগামী কবিতাই পাওয়া যাবে তাঁর পূর্বোক্ত রচনাগুলির মধ্যে।

কোথাও তার অদ্ভুত আত্মনিবিষ্ট ভাবমগ্নতার রূপ, কোথাও জাগতিক পর্যবেক্ষণের উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চিত্র, কোথাও রসার্দ্র জীবন-চিন্তার মনোরম আলেখ্য। অথচ তারই মধ্যে বিধৃত আছে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং আরও কত কি!

সত্যকার সার্থক কবিতা একেই বলে। আমাদের ভাষায় বঙ্কিম, রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের মতো ইংরেজীতে কার্লাইল, রাস্কিন এবং এমার্সনও এই অর্থেই মহৎ কবি। মহৎ কবি তলস্তয়, গর্কি, রলঁ্যা, রাসেল, মমসেন, কেসিঁও। সবাই এঁরা দ্রষ্টা; আর দ্রষ্টা বলেই শক্তিধর স্রষ্টাও।

কিন্তু বিবেকানন্দ-রচনার এই বৃহৎ তাৎপর্য আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত হয়নি, তার কারণ এদেশে তাঁকে প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ ধর্মাচার্যরূপে প্রচার করা হয় এবং ধর্মাশ্রমের মধ্যে তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয় ব'লে।

ধর্মাচার্যরূপে তাঁর পরিচয় গৌণ নয়, কিন্তু ধর্মসংস্কার-বিমুক্ত নির্মল প্রজ্ঞার নিরিখে বিচার করেও বিবেকানন্দ-রচনার একটি উঁচু সার্থকতা পাওয়া যায়, যা সাহিত্যের বস্তু।

অর্থাৎ বিশুদ্ধ সাহিত্যের মাপকাঠিতেই বিবেকানন্দ-রচনার মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন এবং বলতে বাধা নেই, তাতেও স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার জন্যে কোন গৌণ আসন চিহ্নিত হবে না।

সেই মূল্যায়নের নির্দেশিকা হিসাবেই সংক্ষিপ্ত একটি কাঠামো এই প্রবন্ধে ধরে দিতে চেষ্টা করেছি।

'বীরবাণী' বইটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এতে বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃতে লেখা বিবেকানন্দের ছন্দোবদ্ধ কবিতা এবং গান সংগৃহীত হয়েছে।

এর মধ্যে 'সখার প্রতি' কবিতাটি, যাতে 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার' পঙ্‌ক্তি রয়েছে, সারা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'খণ্ডনভববন্ধন' আরাত্রিক গানটি এবং 'সাগর-বক্ষে' কবিতা, যাতে 'নীলাকাশে ভাসে

মেঘফুল' পঙ্‌ক্তিটি আছে, সুরচনার নিদর্শনরূপে প্রশংসা দাবি করতে পারে। 'The Song of the Sannyasin' নামক দীর্ঘ ইংরাজী কবিতাটি এবং 'The Cup' নামক ছোট্ট কবিতাটিও সুন্দর।

ইংরাজীতে কবিতা-লেখক বাঙালীদের মধ্যে কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, তরু দত্ত ও সরোজিনী নাইডুর মতো যাঁরা কবি, তাঁদের কথা বাদ দিলে, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হরিনাথ দে, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখের সঙ্গে বিবেকানন্দকেও অবশ্যই যুক্ত করতে হয়।

অবশ্য যা আকারে কবিতা, এমন রচনায় বিবেকানন্দ হয়তো খুব অসামান্যতা দেখাননি, কারণ যে নিবিষ্ট অনুশীলনে তা সম্ভব, তার সুযোগ হয়নি তাঁর কর্মময় জীবনে। কিন্তু প্রকারে যা কাব্যধর্মী এবং মহৎ কবিতার স্বাক্ষর যাতে সুস্পষ্ট, এমন সৃষ্টি জন্মেছে তাঁর থেকে প্রচুর। সে হ'ল তাঁর গদ্যরচনাবলী।

এখানে ব'লে রাখা দরকার যে, গদ্যগ্রন্থাবলী তাঁর মূলতঃ সবই ইংরেজীতে। বাংলায় 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক,' 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য' এমনি কয়েকখানি নাতিবৃহৎ বই আছে মাত্র, যা তিনি খুব বেশী যত্ন ও অভিনিবেশ নিয়ে লেখেননি; বরং এগুলির তুলনায় 'পত্রাবলী'তে তাঁর আত্মপ্রকাশ অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ।

কিন্তু ইংরেজীতেই হোক আর বাংলাতেই হোক, গদ্যরচনা তাঁর বরাবরই বলিষ্ঠ প্রাণধর্মমৃদ্ধ ও কাব্যগুণান্বিত। বাংলায় তিনি আর একটা জিনিস করেছেন। বরাবর তিনি চারু কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন রচনার মাধ্যম হিসাবে এবং তা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরী এই ভাষা-ভঙ্গিকে ভারী রচনায় নিয়োগ করার আগেই।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থে বিদেশের বিজ্ঞান-পরিষদে বাঙালী বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্ব দেখানো নিয়ে যেখানে তিনি উল্লাস প্রকাশ করছেন, কিংবা যেখানে সুয়েজখালের উন্মোচন কিভাবে প্রাচ্য

দুনিয়াকে প্রতীচ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে তার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করছেন, কিংবা যেখানে গ্রীকো-রোমক সভ্যতার ভগ্নস্তূপের ওপর গড়ে-ওঠা খ্রীষ্টীয় সভ্যতার সঙ্গে নবজাগ্রত মোসলেম সভ্যতার সঙ্ঘাত বর্ণনা ক'রে রেনেশাঁসের পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে তাঁর কলমের ধার নিশ্চয় শিল্পসচেতন পাঠকের নজর এড়াবে না।

'পত্রাবলী'তেও সেগুলি মূল বাংলায় লেখা, তাতে ছত্রে ছত্রে এই ধার লক্ষণীয়। আরও একটা লক্ষণীয় জিনিস আছে পত্রাবলী'তে, সে হ'ল খাঁটি দেশজ শব্দ, প্রবাদ, প্রবচন ও গালি, যা তিনি নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করেছেন সন্ন্যাসী হয়েও এবং ধর্মসঙ্ঘের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত থেকেও। কিন্তু আমার আলোচনার ওপর এখানেই বোধহয় ছেদ টানা প্রয়োজন, কারণ কবিদের স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণধর্ম রচনা-রীতির প্রাথমিক আলোচনার বেশী আর কিছুই করতে চাইনি। করার সুযোগও আপাততঃ নেই।

সবশেষে বরং তাঁর বিখ্যাত ইংরেজী কবিতা 'The Cup'-এর একটি বঙ্গানুবাদ উপহার দিয়েই এই নিবন্ধের উপসংহার করি :

পেয়ালা

এ পেয়ালা তোমারি তো···তোমারি জন্যে নির্ধারিত
একেবারে আদি হ'তে। আমি জানি হে বৎস সুপ্রিয়,
কতটুকু এর গর্ভে সুরক্ষিত ধূসর পানীয়
তোমার বিচ্যুতি আর পাপোদ্ভূত। সুদূরে অতীত
বহু বর্ষ পার ক'রে রয়েছে যা এখনো সক্রিয়।

এ পথ তোমার জন্যে···দুঃখদীর্ণ রুক্ষ ছায়াহীন,
প্রস্তর-আকীর্ণ রূঢ়, দেয় না যা একটু বিশ্রাম,
তোমার বন্ধুকে আমি মুক্ত দীপ্ত সরণি দিলাম,
সে এসে আশ্রয়ও পাবে এই বুকে শীঘ্র কোনদিন।
তুমি শুধু পাড়ি দেবে পথ বৎস ফেলে তপ্ত ঘাম।

এ কাজ তোমারি জন্যে···নেই এতে তৃপ্তি প্রতিদিন,
তবু এ তোমারি কাজ, আর কারো নয় করণীয়,
আমার এ সৃষ্টি লোকে সুনির্দিষ্ট রয়েছে যে স্থান,
নাও তা। আমার আজ্ঞা বিনা-তর্কে জেনো পালনীয়,
দু' চোখ মুদিত করো তবে মুখ হবে দৃশ্যমান।

নানাদিক দিয়া উনবিংশ শতাব্দী এক গৌরবময় নব জাগরণের যুগ। এই নব জাগরণের স্বরূপ-লক্ষণ সে যুগের সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যেও প্রতিফলিত। এ যুগে জাতির আত্মবিস্মৃতি অপসারিত হইয়া এক নবতর চেতনা শুরু হয় বাঙালীর ধর্মে ও মানস জীবনে, নানা দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্যের মাধ্যমে। বাংলার পত্র-সাহিত্যও এ যুগেই একটি পরিণতরূপ লাভ করে। অবশ্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে পত্র-চর্চার রীতি প্রচলিত ছিল, বররুচির 'পত্র কৌমুদী'-ই তাহার প্রমাণ। সাহিত্যের গবেষকগণ গদ্য সাহিত্যের উৎস সন্ধানে যাত্রা করিয়া আবিষ্কার করেন যে, ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আহোমরাজ চুকাম্ ফা স্বর্গদেবকে লিখিত প্রথম পত্রখানিই বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম পত্র-চর্চার নিদর্শন। পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে সমস্ত মনীষীদের পত্র-চর্চা পত্র-সাহিত্যের ক্ষেত্র সমৃদ্ধতর করিয়াছে স্বামী বিবেকানন্দও তাহাদের অন্যতম। তাঁহার পত্রাবলীও উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এক নবতর অধ্যায় রচনা করিয়াছে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় তাঁহার লিখিত পত্রের সংখ্যা ৫৫২ খানি। অবশ্য তাঁহার লিখিত পত্রাবলী ইংরাজীতেই অধিক। কিন্তু বাংলাতেও সাধু ও কথ্য ভাষায় লিখিত পত্রগুলির গদ্যভঙ্গি অপূর্ব। তাঁহার প্রতিটি পত্রে আত্মপ্রত্যয়ের সুর সুস্পষ্ট। সে ভাষা অনন্যসাধারণ, সে শুধু স্বামীজির ব্যক্তিত্বেরই বাহন। স্বামীজির এই পত্রগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমত আমেরিকা যাত্রার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্রাজক দেশে পরিভ্রমণ অবস্থায় লিখিত পত্রগুলি [১৮৮৬-৯৩] জুলাই।

এগুলির কয়েকখানি বাদ দিলে অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণের পরম হিতৈষী সুহৃদ্ কাশীর বিদগ্ধ জমিদার শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, সমসাময়িক সমাজ ও জাতির পরিচয়, সংস্কৃতির রূপ ইত্যাদি এই পত্রগুলির মুখ্য বিষয়বস্তু। এ-ধরনের রচনা-রীতির ভাষার সৌন্দর্য বাদ দিলেও একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে, যাহা সমসাময়িক সমাজ ও ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য। আমেরিকা যাত্রার পথে ৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই, ইয়োকোহামার ওরিয়েন্টাল হোটেল হইতে তাঁহার মান্দ্রাজী বন্ধুবর্গকে লিখিত পত্রখানিই ইহার বিশেষ সাক্ষ্যবহ। পত্রখানিতে পিনাঙ, সিঙ্গাপুর, হংকং, নাগাসাকি, কোবি ও জাপানের অধিবাসী, তাহাদের ধর্ম, সমাজ, শিল্প ও প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি নিখুঁত চিত্রের তথ্যপূর্ণ বর্ণনা পাই আর সেই সঙ্গে পাই একজন স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর পৌরুষদৃপ্ত আহ্বান, দেশের জন্য, জাতির জন্য ও জন্মভূমির জন্য। তিনি লিখিতেছেন : 'এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর ক'রে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন শুধরোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনও প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।...এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মান্দ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন

হবে, তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে ?'

পরবর্তীকালে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট আমেরিকায় পৌঁছিয়াই ব্রিজি মেডোজ, মেটকাভ, মাসাচুসেটস্ হইতে আলাসিঙ্গাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহাতে পরিস্ফুট তাঁহার তৎকালীন দোলাচল মানসিক বৃত্তির একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। তিনি লিখিতেছেন: 'এখানে আমার ভয়ানক খরচ হইতেছে। তোমার স্মরণ আছে আমায় ১৭০ পাউণ্ড নোট ও নগদ ৯ পাউণ্ড দিয়াছিলে। এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউণ্ড। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। ...এক্ষণে অসম্ভবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছে, এদেশ হইতে চলিয়া যাই। ......আমি এক্ষণে বস্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেলগাড়িতে হঠাৎ আলাপ হয়। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন !! এসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, অদ্ভুত পোশাকের দরুন রাস্তার লোকের বিদ্রূপ—এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। ...এই পত্র তোমার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে আমার সম্বল দাঁড়াইবে ৬০।৭০ পাউণ্ড। অতএব কিছু টাকা পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। ......আমি চিকাগোয় আর যাইব কি না, জানি না। যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পারো, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও।

আমেরিকার ন্যায় ঐশ্বর্যশালিনী দেশে নিঃসম্বল এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর অনাহার ও বিদ্রূপ-লাঞ্ছনার এ এক করুণ কাহিনী। প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ পত্রগুলিতে স্বামীজির মানসিক দ্বন্দ্বের এরূপ একটি স্তর উদ্ঘাটিত।

আমেরিকার চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজির বিজয় গৌরব ঘোষিত হইবার পর যে পত্রগুলি তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা ও মান্দ্রাজী বন্ধুগণকে লিখিয়াছেন সেগুলিই তাঁহার দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত পত্রাবলী। এ জাতীয় পত্রগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের মনের মুখরতা ও নানাচারী অভিব্যক্তির ইঙ্গিতবহ, কিছুটা দ্বন্দ্বমুক্ত ও সৃষ্টিধর্মী। এ সম্বন্ধে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর চিকাগো হইতে পুনরায় আলাসিঙ্গাকে লিখিত একখানি পত্রে দেখি: 'আমার এক মুহূর্তের অবিশ্বাস ও দুর্বলতার জন্য তোমরা সকলে কত কষ্ট পাইয়াছ তাহার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। ......বস্টনের নিকটবর্তী এক গ্রামে ডক্টর রাইটের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার প্রতি অতিশয় সহানুভূতি দেখাইলেন. ধর্মামহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা বুঝাইলেন—...'মহাসভা' খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্পপ্রাসাদ' (Art Palace) নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। .. সঙ্গীত বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইবার পর সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুর-দুর করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্ণে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। ... ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। ..... যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল

যে, কানে যেন তালা ধরিয়া যায়। ....টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন : 'মূকং করোতি বাচালং'। তাহার নাম জয়যুক্ত হউক। সেইদিন হইতেই আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম। ......অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই। ...আমার পোশাক প্রভৃতির জন্য যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ শত পাউণ্ড আছে। আর আমার বাড়িভাড়া বা খাইখরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ ইচ্ছা করিলেই এই শহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়িতে আমি থাকিতে পারি।'

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের ভাবী জীবনের যে উজ্জ্বল চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটি শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান,' উপরি-উক্ত পত্রখানি সেই ভবিষ্যৎ বাণীর সফলতার ইতিহাস। আবার এই দ্বিতীয় পর্যায়ের পত্রগুলিতেই স্বামীজির নব নব অভিজ্ঞতার বর্ণনা, আত্মার সাধনা, আত্মার প্রসার, তার সাধনবেগ ও অপরিসীম পৌরুষ, স্বদেশপ্রেম এবং অপার্থিব মানবপ্রীতির এক আশ্চর্য প্রতিফলন দেখিতে পাই।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক হইতে তাঁহার গুরুভ্রাতার লিখিত এক পত্র-বিচারে দেখা যায় উক্ত ভাবধারাগুলির এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত :

'শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্যে পরিণত করতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণবাবু, তারকদা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও, আর রামকৃষ্ণ

পরমহংস উপদেশ কর। কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খোলে তাই চেষ্টা কর। ······পুঁথি পাতড়ার কর্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর। পারো কি? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া? ·········উঠে পড়ে লেগে যাও দিকি। গপ্প-মারা, ঘণ্টা-নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, ······দেখি বাঙালীর ধর্ম কতদূর গড়ায়। ······কতকগুলো চেলা চাই—fiery youngmen (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক), বুঝতে পারলে? Intelligent and brave (বুদ্ধিমান ও সাহসী) যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝলে? Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে মদ্দ both (দুই)—প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর—চেলা বানাও আর আমাদের purity drilling (পবিত্রতার সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও। ·········সব ঠিক আসবে ধীরে ধীরে আমার বহুত চিঠি লেখবার সময় বড় একটা হয় না। Lecture লেক্‌চার (বক্তৃতা) তো কিছুই লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ, যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজপত্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ছেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; 'মধো, তোর পেটে এতও ছিল!!'·········

সমাজকে, জগৎকে elcetrify (বৈদ্যুতিকশক্তিসম্পন্ন) করতে হবে। বসে বসে গল্পবাজির আর ঘণ্টা-নাড়ার কাজ? ঘণ্টা-নাড়া গৃহস্থের কর্ম, মহীন্দ্র মাষ্টার, রামবাবু করুন গে। তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought-currents (ভাবপ্রবাহ-বিস্তার)। ·········Character formed (চরিত্র গঠিত) হ'য়ে যাক, তারপর আমি আসছি, বুঝলে? দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে-মদ্দ—বুঝলে? গৌর-মা,

যোগেন-মা, গোলাপ-মা কি করছেন? চেলা চাই at any risk (যে-কোন রকমে হোক)। ……গৃহস্থ চেলার কাজ নয়, ত্যাগী—বুঝলে? এক এক জনে একশত মাথা মুড়িয়ে ফেল, young educated men—not fools (শিক্ষিত যুবক—আহাম্মক নয়), তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থুল বাধাতে হবে, হুঁকোফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। তারকদাদা, মান্দ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মতো চক্র মারো দিকি, বার কতক। জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর খালি চেলা কর, মায় মেয়ে-মদ্দ, যে আসে সে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা Spiritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। ………এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্যবঃ' (প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা। ……তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন; এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, onward, onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও), ……নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মের বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। ………যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? ………যে যে এই চিঠি পড়বে তাদের ভিতর আমার spirit (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর। ………আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁশিয়ার, তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব-গুরবো, পাপী তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্যে যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—

তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন—তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।'

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রথম পর্যায়ের পত্রগুলিতেই লিপিবদ্ধ স্বামীজির জীবনের উন্মেষ পর্বের ইতিহাস [১৮৮৬—১৮৯৩]। আর সমগ্র দ্বিতীয় পর্যায় ও তৃতীয় পর্যায়ের পত্রাবলীর কিয়দংশ তাঁহার জীবনের বিকাশ পর্বের সাক্ষ্যবহ [১৮৯৩-৯৬]। ইহার পটভূমিকা আমেরিকা, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'কালে বটবৃক্ষের মতো বর্ধিত হয়ে শত শত লোককে শান্তিছায়া দান করবি' তাহারই ফলশ্রুতি। বস্তুত, তৃতীয় পর্যায়ের পত্রগুলি আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডবাসী বন্ধুবান্ধব ও যে সকল মার্কিন পরিবারের সহৃদয় ব্যবহারে স্বামীজি মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাদিগকে লিখিত।

বিশেষ করিয়া ৫৪১ ডিয়ারবর্ণ এভিনউস্থ হেল ভগিনীগণকে [মিস্ মেরী হেগ, হ্যারিয়েট হেল, ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলি প্রভৃতি] এবং পরম হিতৈষিণী মার্কিন মহিলা জোসেফাইস্ ম্যাক্‌লিওডকে লিখিত পত্রগুলিই উল্লেখযোগ্য। এই পত্রগুলি সাহিত্যগুণান্বিত, শুধু লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয়বহই নহে, পরন্তু, হৃদয়ের গভীর স্পর্শ বিজড়িত। এই কারণে এগুলি অধিকতর ভাবসমৃদ্ধ ও মননধর্মী এবং অন্তহীন নীল আকাশের ন্যায় স্নিগ্ধ ও অতলস্পর্শী।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে নিউইয়র্ক হইতে ইসাবেল ম্যাককিণ্ডলিকে লিখিত পত্রখানিই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি লিখিতেছেন :

'প্রিয় ভগিনি,

……১৩ ডলার দিয়ে একটা পাইপ কিনেছি—দোহাই, ফাদার পোপকে কথাটি বলো না যেন। কোটের খরচ পড়বে ৩০ ডলার। খাবার-দাবার ঠিকই মিলছে…এবং যথেষ্ট টাকা। আশা হয়, আগামী বক্তৃতার পরেই অবিলম্বে ব্যাঙ্কে কিছু রাখতে পারব।

······যা হোক, ১৯ তারিখ পার হলেই এক লাফে বস্টন থেকে চিকাগোয়, তারপরে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেব, আর টানা বিশ্রাম—দু-তিন সপ্তাহের। তখন গ্যাঁট হয়ে বসে শুধু গল্প করব আর পাইপ টানব। ·· ···হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে যাব। বস্টনে তিনটি বক্তৃতা এবং হার্ভার্ডে তিনটি—সকলেরই ব্যবস্থা করেছেন মিসেস ব্রীড। ······সুতরাং চিকাগোর পথে আমি আর একবার নিউইয়র্কে আসব—কিছু কড়া বাণী শুনিয়ে টাকাকড়ি পকেটস্থ ক'রে সাঁ ক'রে চিকাগোয় চলে যাব।

চিকাগোয় পাওয়া যায় না এমন কিছু যদি নিউইয়র্ক বা বস্টন থেকে তোমার দরকার থাকে, সত্বর লিখবে। আমার এখন পকেট-ভর্তি ডলার। যা তুমি চাইবে এক মুহূর্তে পাঠিয়ে দেব। এতে অশোভন কিছু হবে—এখনও মনে ক'রো না। আমার কাছে বুজরুকি নেই। আমি যদি তোমার ভাই হই তো ভাই-ই। পৃথিবীতে একটি জিনিসই আমি ঘৃণা করি—বুজরুকি।

তোমার স্নেহের ভাই
'বিবেকানন্দ'

কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীর স্নেহের স্পর্শ বিজড়িত উক্ত পত্রখানি। যাঁহার ভিতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হইয়া মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত দূরীভূত করিয়াছে এ-হেন শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানের পক্ষেই এ পত্র লেখা সম্ভব।

তৃতীয় পর্যায়ের শেষের দিকের পত্রগুলিতে [১৮৯৭-১৯০২] স্বামীজির একটি কেন্দ্রনিষ্ঠ মনের গাঢ়তা পরিস্ফুট এবং এইগুলিই জীবন ও জগৎরহস্য উন্মোচনের পরিচায়ক। জীবনের পরিণতি পর্বের ইতিহাস।

'মা নরেন্দ্রকে তাঁহার কাজ করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন। সে যেদিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর

ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ় সংকল্প সহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে।' ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে সত্য হইয়া উটিয়াছে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল, আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া হইতে জোসেফাইন্ ম্যাকনিওডকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানির ছত্রে ছত্রে :

'প্রিয় জো'

……আমি ভালোই আছি—মানসিক খুব ভালই। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি-স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ কচ্ছি। লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হল—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা ক'রে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'—হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু!'

যতই যা হোক জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি--সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলেছে!—বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সে মধুর গম্ভীর আহ্বান। যাই, প্রভু, যাই। ঐ তিনি বলছেন : 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক (সংসারের ভালমন্দ সংসারীরা দেখুক), তুই (ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়।'………

হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম-অনন্ত

শান্তির পারাবার—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তি ভঙ্গ করছে না। আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী আছি, এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেও খুশী, জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশী ; আবার এমন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না ; অথবা এমন বন্ধন আমি কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরানো 'বিবেকানন্দ' কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্যে চলে গেছে —আর ফিরছে না। শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর চিরশিষ্য চিরপদাশ্রিত দাস!

তুমি বুঝতে পারছ কেন আমি অভেনানন্দের কাজে হাত দিচ্ছি না? ……তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা-ভাসান দিয়েছি।

উপরে সূর্য তাঁর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্য-সম্পদ-শালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সব প্রাণী ও পদার্থই কত নিস্তব্ধ, কত স্থির, কত শান্ত!—আর আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছা আর বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিনীর সুশীতল বক্ষে ভেসে চলেছি। এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না - পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙে যায়। প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। এর আগে আমার কর্মের ভিতর নাম-যশের ভাবও উঠত, আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পিছনে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের

ভিতর প্রভুত্ব-স্পৃহা আসত। এখন সে-সব উড়ে যাচ্ছে; আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা-ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই মা, যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই।

আহা, কী স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলি পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন এক দূর, অতি দূর অন্তস্তল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মতো ধীরে অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁচচ্ছে। আর শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যা কিছু দেখছি, শুনছি, সব কিছু ছেয়ে রয়েছে! মানুষঘুমিয়ে পড়বার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মতো অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি ভালবাসা থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে একটুকু ভালমন্দ ভাব পর্যন্তও জাগে না—আমার মনের এখানকার অবস্থা ঠিক যেন সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি! চারপাশে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে, আমার প্রাণের শান্তির বিরাম নেই। ঐ আবার সেই আহ্বান! —যাই, প্রভু, যাই!

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে, কিন্তু সেটা সুন্দরও মনে হচ্ছে না, কুৎসিতও মনে হচ্ছে না—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মনে 'এটা ত্যাজ্য, ওটা গ্রাহ্য'—এমন ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না। আহা, জো, এ যে কী আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কী বলব! যা কিছু দেখছি, শুনছি, সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে কেন; না নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, উপাদেয়-হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন

কোথায় চলে গেছে! আর, সবচেয়ে উপাদেয় বলে শরীরটার প্রতি এর আগে যে বোধটা ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে!...ইতি

তোমারই চিরবিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

নেপোলিয়ন, ভলটেয়ার, রুশো প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পত্র-সাহিত্যিকদের, এমন কি রবীন্দ্রনাথের পত্রেও মানসিক বিকাশের এরূপ একটি স্তর উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। এ-জন্যই তিনি সকল লোকের সকল কালের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং জগৎপূজ্য। এই পত্রখানিই স্বামীজির জীবনের সামগ্রিক রূপায়ণের পরিণতি। তাঁহার দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশেষ ভবিষ্যদ্বাণী 'আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায়?' এই ঋণ পরিশোধের শেষ উত্তর স্বামীজি ১৯০০, আগষ্টের পত্রে যেভাবে দিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য গুরুর কুশলী শিষ্যের উপযুক্ত উত্তরই বটে। উপসংহারে সেটুকুই উপহার দিলাম:

'হরি ভাই,

...এখন আমি লিখে দিচ্ছি যে, কারও একাধিপত্য থাকবে না। সমস্ত কাজ majority-র (অধিকাংশের) হুকুমে হবে...সেই মতো ট্রাস্ট ডীড্ করিয়া নিলেই আমি বাঁচি।...এ বৃত্তান্ত ঐ পর্যন্ত। এখন তোমরা যা হয় কর। আমার কাজ আমি করে দিয়েছি, ব্যস্। গুরুমহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম—প্রাণ বার করে আমি শোধ দিয়েছি। সে-কথা তোমায় কী বলব!...দলিল করে পাঠিয়েছে সর্বেসর্বা কর্ত্তাত্তির! কর্ত্তাত্তি ছাড়া বাকি সব সই করে দিয়েছি!... গঙ্গাধর, তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা—এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কর্ত্তা করে দিচ্ছি। গুরুদেব বড় বলতেন। এ তাঁর

কাজ।...প্রাণ ধরে সই করে দিয়েছি। এখন থেকে যা করব সে আমার কাজ।...আমি এখন আমার কাজ করতে চললুম। গুরুমহারাজের ঋণ ...প্রাণ বার করে শুধে দিয়েছি। তাঁর আর দাবিদাওয়া নেই।...তোমরা যা করছ, ও গুরুমহারাজের কাজ করে যাও।...ইতি

নরেন্দ্র'

সর্বকালের, সর্বদেশের একজন লোকাতীত পুরুষের একটি মহান জীবনের উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস—এই 'পত্রাবলী'।

* এই প্রসঙ্গে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে, শ্রীপ্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পত্রখানি দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীতে স্বামীজি দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বামীজির পুণ্য জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর কীর্তিকথা নতুন করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। স্বদেশ-জননীর এই মহান সন্তান জগতে এবং জাতীয় জীবনে কি কি অবদান রেখে গেছেন, তাঁর আবির্ভাবে দেশ কি লাভে করেছে, আজ তার নব-মূল্যায়ন হচ্ছে দেশের সর্বত্র। তিনি শুধু ধর্মনায়ক ছিলেন না, ছিলেন জাতির জাগরণযজ্ঞের এক মহান ঋত্বিক। দেশ-মানবের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কর্মবীর, স্বদেশের কল্যাণব্রতের চিন্তানায়ক।

উক্ত সমস্ত বিষয়ে তাঁর কার্যাবলী এবং অবদানও কিছু তাঁর ব্যক্তিত্বের সমগ্র প্রকাশ বা সম্পূর্ণ রূপ নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল যেমন বিরাট, তেমনি বহুমুখী। তাঁর চরিত্রের একদিকে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস, ধর্মবোধ ও অধ্যাত্মচেতনা, দেশপ্রেম ও সেবাব্রত, অন্যদিকে অধ্যয়ন এবং চিত্রশিল্পাদিতে গভীর অনুরাগ, পাণ্ডিত্য এবং রচনাশক্তি, সঙ্গীতচর্চা এবং সঙ্গীতচিন্তা। অর্থাৎ তাঁর শিল্পীসত্তা। এই দুই অংশের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, বরং তারা তাঁর চরিত্রের পরিপূরক। দুয়ের সমন্বয়ে সুসমঞ্জস তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ এবং উক্ত বিবিধ গুণাবলীর সম্মিলনেই স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামীজির শিল্পীসত্তার এক পরমপ্রকাশ হল তাঁর সঙ্গীত জীবন—বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনে সঙ্গীত এমন সত্য ছিল যে, কোন সময়ে তাঁর জীবন থেকে সঙ্গীতকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সঙ্গীত তাঁর সমগ্র সত্তার সঙ্গে কেমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে যুক্ত ছিল, সে বিষয়ে পরে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করা হবে।

লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী স্বামীজি সঙ্গীতজ্ঞরূপেও প্রতিভার

স্বাক্ষর রেখেছিলেন। একথা সুপরিচিত যে, স্বামীজি একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতজ্ঞরূপে এই পরিচয়ই যথেষ্ট নয়। কারণ, সঙ্গীত-বিষয়েও তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। গায়করূপে তাঁর খ্যাতি সমধিক হলেও তিনি ছিলেন একাধারে মৃদঙ্গবাদক, গীত-রচয়িতা, সঙ্গীতের তত্ত্বদর্শী লেখক এবং সঙ্গীতবিজ্ঞানের ভাষ্যকার। একাধিক গুণী কলাবতের অধীনে রীতিমতো শিক্ষালাভ করে তিনি সঙ্গীতে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। সঙ্গীত-বিষয়ে তিনি অশিক্ষিত অপটু ছিলেন না। ছিলেন সহজাত প্রতিভার অধিকারী এবং পদ্ধতিগত শিক্ষাপ্রাপ্ত।

উত্তরাধিকার ও রীতিমতো শিক্ষা

স্বামীজি জন্মসূত্রে তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা লাভ করেন। উত্তরার কলকাতা শিমুলিয়ায় যে বিখ্যাত ও বনিয়াদী দত্তবংশে তাঁর জন্ম, সেই পরিবার শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতিচর্চা ও উদার চিন্তাধারার জন্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সেখানে সঙ্গীতেরও চর্চা বিদ্যমান ছিল।

স্বামীজির পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে যান, একমাত্র শিশুপুত্র বিশ্বনাথ এবং পত্নীকে পরিত্যাগ করে। দুর্গাপ্রসাদ আর সংসারে প্রবেশ করেননি। তাঁর সঙ্গে পৌত্র নরেন্দ্রনাথের [স্বামীজির পূর্বাশ্রমের নাম] আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল। দুর্গাপ্রসাদের সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য এই যে, তিনি গান গাইতেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর।

নরেন্দ্রনাথের পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট বিশ্বনাথ দত্ত বিশেষ সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ছিলেন। কৃতী আইনজীবী হলেও তিনি অবসর যাপন করতেন কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস-পাঠ ইত্যাদিতে এবং কলাবতদের সঙ্গীত উপভোগে তিনি বিশেষ সামাজিক, মজলিসী ও সৌখিন প্রকৃতির ছিলেন এবং রাগসঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর একান্ত

অনুরাগ। তিনি শুধু সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতবোদ্ধা ছিলেন না, এক সময় উস্তাদের অধীনে সঙ্গীতশিক্ষাও করেছিলেন, একথা স্বামীজির দ্বিতীয় অনুজ মহেন্দ্রনাথের বিবৃতি থেকে জানা যায়। উত্তর জীবনে বিশ্বনাথের পক্ষে সঙ্গীতচর্চা কথা আর সম্ভব না হলেও, তিনি আজীবন ছিলেন সঙ্গীতের একান্ত অনুরাগী। তাঁর গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়িতে প্রতি সপ্তায় শনি ও রবিবার সঙ্গীতের আসর বসত এবং সেখানে কৃতবিদ্য সঙ্গীতজ্ঞগণ সঙ্গীতানুষ্ঠান করতেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নরেন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা তাঁর পিতার কাছেই আরম্ভ হয়েছিল। সপরিবারে পশ্চিমাঞ্চলে বাস করবার সময় রায়পুরে বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় পুত্রকে সঙ্গীতের প্রথম পাঠ দেন। তারপরে কলকাতায় উপযুক্ত সঙ্গীতাচার্যের অধীনে নরেন্দ্রনাথের নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন তিনি। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে অবস্থান করবার সময়, তিনি ছিলেন কিশোর এবং তখন তাঁর বয়স ১৩।১৪ বছর। কিন্তু তারও অনেক আগে, প্রায় শিশুকাল থেকে নরেন্দ্রনাথের সুকণ্ঠ এবং শোনা গান অনুকরণ করে গাইবার ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল। শিমুলিয়া দত্তবাড়ির ঠাকুর-দালানে গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়বার সময়ে মকর-সংক্রান্তির দিন গঙ্গাবন্দনা গান, গোবিন্দ অধিকারীর ও অন্য একটি যাত্রা শোনবার পর তার গান গাওয়া, বৈষ্ণব ভিখারীদের মুখে শোনা গান ইত্যাদি নরেন্দ্রনাথের শিশু-বয়সের গানের কথা মহেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রভৃতি তাঁর জীবনী-রচয়িতারা উল্লেখ করেছেন। এই সব বিবরণ থেকে জানা যায় বাল্যকাল থেকে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতে আসক্তি ও নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছিল।

তারপর রায়পুরে অবস্থানেকালে পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষার সূত্রপাত এবং পরে কলকাতায় এসে কলাবতের অধীনে রীতিমতো শিক্ষালাভ। শেষোক্ত বিষয়ের বিবরণ দেবার আগে তাঁর উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানাবার আছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর

'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: 'মাতা শ্রদ্ধেয়া ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্টি ছিল। কৃষ্ণযাত্রার গান তিনি আপনমনে বেশ গাহিতেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ নানাদিক হইতে শক্তি আসায় স্বামীজির সঙ্গীতের ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়াছিল।'

যতদূর জানা যায়, [১৮৭৯ খ্রীঃ মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিশন থেকে] প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর নরেন্দ্রনাথ উস্তাদের অধীনে পদ্ধতিগতভাবে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং তার ব্যবস্থা করে দেন তাঁর পিতা স্বয়ং। পুত্রের সঙ্গে আর একজন জ্ঞাতিরও সঙ্গীত-প্রতিভা লক্ষ্য করে বিশ্বনাথ তাঁরও একসঙ্গে সঙ্গীত-শিক্ষার সুযোগ করে দেন, সঙ্গীতযন্ত্রাদি ক্রয় ও সঙ্গীতশিক্ষকের পারিশ্রমিক বহন করে। নরেন্দ্রনাথের সেই জ্ঞাতিভ্রাতার নাম অমৃতলাল ওরফে হাবু দত্ত। হাবু দত্ত নরেন্দ্র অপেক্ষা বছর চারেক বয়োজ্যেষ্ঠ এবং নরেন্দ্রের পিতামহ দুর্গাপ্রসাদের ভ্রাতা কালিপ্রসাদের পৌত্র। উত্তর-জীবনে হাবু দত্ত ক্লারিওনেট ও এস্রাজবাদকরূপে স্বনামধন্য এবং দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞরূপে গণ্য হন। উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ প্রথম জীবনে হাবু দত্তের কাছে অনেকদিন যন্ত্রসঙ্গীতে তালিম পান। হাবু দত্তের বিষয়ে একটি গৌরবের কথা এই যে, য়ুরোপের বহুবিখ্যাত গায়িকা মাদাম কালভে ১৯১১ খ্রীঃ যখন কলকাতায় আসেন, তখন একদিন বেলুড় মঠে হাবু দত্তের এস্রাজবাদন শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। হাবু দত্ত পরে সঙ্গীত-নায়ক উজীর খাঁর ঘরানা শিক্ষা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল উস্তাদ বেণীমাধব অধিকারীর অধীনে এবং নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। নরেন্দ্র প্রধানতঃ কণ্ঠসঙ্গীত অবলম্বন করেন। কিন্তু হাবু দত্ত ক্রমে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীতে এবং প্রথমে এস্রাজী কানাইলাল দেঁড়ী ও পরে উজীর খাঁকে সঙ্গীত গুরুরূপে লাভ করেন। হাবু দত্ত নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই গৃহে বাস করতেন এবং তাঁর

কনিষ্ঠ সহোদর সুরেন্দ্রনাথও [তমু বাবু] একজন গুণী যন্ত্রীরূপে পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের যে বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীত-সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান হয় (পরে উল্লিখিতব্য) তাঁর সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ক রচনাটিতে যার পরিচয় পাওয়া যায়, তা তাঁর উক্ত দুই যন্ত্রী জ্ঞাতিভ্রাতার একই গৃহে যন্ত্রসঙ্গীত চর্চার ফলে।

নরেন্দ্রনাথের পদ্ধতিগত কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার প্রথম গুরু বেণীমাধব অধিকারী ছিলেন উস্তাদ আহম্মদ খাঁর অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য এবং নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী', 'দক্ষযজ্ঞ', 'চৈতন্যলীলা' প্রভৃতি নাটকের গীতাবলীর সুরসংযোজক। নরেন্দ্রনাথ উক্ত আহম্মদ খাঁর কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেন বলে শোনা যায়। অন্য এক মতে, তিনি ধ্রুপদী জোয়ালাপ্রসাদের কাছেও শিক্ষালাভ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মৃদঙ্গবাদনে শিক্ষালাভও হয়েছিল। পরে বরানগর মঠে অবস্থানকালে এবং শেষ জীবনে বেলুড় মঠেও অন্যের গানের সঙ্গে তাঁর মৃদঙ্গবাদনের কথা জানা যায়। কিন্তু কার কাছে তিনি পাখোয়াজ শিখেছিলেন, তা সঠিক জানা যায়নি।

প্রখর প্রতিভার অধিকারী নরেন্দ্রনাথ উক্ত গুণীদের কাছে শিক্ষালাভের ফলে কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। উস্তাদের কাছে তাঁর শিক্ষাজীবনের মধ্যে এবং ফার্স্ট আর্টস্ ক্লাসের কলেজ-ছাত্র অবস্থায় তিনি গীতশিল্পীরূপে সুপরিচিত হ'তে আরম্ভ করেন বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত মহলে, ব্রাহ্মসমাজে, শিমুলিয়া-পল্লী ইত্যাদিতে। তাঁর গানের গুণমুগ্ধ চক্রের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। এমন কি, অনেক স্থলে তাঁর প্রধান পরিচয় হয় তাঁর সঙ্গীতে। উস্তাদদের শিক্ষা তিনি বছর চারেক পেয়েছিলেন।

গায়করূপে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগের পূর্বে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন—প্রথমে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সমাজ এবং পরে

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে, তখনই তাঁর প্রধান পরিচয় ছিল গায়করূপে। হৃদয়গ্রাহী ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীতের জন্মে তিনি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। সেখানে সাপ্তাহিক উপাসনার দিনে তাঁর গান হ'ত, একথা তাঁর একাধিক জীবনী-লেখক উল্লেখ করেছেন। আরো জানা যায় যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মনীষী রাজনারায়ণ বসুর কন্যা শ্রীমতী লীলা ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের ['সঞ্জীবনী'-সম্পাদক] বিবাহ-অনুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিত যদি' গানখানি গেয়েছিলেন [১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে]।

উক্ত বছরেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে নিতান্ত ঘটনাচক্রে এবং সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের উপলক্ষ হয়েছিল সঙ্গীত। তাঁদের যোগাযোগের হেতু হন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীশিষ্য ও সেবক। মিত্র মহাশয় সেদিন [১৮৮১ খ্রীঃ, নভেম্বর] শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে নিজের বাড়িতে এনে একটি আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গান ভালবাসেন বলে সেই অনুষ্ঠানে তাঁকে গান শোনাবার জন্মে ননেন্দ্রনাথকে আনা হয়, অন্য গায়ক না পাওয়ার ফলে। সেখানে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে দুটি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত —'মন চল নিজ নিকেতনে' [সুরটমল্লার একতালা] ও 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে' [ভীমপলশ্রী, একতালা] শুনিয়েছিলেন। [গান দুখানির রচয়িতা হলেন যথাক্রমে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়]।

সেদিন তাঁর কণ্ঠে ওই গান শুনে এবং গায়ককে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার আমন্ত্রণও করেন। সেদিন থেকেই তাঁদের দু'জনের আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত। এমনিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যোগাযোগে মধ্যস্থতা করেছিল সঙ্গীত। তারপর থেকে তাঁদের জীবনী

পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় বেশ লক্ষ্য করা যায়, তা হ'ল—সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটি থেকে আরম্ভ করে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কিছু আগে পর্যন্ত তাঁদের দু'জনের যতবার দেখা হয়েছে তার মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে—সঙ্গীত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আরম্ভ করবার আগে, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতজ্ঞান বিষয়ে একটি কথা বলা উচিত মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবে যদি তাঁর জীবনের গতি সন্ন্যাসের পথে যাত্রা না করত, তিনি গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ-রূপে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী বলে প্রতিষ্ঠিত হতেন, সেই তরুণ বয়সে ধ্রুপদাঙ্গের গায়করূপে তিনি এমন খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর গান শুনে শ্রোতারা কতদূর পরিতৃপ্ত ও অভিভূত হতেন, তার বহু উদাহরণ তাঁর জীবনীগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে, স্থানাভাবে এখানে সে-সব উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভাবসম্মিলনের এক প্রধান যোগসূত্র হল সঙ্গীত। তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎকারের যত দিনের বিবরণ পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগ দিনেই নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে যেমন স্নেহ করতেন, তেমনি ভালবাসতেন তাঁর কণ্ঠের গান শুনতে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁর গান অবশ্যই শুনবেন, এই ছিল যেন রীতি। সেজন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সঙ্গীতের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতেন—তানপুরা, পাখোয়াজ, তবলা ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ বিনা তানপুরায়, সুর সহযোগিতা ভিন্ন কখনো গান গাইতে সম্মত হতেন না,—শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেও না। এটি তাঁর উস্তাদের অধীনে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার ফল।

দক্ষিণেশ্বরে কিংবা বলরাম বসু প্রভৃতির মতো কোন ভক্তের বাড়িতে, যেখানেই তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা হয়েছে, গুরুর অনুরোধে তাঁকে গান গাইতে হয়েছে। তাঁদের দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটেছে, অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গান শোনাতে বলেন নি, এমন বিবরণ

কদাচিৎ পাওয়া যায়। নরেন্দ্রের গান শুধু শোনা নয়, সে গান শোনবার ফলে প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হয়ে যেতেন। তাঁর গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে কতখানি অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যেত, তার বহু দৃষ্টান্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রভৃতি গৃন্থে বিবৃত আছে, এখানে সে সমস্ত বিবরণের পুনরুল্লেখ সম্ভবপর নয়। শুধু একটি দিনের সঙ্গীতপ্রসঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণনা করি, যা থেকে বোঝা যাবে নরেন্দ্রনাথের গান কী গভীর ভাবের উদ্রেক করত। সেদিন [১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট] তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি [খয়রা তালের] সুললিত কীর্তন শুনিয়েছিলেন—'সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে'। গানখানি বিখ্যাত গীতরচয়িতা পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। নরেন্দ্রনাথের গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে তিনি সেদিন তার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে নরেন্দ্রনাথের গানের বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, সত্যকার গীতশিল্পীর কণ্ঠে শোনা গান ভিন্ন তা করা যায় না। 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' থেকে সেই বিবরণের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল :

নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন। গাইলেন :

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।

……'আনন্দ অমৃতরূপে' এই কথা বলিতে-না-বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি দৃষ্টে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্বদিকের বারান্দায় চলিয়া গিয়াছেন।…শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভঙ্গের পর ভক্তদের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন যে, নরেন্দ্র নাই। শূন্য তানপুরা পড়িয়া রহিয়াছে, আর ভক্তগণ, সকলে তাঁহার দিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন : 'আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকলো আর গেল'।

এই দুই মহামানবের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক যোগাযোগে গানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বরাবর ছিল। তাঁদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের দিনে অনেক সময় এক বিচিত্র ও অপূর্ব সাঙ্গীতিক পরিবেশের সৃষ্টি হ'ত। নরেন্দ্রের গান শোনবামাত্র অনুরূপ ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি হ'ত শ্রীরামকৃষ্ণের মনে। তাঁর গানে শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র সত্তা যেন অনুরণিত হয়ে সাড়া দিত। গান জাগাত গান। সুর ফোটাত সুর। ভাব মেলাত ভাব। নরেন্দ্রের গান শুনে আত্মহারা হয়ে তিনি কখনো কখনো ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে গান গাইতে আরম্ভ করতেন। নরেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ধ্রুপদাঙ্গের গায়ক হলেও শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রায় সমস্ত রকম গান শুনিয়েছেন, কখনো নিজের অভিরুচিতে, কখনো বা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে। ব্রহ্মসঙ্গীত এবং ধ্রুপদাঙ্গের গান ভিন্ন সুরদাস, কবীর, নানক প্রভৃতির ভজন গীতাবলী, শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী, আগমনী, কীর্তন ইত্যাদি নানা ধরনের গান তিনি গেয়েছেন। কীর্তন তাঁর আখর প্রয়োগ করে গাইবার দৃষ্টান্তে বোঝা যায় যে, প্রণালীবদ্ধ সংকীর্তনের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। দক্ষিণেশ্বরে একদিন [১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর] তাঁর খোল বাজাবার বিবরণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানও তাঁর গাইবার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে। যথা, 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে' [জয়জয়ন্তী, ঝাঁপতাল—গুরু নানকের ভজন 'গগনময় থাল রবিচন্দ দীপক বনে-র বঙ্গীয়করণ], 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' [আলাইয়া, ঝাঁপতাল], 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,' 'দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন' [ধুন, কাওয়ালী], 'এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' গানখানিও ইতঃপূর্বে নরেন্দ্রনাথের গাইবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত গানই রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের অর্থাৎ ২০-২২ বছর কালের রচনা।

রবীন্দ্রনাথের গান যে তখনই নরেন্দ্রনাথ [রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দেড় বছর বয়ঃকনিষ্ঠ] গাইতেন, একথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষার সৌকুমার্য ও উৎকর্ষতা সম্ভবত নরেন্দ্রনাথকে তাঁর গানের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। বরানগর মঠে অবস্থানকালেও তিনি রবীন্দ্রনাথের 'আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন' [খট্, ঝাঁপতাল] প্রভৃতি গান গাইতেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কাশীপুরের বাগান-বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের কয়েদিন পূর্ব পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ এবং নরেন্দ্রনাথের জীবনেরও একটি পর্বের অবসান হয়।

সন্ন্যাস ও পরিব্রাজক-জীবনে সঙ্গীত

কিন্তু সঙ্গীতচর্চার অবসান স্বামীজির হ'ল না, কোনদিনই হয়নি। পারিবারিক বিপর্যয় এবং সন্ন্যাসের পথে জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হওয়ায় নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা অবশ্য আর সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্যে তিনি কখনোই সঙ্গীত-ক্রিয়া থেকে একেবারে বিরত হননি। তবে যে রাগসঙ্গীত তিনি কলেজ-জীবনে নিয়মিত শিক্ষা করেছিলেন, তা গাইবার উপযুক্ত পরিবেশ সব সময়ে তাঁর উত্তর জীবনে সম্ভব ছিল না। সেজন্যে রাগসঙ্গীত গাইবার সুযোগ সর্বদা তাঁর হ'ত না, যদিও গান তিনি প্রায় বরাবর বহু বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও গেয়েছেন, তাঁর পরিব্রাজক ও সন্ন্যাস-জীবনে। গান তাঁর মানস জীবনের ভাব-প্রকাশের বাহন হওয়ায় তিনি গাইতেন বিশেষ ধরনের গান, যা তাঁর তৎকালীন মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'ত। কখনো তিনি গাইতেন ধ্রুপদাঙ্গ ও অন্যান্য ব্রহ্মসঙ্গীত, কখনো কীর্তন, কখনো ভজন, কখনো শ্যামাসঙ্গীত, কখনো স্বরচিত গান, কখনো বা গিরীশচন্দ্রের বৈরাগ্যের গান। সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে গিরীশচন্দ্র-রচিত ['বুদ্ধদেব' নাটকের]

'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই' গানখানি তিনি প্রায়শ গাইতেন গভীর অনুভূতির সঙ্গে।

উত্তরকালে তাঁর অন্তর্লোক এবং পরিবেশে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটায় রাগ-সঙ্গীত তেমন বেশি গাইতেন না, একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু রাগ-সঙ্গীত যে সম্পূর্ণ বর্জন করেননি, সেকথার উল্লেখ দেখা যায় তাঁর জীবনের নানা সময়ে। যথা, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে, পরিব্রাজক-জীবনে খেতরীরাজ্যের রাজসভায় ভগিনী নিবেদিতাকে দীক্ষা দেবার দিন সকালে বেলুড় মঠে, ইত্যাদি। তা ছাড়া, শেষ জীবনে বেলুড়মঠে অবস্থানকালেও তিনি মাঝে মাঝে ধ্রুপদ গান গাইতেন এবং অন্যের গানের সঙ্গে মৃদঙ্গে সহযোগিতা করতেন জানা যায়।

সন্ন্যাস অবলম্বনের অব্যবহিত পূর্বেও সঙ্গীত তাঁর চিত্ত কতখানি অধিকার করে বর্তমান ছিল, তার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন আছে। তখনো যে তিনি সঙ্গীত-ক্রিয়ায় মাঝে মাঝে মগ্ন হতেন, শুধু তা-ই নয়, সে সময় তাঁর সঙ্গীত-চিন্তার বিশিষ্ট স্বাক্ষর বহন করে রচিত হয় তাঁর একটি সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ। পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তিনি বরানগর মঠে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। কিন্তু রচিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। পুস্তকটির পরিচয় পরে দেওয়া হবে। এখানে আলোচ্য বিষয় হ'ল, সন্ন্যাস-জীবনের প্রারম্ভ থেকে জীবনের সর্বপর্বে স্বামীজির গান গাইবার প্রসঙ্গ।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে পিতার আকস্মিক মৃত্যু থেকে আরম্ভ করে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনে ও অন্তর্জগতে প্রবল দ্বন্দ্ব ও আলোড়নের যুগ। তখন একদিকে পারিবারিক বিপর্যয় রোধ করবার জন্যে সংসারের দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও নির্মম জীবন-সংগ্রাম। অন্যদিকে নিরন্তর মানসিক আন্দোলন, প্রবল বৈরাগ্য ও

সন্ন্যাসের পথে প্রচণ্ড গতিপ্রবণতা। তাঁর এই দ্বিধা ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব চলেছিল বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ সন্ন্যাস অবলম্বন করে মঠ-জীবনের সূত্রপাত পর্যন্ত। এই পর্বেও নানা দিকে তাঁর গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সময়ে তিনি নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেব-চরিত' প্রভৃতি নাটকের গানগুলি গাইতেন। জয়দেব-প্রণীত 'গীতগোবিন্দ'-এর গান, 'কথামৃত'-গ্রন্থকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর গাইবার কথাও জানা যায়। তাঁর স্বরচিত বিখ্যাত 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর' গানখানিও তিনি এই যুগে রচনা ও গান করেন।

তারপর বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠা করে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে সেখানে অবস্থানের যুগ। মঠে নরেন্দ্র প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যেরা সাধন-ভজন ও কঠোর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর ও কালী তপস্বীর প্রভাবে ও দৃষ্টান্তে সেখানে বিদ্যাচর্চার উদার আবহ সৃষ্টি হ'ল। বরানগর মঠের আর একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য দেখা গেল সেখানকার সঙ্গীত-অনুষ্ঠানে। সঙ্গীতচর্চা মঠে নিষিদ্ধ ছিল না, বরং নিয়মিত অনুষ্ঠিত হ'ত। সঙ্গীত ছিল মঠে সাধন-ভজনের অন্যতম অঙ্গ এবং তার পরিবেশ সৃষ্টির মূলে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রভাবে বরানগর মঠের কঠোর ও পরিপূর্ণ ত্যাগের জীবনের মধ্যেও সঙ্গীতচর্চা বিদ্যমান ছিল এবং এখানে শরৎ মহারাজকে [স্বামী সারদানন্দ] তিনি সঙ্গীতশিক্ষাও দিয়েছিলেন।

মঠের সন্ন্যাসীরা নিয়মিত গান গাইতেন। ভজন, কীর্তন, ব্রহ্মসঙ্গীত, দেহতত্ত্ব, শ্যামাসঙ্গীত ইত্যাদি নানাপ্রকার গান হ'ত। সঙ্গীত-বিষয়ে সকলের এত আগ্রহ ছিল যে, গানের খাতা ছিল এবং সন্ন্যাসীদের প্রিয় গানগুলি লিখিত থাকত গাইবার প্রয়োজনে। নরেন্দ্রনাথ অনেক সময় একক গান গাইতেন এবং তাঁর ধ্রুপদাঙ্গের গান গাইবার উল্লেখও পাওয়া যায়। মিলিত কণ্ঠে বা সদলে কীর্তন গান হ'ত মাঝে মাঝে।

বরানগর মঠ থেকে একবার তিনি [১৮৮৮ খ্রীঃ] পশ্চিমাঞ্চলে যান। সে যাত্রায় বৃন্দাবনের সন্নিকটে হাথ্‌রাস স্টেশনে রেলকর্মচারী শরৎচন্দ্র গুপ্ত তাঁর প্রথম শিষ্য হয়েছিলেন বার বার স্বামীজি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও। এক্ষেত্রে শরৎ গুপ্তের সংসার ত্যাগ করে স্বামীজির শিষ্য হওয়ার সংকল্প ও সন্ন্যাস গ্রহণের উপলক্ষ হয় স্বামীজির সঙ্গীত। তিনি হাথ্‌রাস স্টেশনে বসে 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানখানি গাইবার ফলে উক্ত ঘটনা ঘটবার মনোজ্ঞ বিবরণ মহেন্দ্রনাথ দত্ত দিয়েছেন ['শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির ঘটনাবলী' গ্রন্থে]: 'নরেন্দ্রনাথ আপনা-আপনি গান করিতে লাগিলেন, 'সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে' ইত্যাদি। তাঁহাদের মুখের গানটি শুনিয়া উক্ত কর্মচারীর যেন মুহূর্তে সব ভাব বদলে গেল—তাহার চাকুরী করা বা বাড়ি-ঘরদোরের কথা যেন চিরকালের জন্য একেবারে মন থেকে দূর হয়ে গেল। বাবা, মা, ভাই, বোন সকলই তার ছিল ; কিন্তু সে তখন যেন অন্য প্রকার হইয়া উঠিল। সংসারের কোন বিষয়ই যেন তার আর উপাদেয় বোধ হইল না।···তারপর গুপ্ত স্থির করলে, কাজকর্ম ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে হবে'।

তিনি বরানগর মঠে এসে যোগ দেন এবং পরে সুপরিচিত হন স্বামী সদানন্দ নামে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে নরেন্দ্রনাথ বরানগর মঠ থেকে পর্যটনে নির্গত হলেন এবং তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের আরম্ভ। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৮৮৬ খ্রীঃ থেকে ১৮৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত বরানগর মঠের কাল। ওই বছর মঠ স্থানান্তরিত হয় আলমবাজারের একটি বাড়িতে, সেজন্যে ১৮৯২ খ্রীঃ থেকে আরম্ভ করে স্বামীজির আমেরিকা হতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত হ'ল আলমবাজার মঠের অস্তিত্ব। স্বামীজি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর আর বরানগর মঠে অবস্থান করেননি এবং আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন আলমবাজার মঠের শেষপর্বে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ক্রমান্বয়ে তিন বছর পরিব্রাজক-জীবনে সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন স্বামীজির জীবনে এক যুগান্তকারী অধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথের স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে উজ্জীবনের কাল। এই পর্বে একদিকে তাঁর ভারতদর্শন এবং অন্যদিকে আত্মদর্শন ও আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে—যার পরিণতি ও পূর্ণপ্রকাশ দেখা যায় আমেরিকা ও পরে য়ুরোপে তাঁর ঐতিহাসিক কার্যধারায়। সে প্রসঙ্গ তাঁর জীবনী পাঠকদের সুবিদিত।

তাঁর পরিব্রাজক-জীবনে সমগ্র ভারত-পরিক্রমার মধ্যেও সঙ্গীতের প্রসঙ্গ আছে। এখানে তাঁর বিস্তৃত পরিচয় না দিয়ে সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করা হবে। এই পর্বে, প্রথমে প্রয়াগে তাঁর ভজনাদি গান করবার কথা জানা যায়। তারপর রাজস্থানের খেতরীরাজ্যের সঙ্গীতপ্রিয় রাজা [পরে স্বামীজির শিষ্য-সেবক] অজিতসিংহের দরবারে স্বামীজি গান করেছিলেন রাগসঙ্গীত। রাজার বিশেষ অনুরোধে স্বামীজি দরবারী কানাড়া, ইমন্ কল্যাণ ইত্যাদি রাগে ধ্রুপদ গান গেয়েছিলেন। খেতরীর রাজসভাতেই স্বামীজি সেই নর্তকীর মুখে সুরদাসের বিখ্যাত ভজনটি ['প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো, সমদরশী হাম হায় তিহারো, চাহ তো পার কারো'] শোনেন এবং পরবর্তীকালে কখনো কখনো তিনি নিজেও গানখানি গাইতেন। তারপর জুনাগড়, মাদ্রাজ প্রভৃতি আরো কয়েকস্থানে তাঁর গান গাইবার কথা জানতে পারা যায় স্বামীজির নানা জীবনীগ্রন্থ থেকে।

মাদ্রাজ থেকে তাঁর আমেরিকা-যাত্রার ব্যবস্থাদি হয় এবং সেখান থেকে বোম্বাই গিয়ে মাদ্রাজে সমুদ্রযাত্রা করেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে। সেখানে চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজির বিজয়-বৈজয়ন্তীর কথা সর্বাধিক সুপরিচিত। আমেরিকা প্রবাসের পরে তিনি যখন লণ্ডনে বাস করছিলেন, তখনকার দু'একদিনের প্রসঙ্গে স্বামীজির আপন মনে [বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'সাধের তরণী আমার কে

দিল তরঙ্গে' প্রভৃতি] গান গাইবার কথা তাঁর অনুজ মহেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন।

য়ুরোপ থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর এবং বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি স্বামীজি পাঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। সে যাত্রায় তাঁর গান গাইবার কথা জানা যায় শ্রীনগর, মরি প্রভৃতি স্থানে। তার পরের বছর বেলুড় মঠ থেকে হিমালয় অঞ্চলে মঠ প্রতিষ্ঠা ও তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁর সদলে গমনকালেও সঙ্গীত-প্রসঙ্গ আছে। সে বছর বেলুড় মঠে ভগিনী নিবেদিতাকে দীক্ষা দিবার দিন [২৫ মার্চ, ১৮৯৮] স্বামীজি ধ্রুপদাঙ্গের গান গেয়েছিলেন। উক্ত বছরে বেলুড় মঠে অবস্থান করবার সময়ে তারা নানা দিনের গানের প্রসঙ্গ ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামীজির অন্যান্য চরিত-গ্রন্থ-লেখক উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে দেখা যায়, জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত স্বামীজি গান গেয়েছেন এবং যতদূর সম্ভব, কোনকালেই সঙ্গীত-বর্জিত ছিলেন না। তাঁর অন্তিম পর্বের সঙ্গীতের সঙ্গী তাঁর হাতের তানপুরা ও পাখোয়াজ যন্ত্রটি বেলুড় মঠে তাঁর স্মৃতি-কক্ষে সযত্নে রক্ষিত আছে।

গান-রচনা

স্বামীজির সঙ্গীত প্রতিভা যে বহুমুখী ছিল, তার একটি পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত গীতাবলীতে। তাঁর রচনার সংখ্যা অবশ্য অল্প এবং তার কারণও স্পষ্ট। গান-রচনার অনুকূল পরিবেশ তাঁর জীবনে না থাকায় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে জীবনের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় আর তা সম্ভব ছিল না। যে মানসিক অবস্থায় তিনি গান কয়টি রচনা করেছিলেন, তা তাঁর তুল্য প্রতিভাধর এবং সঙ্গীতবিদ্ কবিপ্রাণের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর গানগুলি রচনার তারিখ সঠিক-ভাবে জানা না গেলেও, বেশির ভাগই তাঁর পরিব্রাজক-জীবনের পূর্বে রচিত। বিশেষ তাঁর শ্রেষ্ঠ গান 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি

শশাঙ্ক সুন্দর' এবং 'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা' ১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। সংখ্যায় অধিক না হলেও তাঁর গান ক'টি রচনার উৎকর্ষতায় ও সঙ্গীত হিসাবে অতি উচ্চাঙ্গের এবং স্বামীজির প্রতিভার উপযুক্ত নিদর্শন। গানগুলি তিনিই প্রথম গেয়েছিলেন রচনা করবার পর এবং সুর সংযোজনাও তাঁর।

স্বামীজির রচিত গান একাধারে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর সাধনভাবের বাহক এবং তাঁর গীতশিল্পীসত্তার পরিচায়ক। গানের মাধুর্য এবং সাঙ্গীতিক মূল্য, শোনবার সময়ে ধারণা করা যায়। তাঁর একটি গানের প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত ['শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী'] বিবরণ উদ্ধৃতিযোগ্য : 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর' এই গানটি স্বামীজি এই সময় রচনা করেন। গ্রীষ্মকাল, প্রাতে গিরীশবাবুর বাড়িতে স্বামীজি গিয়াছিলেন এবং উপরকার ছাতের গরাদের কাছে বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গানটি গাহিতেছিলেন। অতুলবাবু [গিরীশবাবুর ভাই] জিজ্ঞাসা করিলেন : 'হ্যাঁ হে, এ গানটা নতুন দেখছি যে, কার বাঁধা? মেজদাদার [গিরীশবাবুর] নয় ত?' নরেন্দ্রনাথ কোন কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অতুলবাবু বলিলেন : 'ওহে, ভাল করে একবার গাও না!' শুনিয়া মোহিত হইয়া অতুলবাবু বলিলেন : 'এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড় লোক—এই একটা গানের জন্যে সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে'। নরেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন এবং কিছুই বলিলেন না। অতুলবাবুর গানটা এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সকলকেই কাহার রচিত গান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে শরৎ মহারাজ ইহা নরেন্দ্রনাথের রচিত বলিয়া দিলেন। অতুলবাবু নরেন্দ্রনাথের তীব্র মেধাশক্তিতে আগেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই গানটিতে যে নরেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও উপলব্ধি আছে ইহা তাহার ধারণা হইল।

এই বিবৃতি থেকে ধারণা করা যায় স্বামীজির গান শ্রোতাদের মনে কেমন প্রভাব বিস্তার করত।

তিনি নিম্নলিখিত গানগুলি রচনা করেন :

(১) মিশ্র—চৌতাল

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নবরূপধর, নির্গুণ, গুণময় ॥···ইত্যাদি

[গানখানি শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক রূপে গীত হয়]

(২) কর্ণাটি—একতাল

তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা,
বব বোম্ বাজে গাল।···ইত্যাদি

(৩) সাহানা-কানাড়া—সুর ফাঁকতাল

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি ॥···ইত্যাদি

(৪) মূলতান—ঢিমা ত্রিতালী

মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া যানেকো দে।
যানেকো দে রে সৈঁইয়া যানেকো দে (আজ ভালা) ॥···ইত্যাদি

(৫) খাম্বাজ বা বড়হংস—চৌতাল

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায় ॥···ইত্যাদি

(৬) বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক-সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥···ইত্যাদি

সঙ্গীত সম্পর্কে মতামত

এ পর্যন্ত স্বামীজিকে সঙ্গীতজ্ঞের নানা ভূমিকায় দেখা গেল—গায়ক, সঙ্গীত-শিক্ষক, গান-রচয়িতা, সুর-সংযোজক, পাখোয়াজ-বাদক

প্রভৃতি। এবার তাঁর আর একটি পরিচয় দেওয়া হবে। তিনি ছিলেন সঙ্গীত-ভাবুক, তাঁর বিশিষ্ট সঙ্গীত-চিন্তা ছিল। সঙ্গীতবিষয়ে তাঁর এই দার্শনিক দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেইসব রচনা ও পত্রাদি থেকে তাঁর কয়েকটি সঙ্গীতবিষয়ক মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল: 'গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কী ধুম! সে কি আঁকা-বাঁকা ডামাডোল, বত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ! তার ওপর মুসলমান উস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে নাকের মধ্যে দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব। এগুলো শোধরাবার লক্ষণ হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের কথা নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে'। [—ভাববার কথা, পৃষ্ঠা ১০]

সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, এবং যাঁরা তা বোঝেন, তাঁদের নিকট উহা সর্বোচ্চ উপাসনা'। [জনৈক আমেরিকান মহিলাকে লিখিত পত্রাংশে 'পত্রাবলী', দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৭৭]

একদিন তাঁর এক বন্ধুকে পেশাদারের মতন গাইতে শুনে বললেন: শুধু সুর আর তাল বজায় রাখাটাই গানের সব কথা নয়। গান অবশ্যই একটা ভাব প্রকাশ করবে। কৃত্রিম ভঙ্গীতে গাওয়া গান কি কারো ভাল লাগে? গানের ভেতরকার ভাব গায়কের অনুভূতিকে জাগাবে, কথাগুলি পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে হবে এবং সুর ও তালের ওপর ঠিক ঠিক লক্ষ্য রাখতে হবে। যে গান গায়কের মনে অনুরূপ ভাব জাগাতে না পারে; তা গানই নয়'। [Life of Swami Vivekananda, by his Eastern & Western Disciples, pp. 20 থেকে অনূদিত]

মধ্যযুগে [মুসলমান আক্রমণের পূর্বে] হিন্দুজাতির নানা অবনতির দৃষ্টান্ত দেবার সময়ে স্বামীজি বলেন: 'সঙ্গীতে, প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতে আর হৃদয়গ্রাহী গভীরভাব রহিল না, পূর্বে যেরূপ প্রত্যেক সুর স্বতন্ত্রভাবে আপন পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিত, অথচ সম্পূর্ণ ঐক্যতানের সৃষ্টি করিত, তাহা আর রহিল না, সব সুরগুলি যেন নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইল। আমাদের সঙ্গীত নানাবিধ সুরের ডাল-খিচুড়ি স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে; ইহাই সঙ্গীতশাস্ত্রের অবনতির চিহ্নস্বরূপ'। [—ভারতে বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ১৮৮]

'এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া, কর্মবাড়ির কড়ামাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী সুরে—নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবত গুষ্ঠীর সপিণ্ডকরণ করিতেছে।...চোবেজী তীব্র বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন: 'বলি, বাপু হে—ও বেসুর বেতাল কি চিৎকার করছ?' ক্ষিপ্র উত্তর এলো: 'সুর তালের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি।' চোবেজী: 'হুঁ, ঠাকুরজী এমনই আহাম্মুক কি না? পাগল তুই, —আমাকেই ভিজুতে পারিসনি—ঠাকুর কি আমার চেয়ে বেশী মূর্খ?' [—ভাববার কথা, পৃষ্ঠা ৪৩]

সঙ্গীততত্ত্বের ভাষ্যকার ও 'সঙ্গীত-কল্পতরু'

স্বামীজি যে শুধু ক্রিয়া-সিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, সঙ্গীতের তত্ত্ববিষয়েও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সঙ্গীতের একটি ভাষ্য-পুস্তক রচনা করেছিলেন, সেকথা পূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সে বইখানির নাম, 'সঙ্গীত-কল্পতরু'। পুস্তকটির বটতলাস্থিত জনৈক প্রকাশক যুগ্মরচয়িতারূপে নিজের নাম মুদ্রিত করলেও গ্রন্থটি আসলে স্বামীজিরই রচনা। পুস্তকটির অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছে বিপুল সংখ্যক গানের সংকলন, তার মধ্যে স্বামীজির প্রিয় গানগুলি অন্তর্ভুক্ত করা আছে। আর আছে পুস্তকের ভূমিকাস্বরূপ ৯০

পৃষ্ঠাব্যাপী সঙ্গীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়া বিষয়ে একটি রচনা এবং প্রকাশক জানিয়েছেন যে, এটি 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ.' রচিত।

স্বামীজির সঙ্গীতের ঔৎপত্তিক বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান, তাঁর সঙ্গীতচিন্তা, সঙ্গীতের তত্ত্ব ও ক্রিয়াংশের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁর যথোপযুক্ত ধারণা, সঙ্গীতশাস্ত্রে পাণ্ডিত, বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীত-সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ জ্ঞান ইত্যাদির পরিচায়ক এই সঙ্গীত-কল্পতরু গ্রন্থটি। পুস্তকটির আলোচনা অংশে সূচী উল্লেখ করে স্বামীজির বর্তমান সঙ্গীত-প্রসঙ্গের উপসংহার করা হবে। এই সূচীপত্র থেকে বোঝা যাবে, পুস্তকটিতে আলোচিত বিষয়ের পরিধি কত বিস্তৃত :

সঙ্গীত ও বাদ্য। সঙ্গীত পরিমাপক। স্বরগ্রাম। নাম প্রকরণ। উদারা মুদারা তারা। কোমল সুর। তীব্র অথবা কড়ি। হারমণি কম্পন। আরোহ ও অবরোহক্রম। গমক ও মূর্ছনা। গিট্‌কারী। যন্ত্র বাঁধিবার নিয়ম। সেতার। এস্‌রাজ। বেহালা। মৃদঙ্গ। তবলা ও বাঁয়া। গীত। তাল। রাগ ও রাগিনী। চৌতাল। ঝাঁপতাল। সুর ফাঁকতাল। ধাম্বাল। তেওরী। মধ্যমান। আড়াঠেকা। ঠুংরী। ৎিওট। স্বরসাধন। স্বরলিপি। ধ্রুপদ। খেয়াল। টপ্পা। ভৈরব রাগের স্বরলিপি। ভৈরব কাওয়ালীর স্বরলিপি। ছায়ানট, ঝাঁপতাল—স্বরলিপি। ভূপালী, সুর ফাঁকতাল —স্বরলিপি। ইমন কল্যাণ, সুর ফাঁকতাল—স্বরলিপি। কানাড়া আড়া—স্বরলিপি। বাজনা ও বোল্‌। ঠেকা। বাজাইবার অর্থাৎ সঙ্গত করিবার নিয়ম। তেহাই। লয়। বিলম্ব লয়। দ্রুত লয়। বাজাইবার ধ্বনির নিয়ম। আড়ি বাজান। চৌতালের ঠেকা ও বিভিন্ন বোল্‌। সুর ফাঁকতালের ঠেকা ও নানা বোল্‌। আড়া চৌতালের ঠেকা ও বিভিন্ন বোল্‌। ঢিমে তেতালার নানা বোল্‌। আড়াঠেকার নানা বোল্‌। ত্রিতালীর নানা বোল্‌। একতালার ঠেকা ও বিভিন্ন বোল্‌। ত্তিওটের ঠেকা ও বোল্‌। ঝাঁপতালের ঠেকা ও কয়েকটি বোল্‌।

স্বামী বিবেকানন্দের হাস্যরস

অজিতকুমার ঘোষ

মহাপুরুষদের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লঘু হাস্যপরিহাসের প্রতি একটা প্রবণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা জীবনের গুরু ও গভীরভাবে নিমগ্ন থাকেন বলিয়াই বোধ হয় জীবনের হাল্কা ও তরল ছদ্মরূপ ধারণ করিতে মাঝে মাঝে তাঁহাদের ইচ্ছা হয়। আকাশের ঘনীভূত মেঘজাল যেমন সূর্যের সুচিক্কণ আলোকস্পর্শে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, মহাপুরুষদের ভাবগম্ভীর সত্তাও তেমনি হাস্যকৌতুকের বহিরাবরণে এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্তি পরিগ্রহ করে। মানুষের সহজ ও ঘনিষ্ঠ রূপ ধরা পড়ে হাস্যকৌতুকের বাস্তব পরিবেশের মধ্যে। মহাপুরুষদের অমেয় রহস্যঘন সত্তা এই হাস্যকৌতুকের প্রত্যক্ষ উপায়টির মধ্য দিয়াই সাধারণ লোকের ধারণা ও উপলব্ধির সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে। রামপ্রসাদ গভীর ভক্তিভাবে একটা লঘু ও পরিচিত পরিবেশের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধর্মের গুহ্য তত্ত্বগুলি হাল্কা ও সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দও গূঢ় ধর্মতত্ত্ব ও কঠিন জীবনসমস্যা নানাপ্রকার সরস টীকা-টিপ্পনি ও তরল ঠাট্টা-রসিকতার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য জীবনে প্রগাঢ় জ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়ের অদম্য ভাবাবেগের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাঁহার অমূল্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই জাতীয় জীবনের কোনো সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের চিন্তায় অথবা কোনো সাংগঠনিক কাজে ব্যাপৃত হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহার ভাবনাগভীর ও কর্মবহুল জীবনে অলস অবকাশ ও শিথিল বিশ্রাম সুদুর্লভ ছিল। কিন্তু তবুও যে তাঁহার

হৃদয় প্রসন্ন অনুভূতির রসে স্নিগ্ধ এবং তাঁহার গম্ভীর বদনমণ্ডল কৌতুকের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল ছিল, তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। অথচ তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিলে জানা যায়, তাঁহার আন্তরসমুদ্র গভীর ভাব ও চিন্তায় আলোড়িত হইলেও হাস্যকৌতুকের হাল্কা ফেনাগুলি তাঁহার কথাবার্তার মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছে; স্বামীজির হাস্যরসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচনা ও পত্রাবলীর মধ্যে, শিষ্যদের সঙ্গে বহু কথোপকথনে এবং অনুরাগী ভক্তদের স্মৃতিকথার মধ্যে।

স্বামীজির কৌতুকপ্রিয়তা ও পরিহাস-রসিকতা সম্বন্ধে আমরা তাঁহার ভক্ত-শিষ্যদের লেখায় অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি। 'স্বামীজির সহিত হিমালয়ে' নামক পুস্তকে নিবেদিতা লিখিয়াছেন: 'তারপরে পুনরায় কথাবার্তার ভাব বদলাইয়া গেল, এবং কেবল হাসিঠাট্টা, কৌতুক এবং গল্পগুজব চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হাসিয়া অধীর হইতেছিলাম।'[১] স্বামীজি যে কত লঘু বিষয় লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করিতেন তাহা 'স্বামীশিষ্য-সংবাদ'-এর একাধিক স্থানে লিখিত রহিয়াছে। একস্থানে লেখা হইয়াছে: 'প্রথম হইতে স্বামীজি ভারতচন্দ্রকে লইয়া নানা ঠাট্টা-তামাশা আরম্ভ করিলেন এবং তখনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহ-সংস্কারাদি লইয়াও নানারূপ ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ সমর্থনকারী ভারতচন্দ্রের কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাব্যাদি বঙ্গদেশে ভিন্ন অন্য কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ছেলেদের হাতে এ-সব বই যাতে না পড়ে, তাই করা উচিত।'[২] স্বামীজির আর এক শিষ্যের লেখায় আমরা শুনিতে পারিয়াছি, তিনি কিভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্য দিয়া শিক্ষা

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড) পৃঃ ৩১১

২ ঐ ঐ পৃঃ ২১১

দিতেন। সেই শিষ্য লিখিয়াছেন: 'স্বামীজি অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাস্টারের কাছে বসার মতো ছিল না। খুব রঙ্গরস চলিতেছে। বালকের মতো হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন; আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক হইয়া ভাবিত,—ইহার ভিতর এত শক্তি।'[৩] স্বামীজির হাস্যরসসৃষ্টিতে পটুতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার কথোপকথন ও রচিত-সাহিত্য উভয়ের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। তাঁহার কথা ও লেখার মধ্যে তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তার অজস্র নিদর্শন ছড়াইয়া রহিয়াছে। সমসাময়িক ও অন্তরঙ্গ লোক ব্যতীত তাঁহার আলাপ-আলোচনার রস আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য আর কাহারও হয় নাই। ভক্তশিষ্যদের স্মৃতিকথনে তাঁহার হাস্যকৌতুকপ্রিয়তার বিশেষ রূপটি কি ছিল, কিভাবে তিনি শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাঁহার বর্ণনাভঙ্গিটি কিরূপ ছিল, লোকেদের সহিত আলাপ করিবার সময় কি উপায়ে তিনি তাঁহাদের আগ্রহ ও কৌতূহল ঘনীভূত করিয়া অবশেষে কৌতুকের তরল আঘাতে তাহাদিগকে মাতাইয়া তুলিতেন, তাহার টীকা-টিপ্পনি, ঠাট্টা-তামাশা, শ্লেষ-বিদ্রূপ কি বিশিষ্ট রীতিতে প্রকাশ পাইত—সেসব বিষয়ের বিশদ বিবরণ আমরা পাই নাই। শুধু কেবল 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ'-এর ন্যায় দুই-একখানি গ্রন্থে স্বামীজির নিজস্ব উক্তিগুলি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। সেজন্য ঐ স্বল্পসংখ্যক রচনায় তাঁহার ব্যক্তিজীবনের হাস্যরসের নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। কিন্তু হাস্যরসসৃষ্টিতে তিনি যে কতখানি দক্ষ ছিলেন তাহার যথার্থ পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাঁহার নিজস্ব রচনার মধ্যে। 'পরিব্রাজক',

৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড)পৃ: ৩৬৭-৬৮

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'পত্রাবলী' প্রভৃতির মধ্যে আমরা দেখিয়াছি, গভীর তত্ত্ব ও তথ্যমূলক রচনাও তাঁহার হাস্যকৌতুকের বিমল আলোকচ্ছটায় কতখানি সরল ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়াছি যে, তাঁহার রমণীয় রচনাভঙ্গীর মধ্যে হাস্যরস কিভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহার তির্যক মন্তব্যগুলির উপরে কৌতুকের কণাগুলি কিভাবে ঝলমল করিতেছে।

স্বামীজি কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন। সেজন্য পূর্ববঙ্গীয় লোকেদের কথা লইয়া ঠাট্টা-তামাশা করিতে তিনি বেশ মজা বোধ করিতেন। এই বিষয়ে স্বামীজিকে আর একজন ধর্মাবতারের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি হইলেন নবদ্বীপের নিমাই। নিমাই-এর মতই স্বামীজি আমোদপ্রিয় ও চঞ্চলচিত্ত ছিলেন এবং নিমাই-এর মতই তিনি তাঁহার ভক্ত-শিষ্যদের পিছনে লাগিয়া, তাহাদিগকে রাগাইয়া বিব্রত করিয়া মজা পাইতেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গীয় ছিলেন বলিয়া স্বামীজির কাছে তাঁহাকে প্রায়ই নাস্তানাবুদ হইতে হইত। একদিন স্বামীজির জন্য শিষ্য রন্ধন করিতেছিলেন, স্বামীজি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন: 'দেখিস মাছের 'জুল' যেন ঠিক বাঙালদিশি ধরনে হয়'। পূর্ববঙ্গে শব্দের আদিতে যে মহাপ্রাণতা লুপ্ত হয় এবং ও-কার উ-কারে পরিণত হয়, 'জুল' কথাটির মধ্যে তাহারই আভাস দিয়া স্বামীজি এখানে কৌতুক উদ্রেক করিয়াছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থের একস্থানে তিনি পূর্ববঙ্গীয় একটি বহুপ্রচলিত উক্তি উল্লেখ করিয়া বেশভূষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। 'ব্যাতন না জানলে বোত্র অবোত্র বুঝবো ক্যামনে?'[৫] ঠাট্টাচ্ছলে এই উক্তিটি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ঠাট্টা দ্বারাই তিনি একটি গুরু সামাজিক তত্ত্ব বিশদভাবে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ২৩
৫ ঐ ঐ (৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ১৮৫

শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে লইয়া ঠাট্টা করিবার সুযোগ পাইলে: স্বামীজি আর ছাড়িতেন না। একদিন তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিলেন: 'আর এক কথা শুনেছেন, আজ এই ভট্চাজ বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয় খেলি, তাতে তত আসে যায় না,কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি ক'রে খেলি ?'[৬] এই উক্তির মধ্যে হিন্দুধর্মের ছুঁৎমার্গের প্রতি শ্লেষ আছে; কিন্তু কৌতুকসৃষ্টির চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে মিষ্টান্ন-খাওয়া অপেক্ষাও জল খাওয়ার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিবার মধ্যে। শরচ্চন্দ্রের অবিস্মরণীয় চরিত্র সেই টগর বোষ্টমীর একটা কথা এখানে মনে পড়িয়া যায়, 'বিশ বছর ঘর করেছি বটে, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েছি কি ?'

স্বামীজি তাঁহার গুরুভ্রাতা নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সঙ্গেও প্রায়ই হাস্য-পরিহাস করিতেন। গিরিশচন্দ্রের অভিনব নামকরণের মধ্যেই তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তার নিদর্শন রহিয়াছে। গিরিশচন্দ্রকে তিনি ডাকিতেন জি. সি. বলিয়া। গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার ধর্মবিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইত। স্বামীজি ছিলেন জ্ঞানমার্গীয় বেদান্তধর্মে বিশ্বাসী, আর গিরিশচন্দ্র ছিলেন নির্বিচার ভক্তিবাদী। গিরিশচন্দ্রের এই অন্ধ ভক্তিবাদ লইয়াও তিনি কম ঠাট্টা-তামাশা করেন নাই। একদিন তিনি ঠাট্টা করিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন: 'কি জি. সি., এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কিষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে'।[৭] অবশ্য স্বামীজির পরিহাসে কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার মত বিসর্জন দেন নাই।

স্বামীজির কথাবার্তার মধ্যে নানা সরস ও শাণিত মন্তব্যের মধ্য দিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মন্তব্যগুলি একটু তির্যক ও শ্লেষাত্মক

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ১২৩
৭ ঐ ঐ পৃঃ ৪৩

রূপ ধারণ করিত। গোরক্ষিণী সভার জনৈক প্রচারক একদিন স্বামীজির কাছে আসিয়া বলিলেন: 'গরু আমাদের মাতা।' এই কথার উত্তরে স্বামীজি যাহা বলিলেন তাহা বিশেষ উপভোগ্য। তিনি বলিলেন: 'হাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি —তা' না হ'লে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?'[৮] ধর্মসাধনার পূর্বে যে ক্ষুধা-নিবারণ প্রয়োজন তাহা বুঝাইতে যাইয়া স্বামীজি একদিন যে সরস উক্তি করিয়াছিলেন তাহাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ যরা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন: 'ওরে, ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম'।[৯] পেটকে কূর্মাবতারের সঙ্গে তুলনা করিয়াই তিমি এখানে কৌতুকরস সৃষ্টি করিয়াছেন। কথার ঈষৎ বিকৃতির মধ্যে অনেক সময় অর্থের গুরুতর ব্যবধান ঘটিতে পারে। স্বামীজিও প্রায়ই কোনো শব্দকে এমনি-ভাবে বিকৃত করিয়া গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে লঘু রসের সঞ্চার করিতেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার নাম তিনিই দিয়াছিলেন, অথচ একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি শিষ্যকে এই পত্রিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার সময় পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, 'উদ্বোধন দেখেছিস'?[১০] ওকাকুরাকে (Okakura) তিনি বলিতেন 'অক্রুর খুড়ো'।[১১]

স্বামীজির লিখিত রচনার মধ্যে হাস্যরসের উপাদান যথেষ্ট রহিয়াছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার ভাষার মধ্যে তাঁহার রৌদ্রকরদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সর্বত্র বিরাজ করিতেছে। সেই ভাষা তাঁহার সত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্ম হইয়া রহিয়াছে। উহাতে তাঁহার এমন একটি স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরঙ্গতা ও সহজ অকৃত্রিমতা রহিয়াছে যে তাহা পড়ামাত্রই আমরা লেখকের প্রতি এক অনিবার্য আকর্ষণ

৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ৯
৯ ঐ ঐ পৃঃ ১৩৩
১০ ঐ ঐ পৃঃ ১৭৩
১১ ঐ (৮ম খণ্ড), পৃঃ ২০০

বোধ করি এবং তাঁহার বিষয়বস্তু ও রসসৃষ্টির সহিত একাত্ম হইয়া পড়ি। সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত যিনি ছিলেন তিনি চিঠিপত্রে ও প্রবন্ধে তদ্ভব-শব্দ ও বাগ্‌রীতি আশ্রয় করিয়া তাঁহার ভাষার মধ্যে এক অপূর্ব স্বাভাবিকতা ও সাবলীলতা সঞ্চার করিলেন। তাঁহার একখানি পত্র হইতে এই ভাষার নিদর্শন দেওয়া হইল : তোমার ঠ্যাঙ জোড়া লেগেছে শুনে খুশী আছি এবং বেশ কাজ ক'রছ তাও শুনছি। ···আমার শরীর ঠিক চলছে না। মোদ্দা কথা, আমারও আতুপুতু করলেই রোগ হয়। রাঁধছি, যা-তা খাচ্ছি, দিনরাত খাটছি, বেশ আছি, খুব ঘুমুচ্ছি' ॥[১২]

উপরি-উদ্ধৃত ভাষার মধ্যে বোধ হয় 'শরীর'-শব্দটি ছাড়া আর কোন তৎসম শব্দই নাই। এই ধরনের ভাষায় পত্রের দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা সরস ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চিঠি-পত্রের অনেক স্থলে তিনি তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ উপরি উক্ত পত্রখানার মধ্যেই তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। যথা : Awakened ('প্রবুদ্ধ ভারত')-ও ঘুমিয়েছে বুঝি? আমায় তো আর পাঠায় না। যাক, দেশে তো 'পিলগ হইছন্তি—কে আছে, কে নেই রে রাম !!' 'Awakened' কথাটির শব্দগত অর্থ ধরিয়া তাহার বিপরীত শব্দ 'ঘুমিয়েছে'-র ব্যবহার এবং পরিহাসচ্ছলে 'পিলগ হইছন্তি'-এরূপ উৎকলী বাক্য প্রয়োগের মধ্য দিয়া স্বামীজি এখানে কৌতুকরস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন।

স্বামীজির 'পরিব্রাজক' গ্রন্থখানিকে ভ্রমণ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যায়। গ্রন্থখানির মধ্যে জায়গার বর্ণনার সহিত বিভিন্নপ্রকার নর-নারীর ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বহু বিচিত্র ও সরস মতামত প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে হাস্যরসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। এই হাস্যরস উদ্ভূত

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ৮৯

হইয়াছে লেখকের তির্যক সমালোচনার দৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত জগৎ ও মানবচিত্রের মধ্যে এবং তাঁহার শাণিত বাগ্‌চাতুর্যের মধ্যে। সিংহলীদের চেহারার বর্ণনা দিতে যাইয়া তিনি তাঁহার শ্লেষাত্মক, সূচীমুখ বর্ণনাকে কিভাবে সরস করিয়া তুলিয়াছেন তাহার একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : 'ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল !! রাম বলো—ঘাগরা-পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমানুষি চেহারা! আবার —রোগা-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম শরীর। এরা রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে—বাঙলা দেশ থেকে এসেছিল— তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠি হ'য়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন—ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্নমেণ্ট কি ঘুমুচ্ছে গা?'[১৩]

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে সিংহলীর কথা বলিতে যাইয়া লেখক অলস, বিলাসী, মেয়েলিভাবাপন্ন বাঙালী যুবকদের প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

নেটিভদের প্রতি সাহেবদের ঘৃণা এবং সাহেবদের খোসামোদ ও অনুকরণ করিবার দাস মনোবৃত্তিও স্বামীজির হাতে বহুস্থানে তীব্র কষাঘাত লাভ করিয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল: 'দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় ক'রে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ! পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কব্‌লা।

১৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ৮৮

'সাধ ক'রে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত'। ধন্য ইংরেজ সরকার! তোমার 'তখৎ তাজ অচল রাজধানী' হউক'।

স্বামীজি তাঁহার কথা ও লেখার বহুস্থানে অনেক সরস গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। এই গল্পগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচিত্র সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি এ-ধরনের গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত গঙ্গাকে পাঁঠা মানা প্রসঙ্গে স্বামীজি এমনি একটি গল্প বলিয়াছেন। গল্পটি এই: 'কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ি যায়; সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও'। জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, 'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে। এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা, শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।'[১৪]

স্বামীজি তাঁহার লেখায় শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসের চাতুর্য দেখাইয়া অনেক স্থানে হাস্যরস উদ্রেক করিয়াছেন। তদ্ভব শব্দগুলিকে সমাসবদ্ধ করিয়া যে কিরূপ হাস্যরসাত্মক করা যায় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল: 'কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিংবা পানের পিকবিচিত্রিত দ্বালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে—আঁবকাঠের তক্তায় ব'সে, থেলো হুঁকো টানতে

১৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড) পৃঃ ৭৬

টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে—হুবহু ছবিগুলির চিত্রিত করে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা'।[১৫]

সাধারণ বস্তু লেখকের উদ্ভট কল্পনাস্পর্শে এবং নানা অতিশয়িত ভাষার আড়ম্বর ও অলঙ্কার প্রয়োগে কিরূপ কৌতুকরসাত্মক হইয়া উঠে তাহার দৃষ্টান্ত স্বামীজির লেখার অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের গোড়াতেই জাহাজে সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ারব র্ণনার কথাই ধরা যাকঃ 'আমরা কাঠের বাড়ির মধ্যে বন্ধ হ'য়ে, গুছল-পাছল ক'রে, খোঁটা খুঁটি ধ'রে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস-রাক্ষুসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্ছি! খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখেশুনে তু-ভাষার তো আক্কেল গুড়ুম। . ভাষা থেকে থেকে সিটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ ক'রে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায় - ভাষা একটু নধরও আছে কিনা'।[১৬]

স্বামীজি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও সামাজিক রীতিনীতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে কতখানি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন সে-সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সামাজিক মতামত বোধ হয় সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক প্রকাশ লাভ করিয়াছে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' নামক গ্রন্থে। গ্রন্থখানির মধ্যে আমাদের সমাজ ও পাশ্চাত্ত্য সমাজের বহু দোষত্রুটি, বহু ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য সমাজের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া তিনি সে-সমাজের ভালো ও মন্দ উভয় দিক সম্বন্ধেই

---

১৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ৫৯-৬০

১৬ ঐ ঐ পৃঃ ৬০

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্যভাববিলাসী দেশী সমাজের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে তিনি সেজন্যই তীব্র বিদ্রূপে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। লেখক প্রাচীন ও সনাতন-ভাবাদর্শ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্য বলিষ্ঠ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মত এত তীব্র জোরালো যে, বিপক্ষবাদীদের প্রতি তাঁহার ধিক্কার অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন: ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস. সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারেননি, ও কি এখন পাদ্রী-ফাদ্রীর কর্ম !! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন ?[১৭]

১৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ১৫১

মিশিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত বৃহৎ শহর শিকাগোয় তখন বিরাট বিশ্বমেলা [world's fair] বসিয়াছে। চতুর্দিক হইতে অসংখ্য নরনারী আসিয়া ভিড় করিয়াছে। সেই অপরিচিত, জনাকীর্ণ শহরে নিঃসঙ্গ স্বামীজি বিমূঢ়, উদ্‌ভ্রান্ত বালকের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জিনিসপত্রের তদ্বির করা, অদ্ভুত পরিচ্ছদের দরুন কৌতূহলী বালকগণের বিদ্রূপ, উপহার, কুলীদের অসদ্ব্যবহারে মজুরী দাবি ··সব মিলিয়া স্বামীজিকে বেশ বিব্রত করিয়া তুলিল, তিনি অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন।

বিশ্বমেলা দেখিয়া স্বামীজি বিস্ময়ে নির্বাক্। পাশ্চাত্ত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও ক্ষমতার আশ্চর্য সমাবেশ। কী বিপুল আয়োজন! সর্বত্র প্রাণের প্রাচুর্য, উদ্ভাবনী প্রতিভার বিকাশ ও শক্তির আবেদন তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। দুই চক্ষু ভরিয়া তিনি দেখিলেন, জনতার বিরাট কোলাহল, চাঞ্চল্য ও উন্মাদনার মধ্যে মানুষের আত্মবিশ্বাসের কী বিরাট অভিযান, জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করিবার কী অপরিসীম প্রয়াস! সবই তাঁহার কল্পনার অতীত, অভিনব।

ইতিমধ্যে একদিন ধর্মমহাসম্মেলন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বামীজি জানিতে পারিলেন, সেপ্টেম্বরের পূর্বে সভার অধিবেশন হইবে না, যথাযথ পরিচয়পত্র ব্যতীত কেহ ঐ সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে না, এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষ তারিখও গত হইয়াছে। মুহূর্তমধ্যে তাঁহার সমস্ত কল্পনা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্যই সুদূর ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার আগমন। অথচ তাঁহার সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র নাই। এই নূতন মহাদেশে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত এক পথিক মাত্র।

ভারতবর্ষে যাঁহারা তাঁহার বিদেশ-যাত্রায় উত্তোগী হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, উৎসাহ দিয়াছেন—সেই মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, রাজা, মহারাজা, দেওয়ান প্রভৃতি কেহই, এমন কি স্বামীজি নিজেও ধর্মমহাসভার বিস্তৃত বিবরণ লওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। যেন শিকাগো শহরে একবার উপস্থিত হইতে পারিলেই সব ব্যবস্থা আপনিই হইয়া যাইবে। বহু পরে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছিলেন, 'জাগতিক বিষয়ে স্বামীজি স্বয়ং যেমন ছিলেন অনভিজ্ঞ, তাঁহার শিষ্যগণও ছিলেন তদ্রূপ। হিন্দুধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিদেশ-যাত্রার উত্তোগে তিনি দৈবাদেশ লাভ করিয়াছেন, এই বিষয়ে একবার নিশ্চয়তা অনুভব করিবার পর তিনি আর কোন অসুবিধা বা বাধা দেখিতে পান নাই।'

বহুবার স্বামীজির মনে হইল, স্বদেশে ফিরিয়া যান ; কিন্তু তিনি তো স্বেচ্ছায় আসেন নাই, ভগবানের আদেশ পাইয়া আসিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র। 'শত শতবার মনে হইয়াছিল, এদেশ হইতে চলিয়া যাই, কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে। মরি-বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।'

ইতিমধ্যে অন্যতম বিপদ দেখা দিল। আমেরিকা ধনীর দেশ। অধিবাসিগণ জলের মতো টাকা খরচ করে। জিনিসপত্রের মূল্য অসম্ভব। প্রতিদিন তাঁহার এক পাউণ্ড করিয়া খরচ হইতে লাগিল। শীতের উপযুক্ত পোশাক প্রস্তুত করা আবশ্যক এবং উহা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। এইভাবে চলিলে সঙ্গের সম্বল শীঘ্রই নিঃশেষ হইবে বুঝিলেন। শিকাগো অপেক্ষা বস্টনে খরচ কম হইবার সম্ভাবনা জানিয়া স্বামীজি বস্টনে যাওয়াই স্থির করিলেন।

'আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু তো সব দেখিতেছে'—সত্যই ঈশ্বরের চক্ষু তাঁহাকে অনুসরণ

করিতেছিল। বস্টনে যাইবার ট্রেনে এক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত পরিচয় হইল। মহিলার নাম কেট স্যানবর্ণ। তিনি বিদুষী, লেখিকা ও উৎসাহদীপ্তা। স্বামীজির আলখাল্লা ও পাগড়ির সহিত ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারায় আকৃষ্ট হইয়া বস্টনের নিকটস্থ মেটকাফ্ পল্লীর কাছে 'ব্রিজি মেডোস' নামক তাঁহার গৃহে তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ করিলেন। অতঃপর আলখাল্লা ও পাগড়িধারী এক ভারতীয় 'যোগী'কে দেখাইবার জন্য তিনি উৎসাহের সহিত আত্মীয় ও বন্ধুগণকে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। 'ব্রিজি মেডোস' হইতে স্বামীজি লিখিতেছেন, 'এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, আমার প্রত্যহ এক পাইণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন !!!'

'ভারতাগত অদ্ভুত জীব'কে দেখিবার জন্য উৎসুক কৌতূহলী দর্শকবৃন্দের অনেকেই কিন্তু পরিচয়ের পর বুঝিলেন, পোশাক অদ্ভুত হইলেও ব্যক্তি অসাধারণ। মেটকাফ্ রমণী-কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস জনসন তাঁহাদের মধ্যে একজন। ২২শে আগস্ট তাঁহার অনুরোধে স্বামীজি ঐ কারাগারের অধিবাসিগণের নিকট ভারতের রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

কেট স্যানবর্ণ স্বামীজিকে বস্টনে লইয়া আসেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপযুক্ত পরিচ্ছদ ক্রয় করা। 'এখানে যদি বেশীদিন থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব পোশাক চলিবে না। রাস্তায় আমাকে দেখিবার জন্য শত শত লোক দাঁড়াইয়া যায়।' বস্টনে এক মহিলা-সভায় স্বামীজি বক্তৃতা করেন। আমেরিকায় নারীজাতির প্রাধান্য। তাঁহারাই স্বামীজির পোশাক সম্বন্ধে নানা পরামর্শ দিলেন। স্থির হইল, কেবল বক্তৃতার সময় তিনি গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ি পরিধান করিবেন। অন্য সময় কালো রঙের লম্বা কোট পরিতে হইবে।

কেট স্যানবর্ণের এক জ্ঞাতি ভাই প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, লেখক ও বহু

প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট মিঃ ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন স্যানবর্ণ একদিন কৌতূহলী হইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, হিন্দু সাধককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঠকিবার বয়স তাঁহার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কৌতূহল শীঘ্রই আগ্রহে পরিণত হইল। হিন্দু সাধকের সঙ্গ তাঁহাকে অপরিসীম আনন্দ দান করিল। স্যানবর্ণদিগের নিকট হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা জানিতে পারিয়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জে. এইচ্. রাইট্ আগ্রহের সহিত এনিস্কোয়ামস্থিত তাঁহার পল্লীভবনে স্বামীজিকে আমন্ত্রণ করেন। অতিথির পাণ্ডিত্য, প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব মনীষী অধ্যাপককে বিস্মিত করিল। তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, এই হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতম ব্যক্তি। স্বামীজি জানাইলেন, পাশ্চাত্ত্যে তাঁহার আগমন ঐ উদ্দেশ্যে, কিন্তু তিনি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি, তাহার নিদর্শনস্বরূপ কোন পরিচয়পত্র তাঁহার নিকট নাই।

উত্তরে অধ্যাপক হাসিয়া বলেন, 'To ask you, Swami, for your credentials is like, asking the sun to state its right to shine' - স্বামীজি, আপনার নিকটে পরিচয় চাওয়া, আর সূর্যকে তার কিরণ দেবার অধিকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করা, একই কথা।

অধ্যাপক রাইট্ আগ্রহের সহিত মহাসভা সংশ্লিষ্ট তাঁহার এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়া স্বামীজির হাতে দিলেন। অন্যান্য কথার সহিত ঐ পত্রে লেখা ছিল, 'ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সকল বিজ্ঞ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য একত্র করিলেও ইঁহার পাণ্ডিত্যের সমকক্ষ হয় না।' প্রাচ্যদেশ হইতে সমাগত ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসস্থানের ভার যে কমিটির উপর ন্যস্ত ছিল, তাহাদের নিকটেও অধ্যাপক পত্র দিলেন।

এনিস্কোয়াম হইতে সালেমে ১৬৬ নর্থ স্ট্রীটে মিসেস কেটি ট্যানেট

উড্‌এর বাড়িতে স্বামীজি কিছুদিন বাস করেন। মিসেস উড্‌ ছিলেন বিদুষী, কয়েকখানি পুস্তকের রচয়িত্রী। নানা বিষয়ে বক্তৃতাদিও দিতেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র স্বামীজির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। মহাসভার অধিবেশনের পর বক্তৃতাভ্রমণকালে স্বামীজি পুনরায় মিসেস উড্‌এর বাড়ি আসেন। সালেমে 'থট অ্যাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাব' কর্তৃক আহূত সভায় স্বামীজি বক্তৃতা দেন। মিসেস উড্‌ তাঁহার উদ্যানে স্থানীয় বালক-বালিকাগণ ও তরুণদের লইয়া একটি ক্ষুদ্র সভার আয়োজন করেন। স্বামীজি ঐ সভায় ভারতীয় বালক-বালিকা সম্পর্কে কিছু বলেন। সারাটোগায় [Saratoga] মিঃ স্যানবর্ণের উদ্যোগে 'আমেরিকান সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন'এ প্রদত্ত বক্তৃতায় স্বামীজি যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতে রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার।' বস্তুতঃ যে কোন বিষয় লইয়া বক্তৃতা দিবার আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁহার ছিল। আমেরিকাবাসীদের সহিত পরিচিত হইবার কোন সুযোগই তিনি উপেক্ষা করিতেন না। স্থানীয় গীর্জাগুলিতেও তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন।

একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য—এই সংবাদে যথেষ্ট নূতনত্ব ছিল। তাঁহার গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়িও ছিল দর্শনীয়। সুতরাং ঐ অঞ্চলে তাঁহার আগমনে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কী মহিমময় তাঁহার আবির্ভাব! স্বামীজির প্রস্থানের পর ২৯শে আগস্ট [১৮৯৩] এনিস্কোয়াম হইতে অধ্যাপক রাইটের স্ত্রী লিখিতেছেন, 'আমরা এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে ছিলাম। মনে হয়, আমার শেষপত্রে উল্লেখ করেছি যে, কেট স্যানবর্ণ একজন হিন্দু সাধককে ধরে এনেছে। জন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বস্টনে গিয়েছিল এবং সেখানে দেখা না হওয়ায় তাঁকে এখানে আমন্ত্রণ করে। শুক্রবার তিনি আসেন। লম্বা ঢিলে গেরুয়া পোশাকে তাঁকে দেখে সকলে চমৎকৃত। তাঁর আবির্ভাব এক সমারোহের দৃশ্য। তাঁর মাথায়

গঠনভঙ্গিমা অনুপম, এবং আকৃতি প্রাচ্য ধরনে অতি সুদর্শন। বয়সের দিক থেকে মাত্র ত্রিশ বৎসরের হলেও মানবজাতির সভ্যতার দৃষ্টিতে তিনি বহু বৎসরের প্রাচীন। সোমবার পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। এ পর্যন্ত আমি যত লোকের সংস্পর্শে এসেছি, তাদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি। সারাদিনরাত আমরা কথা বলতাম, পরদিন সকালে আবার উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা শুরু হ'ত। সমস্ত শহরে তাঁকে দেখবার জন্য প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রধানতঃ ধর্মই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়।···এ যেন পুনর্জাগরণ। বহুদিন আমি এভাবে কোন বিষয় নিয়ে তন্ময় হয়ে যেতে পারিনি।'[১]

স্বামীজির পরিচ্ছদ আমেরিকাবাসীর চোখে অদ্ভুত ঠেকিলেও তাঁহাকে সকলে 'রাজা' বলিয়া মনে করিত। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে 'রাজা' বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ থাকিত। তাঁহার আকৃতি ও বক্তৃতার বিবরণের সহিত সংবাদপত্রগুলির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

'হিন্দু সন্ন্যাসী একজন উচ্চদরের বক্তা, শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন', 'ভিন্নধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি সন্ন্যাসী অত্যন্ত সহৃদয়, এবং যাঁহারা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার বাণী সৌজন্যপূর্ণ', 'বক্তার বলিবার ধরন চমৎকার, উচ্চ শিক্ষিত···প্রাচ্য পোশাকে তাঁহার আকতি দর্শনযোগ্য।'

স্বামীজির উদার, অসাম্প্রদায়িক মতবাদে অধ্যাপক রাইট ও অন্যান্য উদারপন্থী ব্যক্তিগণ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামীজি লিখিয়াছেন, 'একটি জিনিস দেখিতে পাইতেছি, ইঁহারা আমার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছেন।' কিন্তু সকলেই তাঁহারি প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন না। স্থানীয় গীর্জাগুলিতে বক্তৃতা দিবার সময়ে তাঁহাকে বহু

১ Swami Vivekananda In America :
New Discoveries, p.20

প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, এবং ঐ প্রশ্নগুলির পশ্চাতে উদার ও সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব ছিল না। ধর্মমহাসভার অধিবেশনান্তে আমেরিকায় অবস্থানকালে বিরুদ্ধপক্ষের বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিকূল আচরণের অতি অল্পই স্বামীজির পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।

নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামরত স্বামীজি মুহূর্তের জন্যও তাঁহার মাতৃভূমিকে বিস্মৃত হন নাই। ভারতত্যাগের পূর্বে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর হৃদয় স্বদেশের দুঃখে জর্জরিত ছিল। জাপানের অগ্রগতি ও উন্নতির প্রচেষ্টা সে হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল। আমেরিকার জনসাধারণের অভাবনীয় প্রগতিশীল জীবনযাত্রা, অপরিমেয় সম্পদ তাঁহাকে বিস্ময়ের সহিত কতখানি বেদনা দিয়াছিল —তাঁহার পত্রেই তাহা প্রকাশ: 'কাল রমণী-কারাগারের অধ্যক্ষ মিসেস জন্‌সন্ মহোদয়া এখানে আসিয়াছিলেন। [এখানে কারাগার বলে না, বলে সংশোধনাগার।] আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অত্যদ্ভুত জিনিস। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়। কী অদ্ভুত, কী সুন্দর! তোমাদের না দেখিলে বিশ্বাস হইবে না। ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কী ভাবিয়া থাকি! ...রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব।'

স্বদেশে ভ্রমণকালে রাজা, মহারাজা, দেওয়ান ও ধনী ব্যক্তিদিগের সংস্পর্শে তিনি যখনই আসিয়াছেন, দেশের প্রকৃত অবস্থার প্রতি

তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের সহিত তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সমাজের অধিকাংশ মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ বিলাস-মগ্ন, জনসাধারণ বা দেশের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। 'বেশ সুখী তাহারা! তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে সমুত্থিত শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের যে কাতরধ্বনিতে ভারতাকাশ সমাকুল হইয়াছে, তাহাতেও তাহাদের মানুষ সম্বন্ধে স্বপ্নবিলাসের ব্যাঘাত হয় না।'

মাদ্রাজের কতিপয় নিঃস্বার্থ যুবক স্বামীজির মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, এবং তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ঐরূপ উৎসাহী আদর্শবান্ যুবকগণই দেশের প্রকৃত ভরসাস্থল। '...হে মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িত-দের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।' মাদ্রাজবাসী যুবকগণকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ভারতের সমগ্র যুবশক্তিকেই আহ্বান করিয়াছেন।

আমেরিকায় আগমন পর্যন্ত স্বামীজি আর একটি অবস্থার সম্মুখীন হইলেন। তাহা হইল, তাঁহার স্বদেশে সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীর ভ্রান্ত ধারণা। অজ্ঞতা, কুসংস্কার কোন্ দেশে নাই! কিন্তু মিশনারী-সম্প্রদায় ও বিদেশী পর্যটকগণ ভারত সম্বন্ধে যে মিথ্যা ও কুৎসা রটনা করিয়াছিল, তাহার ভয়াবহ পরিচয় পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও সময় সময় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। ঐ সময় তাঁহার কথাগুলি যেন অগ্নিবর্ষণ করিত এবং শ্রোতৃবৃন্দকে ভীত করিয়া তুলিত। বস্টন ও উহার উপকণ্ঠে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে 'ধর্ম' সম্বন্ধে আলোচনার সহিত 'পৌত্তলিকতা, সতীদাহ, নারীজাতির হীন অবস্থা, হিন্দু রমণী কর্তৃক নদীগর্ভে কুমীরের মুখে সন্তান নিক্ষেপ, জগন্নাথের চাকার তলায় আত্মহত্যা প্রভৃতি বহু প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তাঁহাকে ভারতীয় রীতি-নীতি ও সামাজিক প্রথাগুলির প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করিতে হইত। উপসংহারে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেন, তাঁহার বিদেশ-

আগমনের উদ্দেশ্য স্বদেশের জন্য অর্থ সংগ্রহ, ভারতবর্ষে ধর্মের অভাব নাই—অভাব অর্থের। আমেরিকা ভারতে ধর্ম-প্রচারক প্রেরণের পরিবর্তে বাণিজ্য ও শিল্প শিখাইবার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রেরণ করিলেই যথার্থ উপকার করা হইবে।

তাঁহার সাড়ে তিন বৎসর আমেরিকা অবস্থানকালে বহু বক্তৃতাসভায় ও ঘরোয়া বৈঠকে স্বামীজিকে উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইয়াছে। হিন্দু রমণীরা কুমীরের মুখে সন্তান নিক্ষেপ করে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি একবার এক মহিলাকে বলেন, 'হাঁ মহাশয়া, একথা সত্য, আমাকেও ঐভাবে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু আমি এত হৃষ্টপুষ্ট ছিলাম যে, কুমীর আমাকে খেয়ে ফেলতে পারেনি। তাই তো আমি আজ এখানে উপস্থিত হ'তে পেরেছি !!' মহাসভার অধিবেশনে যোগদানের পূর্বেই আমেরিকায় তাঁহার স্বল্পকাল বাসের অভিজ্ঞতা হইতে স্বামীজি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখে দুইটি দায়িত্ব; একদিকে ভারতের মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ ঘোষণা, অপরদিকে ভারত সম্বন্ধে আমেরিকায় প্রচারিত কুৎসা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন। ঐ কর্তব্যপালনের জন্য অপূর্ব তেজ ও বীরত্বের সহিত প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় তিনি আমেরিকার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে সংবাদ আসিল ধর্মমহাসভায় স্বামীজিকে প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। অধ্যাপক রাইট্ সাহেবকে স্বামীজি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিলেন। অতঃপর ঐ মাসের ৭।৮ তারিখে তিনি পুনরায় শিকাগো যাত্রা করেন। স্বামীজি যখন শিকাগো স্টেশনে অবতরণ করিলেন, তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ। অবশেষে সব বাধা দূর হইল ভাবিয়া তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, মুহূর্তে উহা অন্তর্হিত হইল। ভয় ও বিস্ময়ের সহিত তিনি আবিষ্কার করিলেন, মহাসভার কার্যস্থলের ঠিকানাসহ কমিটির নিকট অধ্যাপক রাইট্ যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা হারাইয়া গিয়াছে।

দুই-চারিজনকে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না। স্টেশন শহরের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী জার্মান। তাহারা অপরিচিত পথিকের কথা বুঝিতেও পারিল না, এবং তাঁহার প্রতি মনোযোগ দেওয়াও আবশ্যক মনে করিল না। বেশ রাত্রি হইয়া গেল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বামীজি স্টেশনেই প্ল্যাটফর্মে একটি প্রকাণ্ড বাক্সের মধ্যে শুইয়া পড়িলেন। ভারতবর্ষে পরিব্রাজক জীবনে যেমন তিনি বহু রাত্রি বৃক্ষতলে যাপন করিতেন, তেমন ভাবেই বিদেশে অনাহারে, পথশ্রমে ক্লান্ত, অজ্ঞাত, অপরিচিত সন্ন্যাসীর সারারাত্রি কাটিয়া গেল এক বাক্সের মধ্যে। পরদিন প্রত্যূষে হিমশীতল বায়ুর স্পর্শে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গাত্রোত্থান করিয়া তিনি হ্রদের উপকূলবর্তী পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। দুই পার্শ্বে ধনীদিগের সুসজ্জিত বিরাট অট্টালিকাশ্রেণী। পথে লোক চলাচল শুরু হইয়াছে, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহিল না, তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত করিল না। ক্ষুধার্ত স্বামীজি অবশেষে বাড়ির দরজায় আঘাত করিয়া আশ্রয় ও আহার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সহানুভূতির পরিবর্তে লাভ করিলেন রূঢ় প্রত্যাখ্যান। আমেরিকা ধনীর দেশ, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়ার প্রথা নাই—স্বামীজি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ধর্মমহাসভার ঠিকানাটা বলিয়া দিবার অনুরোধ করিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না। কর্মব্যস্ত পাশ্চাত্ত্য জগৎ আপন উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। কাহারও প্রতি তাকাইবার সময় নাই। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত সন্ন্যাসী অবসন্নভাবে পথের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্তে তাঁহার সম্মুখস্থিত অট্টালিকার দ্বার খুলিয়া গেল। 'মহাশয়, আপনি কি ধর্মমহাসভার একজন প্রতিনিধি?'—এই প্রশ্নে নূতন করিয়া স্বামীজি উপলব্ধি করিলেন, ঈশ্বর তাঁহার সহিত সর্বদা রহিয়াছেন। আশ্রয়দাত্রী মহিলার নাম মিসেস জর্জ. ডব্লিউ. হেল। স্বামীজিকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং প্রাতঃরাশ ও

বিশ্রামের পর স্বয়ং তাঁহাকে ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে লইয়া গিয়া সভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। অন্যান্য প্রতিনিধিগণের সহিত তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। সমগ্র হেল পরিবারে স্বামীজি আপনার লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।···

শিকাগো বক্তৃতা

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ। ১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার। বিশ্বের ইতিহাসে যুগ যুগ ধরিয়া এই দিনটির কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। নূতন মহাদেশে এই প্রথম ধর্মমহাসভার আয়োজন, যেখানে খ্রীষ্টান ব্যতীত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী, কনফুসীয় ইস্‌লাম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শিকাগো শহরের আর্ট ইনষ্টিটিউট (Art Institute)-এর বিরাট কক্ষে সভার অধিবেশন হয়। প্রতিনিধিগণ সমারোহের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া সেখানে সমবেত হইলেন। মঞ্চের উপর মধ্যস্থলে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান নায়ক ক্যার্ডিনাল গিবন্‌স্। তাঁহার দক্ষিণে ও বামে বসিলেন প্রাচ্যদেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণ। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বোম্বাইএর নগরকার, জৈনধর্মের প্রতিনিধি বীরচাঁদ গান্ধী, থিওসফিক্যাল সোসাইটির চক্রবর্তী ও অ্যানি বেশান্ত এবং সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি ধর্মপালের সহিত একই সারিতে উপবিষ্ট ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিতে আসেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন ভারতের সমগ্র জনসাধারণের পক্ষ হইতে— সর্বজনীন হিন্দুধর্মের প্রচারকরূপে।

আর্ট ইন্‌ষ্টিটিউটএর সুবৃহৎ হল্ ও গ্যালারি সহস্র সহস্র নরনারীতে পূর্ণ। স্বামীজি লিখিয়াছেন: ‘কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল্, আর উপরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি; তাহাতে আমেরিকার

সুশিক্ষিত সমাজের বাছা বাছা ৬।৭ হাজার নরনারী ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্ল্যাটফর্মের উপর পৃথিবীর সর্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জীবনে কখনও সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে!'

স্বামীজির বয়স তখন সবে ত্রিশ পূর্ণ হইয়াছে। উজ্জ্বল বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি, সমুন্নত দেহ, সুন্দর মুখমণ্ডল, সুদীপ্ত চক্ষু। তাঁহার পরিধানে ছিল দীর্ঘ গৈরিক পরিচ্ছদ, মস্তকে বিরাট গৈরিক পাগড়ি। যোদ্ধার ন্যায় দৃপ্ত ভঙ্গিতে উপবিষ্ট সে মহিমময় মূর্তির প্রতি সকলের দৃষ্টি পূর্বেই আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বেলা দশটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে অর্গ্যানের গম্ভীর সুরের সহিত সমবেত প্রার্থনা-সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সঙ্গীতের পর ক্যার্ডিনাল গিবন্‌স্ প্রার্থনা করিলেন। তারপর এক এক করিয়া প্রতিনিধিগণের পরিচয় ও তাহাদের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং কোনো অসুবিধা হইল না। স্বামীজি ইতিপূর্বে ছোটখাট সভায় বক্তৃতা দিলেও এই বিরাট সভা তাঁহার কল্পনার অতীত ছিল। সভাপতি যখন তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিলেন, তিনি 'পরে বলিব' বলিয়া এড়াইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি লিখিতেছেন, '...আমার বুক দুর্ দুর্ করিতেছিল, জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্বাহ্ণে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্তী আরও সুন্দর বলিলেন, খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি নির্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছুটা আকৃষ্ট হইয়াছিল; আমি আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিলাম।'

'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ'—প্রচলিত রীতির পরিবর্তে স্বামীজির আবেগমথিত কণ্ঠে ঐ সম্বোধন উচ্চারিত হইবামাত্র সহস্র সহস্র শ্রোতা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর পূর্ণ দুই মিনিট ধরিয়া করতালির শব্দ সভাগৃহ মুখরিত করিয়া রাখিল। 'এমন করতালির শব্দ হইতে লাগিল যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়।' সভাগৃহ পুনরায় নিস্তব্ধ হইল। শ্রোতৃবৃন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল ভারতাগত সেই তরুণ প্রতিনিধি কি বলেন শুনিবার জন্য। স্বামীজি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বিবেকানন্দ পৃথিবীর নবীনতম জাতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার ভাষণ ছিল সংক্ষিপ্ত। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন—সনাতন হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন বার্তা, স্মরণাতীতকাল হইতে যে ধর্ম জগৎকে দুইটি শিক্ষা দিয়াছে, 'সমদর্শন, সর্ববিধ মত গ্রহণ'—সকলকে বোঝ! সবাইকে গ্রহণ কর!

শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন,

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

—নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্য হেতু সরল ও বক্র নানা পথ লোকে অবলম্বন করে; তথাপি নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, তেমনি তুমিও সকল মানুষের একমাত্র লক্ষ্য।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

—যে যেরূপ মত আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে অর্জুন, সব মানুষই সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।

বক্তৃতা শেষ হইল। হিন্দু সন্ন্যাসীর গম্ভীর সঙ্গীতময় কণ্ঠের ঝঙ্কার সভাগৃহের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 'যখন আমার বলা

শেষ হইল, তখন আমি হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম।

রোঁমা রলাঁ লিখিয়াছেন, 'অন্যান্য বক্তারাও প্রত্যেকে ভগবানের কথা বলিয়াছিলেন—কিন্তু সে ভগবান ছিলেন তাঁহাদের নিজের সম্প্রদায়ের। কিন্তু বিবেকানন্দ—একা বিবেকানন্দ সকলের ভগবানের কথা বলিলেন, সকলের ভগবানকে বিশ্বসত্তায় মিলাইয়া দিলেন। এ ছিল রামকৃষ্ণের বিশ্বাস, সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাহা তাঁহার মহান্ শিষ্যের মুখ দিয়া নির্গত হইল। ধর্মসম্মেলন সেই তরুণ বাগ্মীপ্রবরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।'

বক্তৃতা শেষ হইবার পর পুনরায় উচ্ছ্বসিত করতালি। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ যেন ধর্ম সমন্বয়ের এই অপূর্ব বার্তা শুনিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। জাতি, বর্ণ, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে সর্বজনীন, উদার ধর্মের জন্য বর্তমান জগতের আকুল আকাঙ্ক্ষাকে স্বামী বিবেকানন্দই ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ আশ্রয় করিয়াই নবযুগের মানুষের ধর্ম বিঘোষিত হইল।

ভারতের অজ্ঞাত, পরিচয়হীন তরুণ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী মুহূর্তমধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যে পরিণত হইলেন। দীপ্তিমান্ ভাস্করের মতো সে আবির্ভাব মহিমময়! তাঁহার প্রশান্ত ললাটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বিজয়টীকা। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। মাতৃভূমির মুখ তিনি উজ্জ্বল করিয়াছেন। হিন্দুধর্মের বিজয়পতাকা জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

'পরিব্রাজক বিবেকানন্দে'র কাহিনী এখানেই শেষ। অবিস্মরণীয় সেই বক্তৃতার পর সভায় উপবিষ্ট সহস্র সহস্র নরনারী যখন তাঁহাকে আবিষ্কার করিল, উদার ধর্মমতের জন্য অভিনন্দন জানাইল, পর্যটক সন্ন্যাসী বুঝিলেন, তাঁহার নিঃসঙ্গ স্বাধীন ভগবৎ-জীবনের অবসান ঘটিল। কোন এক অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহার অজ্ঞাত যাত্রা শুরু হইয়াছিল, ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত

তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন—সে যাত্রার পরিসমাপ্তি। নিজের মনের স্বপ্ন ও কল্পনা লইয়া লোকচক্ষুর অন্তরাল, পরিচয়ের আড়ালে যে সন্ন্যাসী মুক্ত বিহঙ্গমের মতো যথেচ্ছ বিচরণ করিতেন, এখন হইতে তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্য জীবনের বেগবান্ সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়া চলিতে হইবে। ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। 'নরেন লোকশিক্ষা দিবে'—শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইল।

বিজয়লাভে স্বামীজির আনন্দ ছিল না। তাঁহার অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা—হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়ে গভীর ধ্যান-ধারণায় তন্ময় হইয়া থাকিবেন—এই কোলাহলময় নগরীর অতি প্রগতিশীল জীবনযাত্রার সহিত তাহার কী বিরাট পার্থক্য! সেই রাত্রে হোটেলে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজি বালকের মতো কাঁদিয়াছিলেন।

পরদিন হইতে স্বামী বিবেকানন্দ বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। ধর্ম-মহাসভায় তিনি আরও কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব শ্রোতৃবৃন্দ সহিষ্ণুতার সহিত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিত। ১৯শে সেপ্টেম্বর 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত ভাষণ ছিল অপূর্ব। শিকাগোর পথে পথে তাঁহার সুবৃহৎ প্রতিকৃতি জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। বহু পথিক চলিবার সময় 'সন্ন্যাসী বিবেকানন্দে'র প্রতিকৃতির প্রতি নতমস্তকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানাইয়া যাইত। সংবাদপত্রগুলি উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সহিত তাঁহার বিজয় ঘোষণা করিল। সে বিজয়-কাহিনী 'আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ'র, যিনি জগতে শিক্ষাগুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন—যে বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসীর উদারকণ্ঠে সমন্বয় বার্তার ঘোষণা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিতেছে—যিনি পূর্ণ-আত্মপ্রত্যয়ের সহিত দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'I wave a message to the world and that I shall deliver without fear—জগতের কাছে আমার একটি বাণী আছে, এবং নির্ভয়ে আমি উহা প্রচার করিব।'

বাঙালী জাতির উন্নতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন, ভারতভূমি তাঁহার নিকট ছিল পুণ্যভূমি। ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ছিল তাঁহার কাম্য, জীবনের সাধনা। অতীন্দ্রিয় স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান তাঁহার নিকট আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল বলিয়া তিনি পার্থিব সম্পদ গ্রাহ্য করিতেন না, বিলাসসামগ্রী স্পর্শ করিতেন না। জ্ঞান ও মুক্তির পথে আজীবন আত্মনিবেদন করিয়া সাধনমার্গে নিয়ত বিচরণ করিতে যারপরনাই প্রয়াস পাইতেন। মাতৃভূমির প্রতি তীব্র অনুরাগবশতঃ তিনি অকৃত্রিম অধ্যবসায়ের সহিত ভারতীয় ঐতিহ্যের ঐকান্তিক সন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হন। প্রাচীন গৌরবে সমৃদ্ধ মনপ্রাণ লইয়া ভারতীয়গণ কিভাবে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা দেশবিদেশের জনসাধারণকে জানাইতে তিনি বদ্ধপরিকর হন। তাঁহার অমিত সাহস, প্রগাঢ় জ্ঞান, দেশমাতৃকার প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা—তাঁহার এ সাধুসঙ্কল্প জয়যুক্ত করিতে সাহায্য প্রদান করে। তাই তিনি বিলাতে ধর্মপ্রচারার্থ গমন করিলে ধর্মব্যাখ্যার সুনিপুণ ভাষণ, ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্লেষণ, বেদান্তশাস্ত্রের সুললিত আলোচনা, হিন্দুধর্মের মর্মবাণী সরল-সুবিন্যস্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়া ইংলণ্ডবাসীকে বিমুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। তদ্দেশবাসী সকলে তাঁহার বাগ্মিতা, তত্ত্বকথা-পরিস্ফুটনে অসীম প্রজ্ঞা, ধীশক্তি ও বাচনভঙ্গীদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে

ইউরোপখণ্ডে যে সকল বাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বিশ্বপ্রেমে নিবেদিতাত্মা বিবেকানন্দের জগদ্‌বাসীকে মানসিক ও

আধ্যাত্মিক উন্নতির আবেদন ছিল। তিনি নির্ভীকভাবে সকলকে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে বলিতেন। বাঁচিবার দৃঢ়সঙ্কল্প সকলের জাগ্রত করা প্রয়োজন। প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও কর্মকুশলতা অর্জন করা দরকার। স্বকর্মসাধনে দৃঢ় প্রত্যয়, পরসেবা প্রভৃতি অভীষ্ট লক্ষ্যে লইয়া যাইবে। নির্ভীক বীর সন্ন্যাসী বলিতেন: 'কষ্টের মধ্যেও নিজের শক্তি ও সাহস বজায় রাখিতে হইবে। স্বকীয় মনোবৃত্তি সুন্দর ও প্রফুল্ল রাখিতে পারিলে সাফল্য সকল কার্যে জয়মাল্য পরাইয়া দিবে।'

স্বামীজির সহোদর শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজি আমেরিকা হইতে লণ্ডনে গমন করেন। লণ্ডনে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যার আয়োজন হইলে বহু লোকসমাগম হইতে দেখা যাইত। মিস্ মূলার, মিঃ স্টার্ডি প্রভৃতি ৫৭নং সেণ্ট জর্জ স্ট্রীটের ভবনে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলে বহুলোক তথায় উপস্থিত হইতেন। ধর্মব্যাখ্যা তাঁহার ছিল প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। বেলা ১১টা হইতে ১টা পর্যন্ত বক্তৃতার কাল নির্দিষ্ট ছিল। প্রায় মাসাবধিকাল এইভাবে কাটিলে, বক্তৃতার স্থান পরিবর্তিত হইতে দেখা দেখা গেল। সুবিখ্যাত পিকাডেলী স্থানে রয়েল ইনস্টিটিউটের চিত্রশালার একটি রমণীয় কক্ষে (Water Painting Gallery of the Royal Institute) বক্তৃতার আয়োজন হয়। এই বক্তৃতাগুলির নাম দেওয়া হইয়াছিল। 'Class Lectures'। প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত। বেদান্তসূত্র, দর্শনশাস্ত্র, রাজযোগ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিতে করিতে প্রখরমেধা স্বামীজি প্রসঙ্গক্রমে ইতিহাস, বিজ্ঞান, ফিজিক্স, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের নীতিগুলির অবতারণা ও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। পরিশেষে প্রশ্ন করিবার রীতি ছিল। পণ্ডিতপ্রবর স্বামীজি যথাযথ উত্তরদানে সকলকে তখন প্রীত করিতেন।

স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন: '১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর লণ্ডনের 'প্রিন্সেস হল্'-এ এক জনসভায় তাঁর ইংরাজবন্ধুগণ তাঁকে সাড়ম্বরে যে বিদায় অভ্যর্থনা জানান তার কথা আমি কোনোদিন ভুলব না।'

আমেরিকার বেদান্ত সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত কর্ণধার ও ধর্মব্যাখ্যাতা স্বামী অভেদানন্দ আরও বিবৃত করিয়াছেন: 'ইংলণ্ডে সাধারণের কাছে তাঁর [বিবেকানন্দের] সাধনবাণী প্রচার হওয়ার পর অধ্যাত্মমনা লোকদের মনে একটা উদাত্ত সাড়া পড়িয়া যায়। এই ভাষণগুলি প্রথমে ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয় এবং পরে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি সেগুলিকেই 'জ্ঞানযোগ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।' [শ্রদ্ধাভাজন স্বামী অভেদানন্দ-কর্তৃক 'স্বামী বিবেকানন্দ' পৃঃ ১৩ দ্রষ্টব্য]

লণ্ডনের কয়েকটি স্থানে কতিপয় বক্তৃতা ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনার ফলে বিবেকানন্দ ভারতীয় দর্শন ও হিন্দুধর্মের সারকথা এমন সুষ্ঠুভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, তৎকালীন বহু গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। আপামর জনসাধারণকে তিনি বুঝাইলেন অপূর্ব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা কল্যাণের পথে মানব-সম্প্রদায়কে আগাইয়া লইয়া যায়। জীবনে জড়তা আসিয়া দেখা দিলে কর্মপ্রবণতা নষ্ট হইয়া যায়, অন্তরের সৌন্দর্য, কর্মশক্তির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া পড়ে, মানবীয় ঔদার্য ক্ষুণ্ণ হয়। বহির্জগতের বিরাট কোলাহল ও প্রতিকূল আবহাওয়ার ঝঞ্ঝাব্যাত্যার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার উপায় নির্জনসাধনা ও সমাজসেবা। সেকারণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া আর্তত্রাণ ও দুর্গতজনের সেবা পরমার্থ-লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

ইউরোপের বিভিন্নস্থানে জার্মানী এবং সুইজারল্যাণ্ডের শিক্ষিত সমাজকে নির্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন: 'নিরলস অধ্যবসায় গুণে দরিদ্রনারায়ণের সেবা বাঞ্ছনীয়, শিষ্টাচার রক্ষা করিতে গিয়া

সত্যকে ক্ষুণ্ন করিলে চলিবে না। সত্যই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব, সত্যসাধনার উপর অনন্ত সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত। মানবজাতি স্বকীয় স্বার্থসাধনের জন্য আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে চায়, নিজের দুর্বলতা দমন করিতে পারে না, স্বজন-বান্ধবের বিরুদ্ধাচরণ করে,—ফলে আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে।

জার্মানীতে

জার্মানীর একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে তিনি বলিয়াছিলেন: প্রয়োজনবোধে আমরা যে সকল কাম্যবস্তু লাভ করি তাহা প্রকৃতির বুকে সযত্নে সঞ্চিত আছে। রূপরসগন্ধভরা বিচিত্র এ' জগতে যে সকল সুন্দর ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অকৃপণ হস্তে ঢাকিয়া দেওয়া আছে তাহা যথাসম্ভব আহরণ করিয়া অভাব মিটাইতে হইবে। মানবসমাজ হইতে প্রেম-মৈত্রীর সাহায্যে, সহানুভূতি ও অনুরাগের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করিতে হইতে হইবে। পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা বিশ্বজনীন প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া এক সম্প্রদায়, এক মানবজাতির কল্পনা ও সংগঠন দুঃসাধ্য মনে হইবে না। সহযোগিতা, ঐক্যবোধ্য বিশ্বপ্রেমের মূলমন্ত্র। প্রাণের স্পর্শ, হৃদয়ের বিনিময় দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে জগতে তথা ইহসংসারের স্বর্গ রচনা করা যায়।'

গভীর চিন্তাক্ষেত্রে এইপ্রকার অনুশীলন ও সুনিপুণ বিশ্লেষণের ফলে ভারতীয় দর্শনের ও হিন্দুসাধনার মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত বোধ করিলেন। বিশ্রামহেতু শান্তিপূর্ণ নির্জন স্থানে গমনের বাসনা করিতেছেন, এমন সময়ে কয়েকজন বন্ধুর আহ্বান অসিল। ঈশ্বরপরায়ণ বৈদান্তিক বিবেকানন্দ সে আমন্ত্রণ বিধিনির্দিষ্ট নিমন্ত্রণ বলিয়া গণ্য করিয়া আপনার তৃপ্তিলাভ করিলেন। তাঁহার তিনজন বিশিষ্ট সুহৃদের নিকট হইতে আহ্বান-লিপি আসে। তাঁহারা স্বামীজিকে ইউরোপে ভ্রমণ ও অবসর বিনোদনের জন্য

অনুরোধ জানাইলে শিশুসুলভ সরলতাপূর্ণ বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমান ও শ্রীমতী জে. এইচ. সেভিয়ার (J. H. Sevier) এবং কুমারী হেনরিয়েটা মুলার (Miss Henrietta Muller) তাঁহার ইউরোপখণ্ডে ভ্রমণ ও বিশ্রামের পরিকল্পনা স্থির করিয়া স্বামীজির সহিত পরিভ্রমণে সঙ্গ লয়েন। এ প্রস্তাবে স্বামীজি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সম্মতি প্রদান করেন। সুইজারল্যাণ্ড দেখিতে সমধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া স্বামীজি বলিলেন: 'আমি সুমনোহর তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণী ও বিস্ময়কর পার্বত্য পথগুলি দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসিয়া আছি।'

সুইজারল্যাণ্ডে

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষভাগে এক শুভ্র অপরাহ্ণে স্বামীজি বন্ধুগণসমভিব্যাহারে লণ্ডন মহানগরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার ছাত্রবর্গ ও শিষ্যগণ অন্তরের সহিত বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সুন্দর সুইজারল্যাণ্ডের এক নিভৃত পল্লীর মনোরম পরিবেশে স্বামীজি আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক শুভ-মুহূর্তে তিনি একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। এই হৃদ্যতাপূর্ণ পত্রখানি তাঁহার পরিভ্রমণের পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন সাধন করে।

সুইজারল্যাণ্ডের অপূর্ব সুষমামণ্ডিত পল্লীশ্রীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ প্রেমপূর্ণ আহ্বান-লিপিখানি প্রাপ্ত হন স্বনামখ্যাত অধ্যাপক পল ড্যসেনের নিকট হইতে। Paul Deussen [1845-1919] ছিলেন জার্মানী দেশের অন্তঃপাতী কিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক। ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় চিন্তাধারার সুমনোহর অনুবাদ ও সুবিজ্ঞ ব্যাখ্যার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এতদ্ভিন্ন এই মনীষী সোপেনহারের (A. Schopenhauer) একনিষ্ঠ শিষ্য হিসাবে সোপেনহার-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

পল ড্যসেন

অধ্যাপক ড্যসেন কিছুকাল ধরিয়া স্বামীজির বক্তৃতা ও দার্শনিকতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সে কারণে লণ্ডনের ঠিকানায় স্বামীজিকে পত্রযোগে স্বকীয় ভবনে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। স্বামীজিকে তিনি মৌলিক চিন্তার এক মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রতিভাবান পুরুষ মনে করিতেন। তাঁহার নিজের বেদান্তদর্শনের উপর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বলিয়া এবং স্বয়ং সম্প্রতি হিন্দুস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করার জন্য তিনি স্বভাবতই স্বামীজির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে এবং তাঁহার সহিত ভারতীয় দর্শনের কতিপয় দুরূপ সমস্যা আলোচনা করিতে ব্যগ্র হইয়া ওঠেন।

স্বামীজি সেজন্য ইংলণ্ডদেশে ফিরিবার পূর্বে কীয়েল (Kiel) নগরীতে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু তাঁহার গৃহস্বামী বা অভিভাবকগণ তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডে-ভ্রমণ সম্পূর্ণ না করিয়া ছাড়িতে চাহিলেন না এবং বলিলেন কীয়েল-যাত্রা করিবার পূর্বে পথে জার্মানীর আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করা প্রয়োজন।

সেকারণে স্বামীজি তৎপরে পর্যবেক্ষণ করেন শফহ্যান (Schaff-hansen)। এ স্থান হইতে রাইন-নদীর সুদৃশ্য জলপ্রপাত সুন্দর-ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি মুগ্ধনেত্রে দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। অনন্তর তিনজন ভ্রমণকারী হাইডেলবার্গ (Heidelberg) অভিমুখে যাত্রা করেন। এই স্থান প্রসিদ্ধ জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কেন্দ্রস্থল। কীয়েলে দুইদিন অতিবাহিত করিয়া এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় এবং নগরীর উপর প্রাসাদ-দুর্গ অবলোকন করিয়া তাঁহারা কোবলেনজে (Coblenz) আসেন। একরাত্রি এখানে কাটাইয়া পরদিন স্টীমারযোগে ভ্রমণকারিগণ মনোরম রাইন-নদীর উৎপত্তির দিকে গমনপূর্বক কোলন নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মহতী নগরীতে তাঁহারা কয়েকদিন অতিবাহিত

করিতে মনস্থ করেন। পুলকনেত্রে স্বামীজি বিরাট কোলন-গীর্জার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হন ও সেখানের প্রার্থনা-সভায় যোগদান করেন। এই পবিত্র ধর্মস্থান দেখিয়া স্বামীজি প্রীত হইয়াছিলেন।

শ্রীমান ও শ্রীমতী সেভিয়ার [Sevier] তাঁহাদের প্রিয় অতিথিকে [স্বামীজি] কোলন থেকে একেবারে কীয়েল লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি বার্লিন মহানগরী দেখিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁহারা তাঁহার মনস্তুষ্টিবিধান উদ্দেশ্যে পর্যটনতালিকার এক বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এইভাবে স্বামীজির পরিক্রমার প্রসার বাড়িয়া যায় এবং ড্রেসডেন প্রভৃতি নগরীগুলি পরিদর্শন করিয়া স্বামীজি পরম তৃপ্তিবোধ করেন। দেশের সাধারণ সমৃদ্ধি এবং বহুবিধ শহরের অগণিত আধুনিক বাসভবন দেখিয়া তিনি আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। বার্লিন-মহানগরীর সুপ্রশস্ত পথঘাট, সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ, রমণীয় উদ্যান প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বামীজি ইহাকে সুপ্রসিদ্ধ প্যারিস শহরের সহিত তুলনা করিলেন।

ড্রেসডেন তাহার পরবর্তী গন্তব্যস্থান বুঝিয়া স্বামীজি মৃদুস্বরে দ্বিধাপূর্ণভাবে বলিলেন: 'অধ্যাপক ড্যাসেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আমাদের অধিক দিন দেরি করা উচিত হইবে না।' এজন্য তাঁহারা সদলবলে একেবারে কীয়েল-নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই যাত্রার যে একটি সুললিত বিবরণ শ্রীমতী সেভিয়ার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার স্বামী শ্রীমান সেভিয়ারের [Sevier] সহিত স্বামীজির সঙ্গে ড্যাসেন পরিবারে কীয়েলে [Kiel] নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন: 'আমার স্মরণে আছে কীয়েল জার্মানীর একটি শহর — বলটিক সাগরে অবস্থিত। এই সুন্দর শহরের স্মৃতি আমার নিকট উজ্জ্বলভাবে রহিয়াছে। ঐ স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পল ড্যাসেনের [Paul Deussen] সঙ্গে একদিন আমরা

বিপুল আনন্দে কাটাইয়াছি।' তাঁহার দার্শনিকতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার শক্তি ছিল অসীম ও অসাধারণ। ইউরোপীয় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল অতি উচ্চে।

স্বামীজি হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি পত্র প্রেরণ করেন যে, পরদিন প্রভাতে যেন অনুগ্রহপূর্বক স্বামীজি তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে প্রাতঃরাশে যোগদান করেন। অতি বিনয়সহকারে আমাকে ও আমার স্বামীকেও তাঁহাদের সহিত আহারে যোগদান করিতে বিশেষ অনুরোধ জানান। পরদিন প্রভাতে ঠিক দশটার সময় আমরা তাঁহার ভবনে গিয়া উপস্থিত হই। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী তামাদিগকে গ্রন্থাগার-কক্ষে লইয়া গিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। প্রাথমিক সম্ভাষণের পর তিনি আমাদের ভ্রমণ ও স্বামীজির পরবর্তী কার্যতালিকা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অনন্তর অধ্যাপক টেবিলের উপর খোলা একটি পুস্তকের পৃষ্ঠার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থবিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ করেন। জ্ঞানীসুলভ অনুসন্ধিৎসা লইয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন: 'উপনিষৎ এবং বেদান্তসূত্রে প্রতিষ্ঠিত বেদান্তদর্শনের প্রণালী মানব-জাতির সত্যসন্ধানে বিরাট প্রতিভার এক মূল্যবান অবদান। শঙ্করা-চার্যের ভাষ্যগুলি অপূর্ব মেধা ও শক্তিমান ধী, প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধির পরিচায়ক। বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল সর্বোচ্চ ও সুনির্মল নৈতিক জ্ঞানের পরিস্ফুরণ। অধ্যাপক মহাশয় আরও বলিলেন: 'আধ্যাত্মিকতার প্রাচীন উৎসমুখে পুনরায় ফিরিয়া যাইবার এক প্রচেষ্টা চলিতেছে। সে আন্দোলন ভারতবর্ষকে সকল জাতির আধ্যাত্মিক নেতা বলিয়া স্বীকার করিবে—জগতের সর্বোচ্চ ও মহত্তম প্রভাবকেন্দ্র রূপে গণ্য করিবে।'

ডঃ ড্যসেন স্বয়ং সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন হইতে যে সকল অনুবাদ করিতেছিলেন, স্বামীজি তৎপ্রতি গভীরভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিলে

কতিপয় দুর্বোধ্য ও দুরূহ বাক্যের সঠিক তাৎপর্য ও নির্ভুল অর্থ ও উদ্দেশ্য লইয়া আলোচনা শুরু হইল। স্বামীজি দেখাইলেন সংজ্ঞা বা definition-এর স্পষ্টতা মুখ্য এবং পারিপাট্য, লালিত্য বা সুন্দর প্রকাশভঙ্গি [elegance of diction] গৌণবস্তু-রূপে প্রয়োজনে আসে। এমন দৃঢ়তা ও বোধগম্যরূপে প্রাচ্য শাস্ত্রব্যাখ্যাতা [স্বামীজি] উপলব্ধির সূক্ষ্মতা বুঝাইলেন যে, জার্মান বিজ্ঞপ্রবর [অধ্যাপক ড্যসেন] অবিলম্বে উহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। স্বামীজি এইভাবে তাঁহার হৃদয় জয় করিলেন।

স্বামীজির প্রগতি-ভাবনা

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামীজির বিস্ময়কর প্রতিভা তাঁর বাণী ও রচনার পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে। দীর্ঘ ৭০ বছর পরেও তাঁর তারুণ্য ও আধুনিকত্ব ম্লান হয়নি একটুও। বরঞ্চ বলা যায়, বেড়েছে। বর্তমান বিশ্বসমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিতও বিস্তর রয়েছে তার মধ্যে ; অবশ্য নিজের বুদ্ধির আলোকেই আধুনিক মানুষকে তার মধ্য থেকে বাছাই করে নিতে হবে। হাতে-কলমে তা কার্যকরী করার নৈপুণ্য বা প্রয়োগ-কৌশলও তারই উপর নির্ভর করছে। স্বামীজি তাঁর সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যুজ্জ্বল জীবনকালের মধ্যে মূলতঃ দিগ্‌দর্শনই দিয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর বহু বস্তুনিষ্ঠ ভাবনার মধ্যে প্রগতি-ভাবনা এত স্বচ্ছ ও সুসমঞ্জস যে, এর তুলনা পাওয়া ভার। 'বাস্তব বেদান্তবাদের' [Practical Vedantism] চেয়ে এর গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। একদিক থেকে বলতে গেলে, বাস্তব বেদান্তবাদ এর অংশমাত্র।

সারা পৃথিবীর মানুষকে নিয়ে তাঁর প্রগতি-ভাবনা। খুব সহজভাবেই প্রগতির সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন ; কিন্তু তার বিস্তার প্রায় মহাজাগতিক করে তোলা যায়। তিনি বলছেন, প্রগতির অর্থ হ'ল এক কথায়—প্রকৃতিকে বশীভূত বা জয় করা। এখন প্রকৃতি বলতে, পাশ্চাত্ত্য-মণ্ডলের আধুনিক বিজ্ঞান-গর্বীরা শুধু বহিঃপ্রকৃতি বা বিশ্বপ্রতিকেই সচরাচর বুঝে থাকেন। এরূপ ধরে নেওয়া ভুল নয় ; কিন্তু ইহা আংশিক সত্যমাত্র এবং নিঃসন্দেহে খণ্ডিত দৃষ্টির পরিচায়ক। বর্তমান পৃথিবীর বহু সমস্যার মৌল কারণও এই খণ্ডিত দৃষ্টি। সমাধান যে হচ্ছে না, সমস্যা যে বেড়েই চলেছে—তারও কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি। বহুকাল পূর্বে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট নাকি বলেছিলেন,

তিনি দুটি বিষয়ের কোনো সীমা খুঁজে পান না—একটি হ'ল মাথার ওপরের আকাশের, আর একটি হ'ল মানুষের হৃদয়ের। এর থেকে বোঝা যায়, তাঁরও সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল; বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতিকে একই সঙ্গে অনুধাবন করার মানসিক কাঠামো তাঁরও ছিল। কিন্তু স্বামীজির বাণীতে যে নিঃসংশয় সমাধানের আশ্বাস আছে, তা কাণ্টের পূর্বোক্ত কথায় ছিল না, এমনই আমাদের মনে হয়।

এখন দেখা যাক, স্বামীজির প্রগতি-ভাবনার সার্বিক স্বরূপটি [Integral character] কী? প্রগতি বলতে তো প্রকৃতিকে জয় করা বোঝায়। এখন, প্রকৃতি বলতে কী বোঝায়? তিনি নিঃসন্দিগ্ধ ভাষায় বলছেন, প্রকৃতি বলতে মূলতঃ দুটি বিষয় বোঝায়—(১) মানুষের বাইবের প্রকৃতি বা বিশ্বপ্রকৃতি এবং (২) তার অন্তঃ-প্রকৃতি। বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করার প্রয়াস মানবসভ্যতার সূত্রপাত থেকেই শুরু হয়েছে। নিছক বেঁচে থাকার তাগিদেই প্রথম এর উদ্ভব; কিন্তু মানবের জিজ্ঞাসা ও জিগীষায় এব অভূতপূর্ব বিস্তার হয়েছে গত দুই শতাব্দীতে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা [Science and Technology] এবং শিল্পবিপ্লব এরই বিকাশ মানব-প্রগতিতে এদের অনন্য অবদান অনস্বীকার্য। পশ্চিমী দেশ-গুলোর অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি এবং সারা পৃথিবী জুড়ে গত দুশো বছর ধরে খবরদারি করবার শক্তির মূল উৎসও এতেই নিহিত। সুতরাং স্বামীজির অকুণ্ঠ পরামর্শ হ'ল, ভারত ও অন্যান্য দেশ যারা এই বস্তু-বিজ্ঞান ও যান্ত্রিকবিদ্যায় অনুন্নত, তারা এই বিষয়গুলোতে উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোর কাছ থেকে এইসব শিখে নিক। না হ'লে বহুযুগসঞ্চিত 'তামসিকতা' [যাকে এখনও ভারতে অনেকে 'সাত্ত্বিকতা' বলে ভুল করেন] কোনোকালেই ঘুচবে না।

কিন্তু সমৃদ্ধ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলো সম্বন্ধেও তাঁর সুপারিশ আছে। তারা বিশ্বপ্রকৃতিকে ক্রমাগতই জয় করে চলেছে; কিন্তু অন্তঃ-

প্রকৃতিকে [যেখানে লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, ভয় ইত্যাদি অহরহ ক্রিয়া করে চলেছে] বিশেষ জয় করতে পেরেছে এমন তো মনে হয় না। তারই ফলশ্রুতি দেখা গেছে পরবর্তীকালে দুটি বিশ্বযুদ্ধে, পারমাণবিক অস্ত্রনিক্ষেপে, কোরিয়ার যুদ্ধে, ভিয়েতনাম সংগ্রামে ও অগণিত ছোট-বড় আন্তর্জাতিক সংঘাতে। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সমৃদ্ধ দেশগুলোতে যেখানে মাথাপিছু আয় অত্যুচ্চ এবং ভোগ্য-পণ্যের অভাব নেই, সেখানে আত্মহত্যা এবং অপঘাতমৃত্যু ও মানসিক অশান্তি বেড়েই চলেছে। আন্তর-প্রকৃতিকে জয় করার অক্ষমতাই এদের জননী।

সুতরাং সামগ্রিক বিচারে এবং স্বামীজির প্রগতি সংজ্ঞার নিরিখে পাশ্চাত্ত্য উন্নত দেশগুলোও যথার্থ প্রগতি লাভ করেনি। তারা প্রগতির আধখানা মাত্র পেয়েছে, আর আধখানা পায়নি। না পাওয়ার কারণ মানবের আন্তর-প্রকৃতিকে স্ব-বশে আনয়নের অক্ষমতা ; স্বামীজি সুস্পষ্ট বলছেন এখানে, সমগ্র পৃথিবীকে ভারতের কাছ থেকে শিখতে হবে মানবপ্রকৃতিকে জয় করার কৌশল। এটিও বিজ্ঞান, তবে বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করার কৌশল বিজ্ঞানের চাইতেও গভীরতর ও দুরূহতর। এরই নাম যোগ। নিজপ্রকৃতিকে জয় করার চেয়ে বেশী কঠিন কিছু নেই মানুষের পক্ষে। এ জন্যই শাস্ত্র বলছেন, নিজেকে জানো ['আত্মানং বিদ্ধি'], যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায় তাঁকে জানো, ইত্যাদি।

তাহলে স্বামীজির মাপকাঠি অনুযায়ী বর্তমানে কোনো দেশই সত্যিকার প্রগতি অর্জন করে উঠতে পারেনি। পারবে তখনই, যখন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি উভয়কে জয় করার প্রয়াস যুগপৎ চলতে থাকবে। আপাততঃ আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের জন্য এবং মানুষের আত্মঘাতী সংগ্রামের শান্তিপূর্ণ নিরসনের জন্য পাশ্চাত্ত্য সমৃদ্ধ দেশগুলো তাদের আন্তর-প্রকৃতি অনুসন্ধান ও জয় করার ওপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করুক। আর, ভারত প্রমুখ অসচ্ছল দেশগুলো বিশ্বপ্রকৃতিকে জয়

করার নেশায় মেতে উঠুক, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠুক। কিন্তু সব সময়েই মনে রাখতে হবে, কোনো ক্ষেত্রেই অপর প্রকৃতিটিকে যেন কোনোক্রমে অবহেলা না করা হয়। বস্তুবিজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞান উভয়ের উন্নতি নিয়ে মানবপ্রগতি। স্বামীজি তাই উভয়েরই যুগপৎ উন্নয়ন চেয়েছিলেন।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর শিল্পদর্শন সম্পর্কে ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। সেই ঔৎসুক্যপ্রণোদিত হয়ে আমরা এই নিবন্ধের অবতারণা করছি। স্বামীজি নির্বিকল্পসমাধি আশ্রয় ক'রে রূপহীন, নিরাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-অতিক্রমী এক অনন্ত ছায়ালোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন; সাধনালব্ধ ঐশীশক্তির প্রসাদে কালান্তরের চিত্র তাঁর মানসনেত্রের সম্মুখে নিত্য সমুদ্ভাসিত ছিল। মহাকালের লীলা তাঁর চক্ষে পরম-অর্থে অর্থবান নয়। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের দৃশ্যাবলী অবলোকন করেছেন আপন যোগজ দৃষ্টির সহায়তায়। তাঁর বাল্য-বন্ধুকে তিনি সে-কথা বলেছেন, আমরা তা শ্রবণ করেছি। সুন্দর, কালধৃত; যে সুন্দর শিল্প বা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে তাকে সাধারণ-ভাবে কালজয়ী বললেও তা পরিপূর্ণরূপে কালকে অতিক্রম করতে পারে না, কেননা, সুন্দর 'বিশেষ'কে আশ্রয় করে; বিশেষ কালের দ্বারা 'বিশেষ'-রূপে চিহ্নিত। শিল্পের উপজীব্য হ'ল সামান্য নয়, বিশেষ মাত্র। তিনি বিশেষকে উত্তীর্ণ হয়ে নির্নিমেষের মধ্যে পরম আনন্দে অবগাহন করেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেই পরমসত্তার সাযুজ্য এবং সামীপ্য লাভ করেছেন, যেখানে সব বিশেষ তার চরিত্র হারিয়ে নির্বিশেষ হয়েছে। পরম কবি যিনি, তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছেন স্বামীজি। সুন্দরের উপাসনা হ'ল অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা; পরমসুন্দরের উপাসনা হ'ল অমৃতের তপস্যা। এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনাতেই আবার ঐ পরমসুন্দরের উপাসনার জন্য আসন পাতা হয়। এই পরমসুন্দরই হলেন কবি এবং সকল মানসকর্মের নিয়ন্তা। ঈশোপনিষদে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

'স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ
সমাভ্যঃ।"

'—তিনি চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন। তিনি উজ্জ্বল দেহশূন্য ব্রণশূন্য স্নায়ুশূন্য পবিত্র ও নিষ্পাপ; তিনি কবি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভু ; তিনিই চিরকাল যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন।' এই 'কবির্মনীষী'ই প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের ধারক ও সৃজক। তাঁকে পেলে, তাঁকে লাভ করলে সকল সৌন্দর্যের মূলীভূত কারণকে পাওয়া যায়। এই পরমসুন্দরকে স্বামীজি পেয়েছিলেন ; তাই তিনি প্রকৃতির রহস্যও জ্ঞাত হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের ধ্যানে 'দৈবী প্রকৃতি'র চিন্তা করেছিলেন ; তাই তো তিনি অমৃতত্ব লাভ করেছেন। 'দৈবী প্রকৃতি'-র চিন্তনে এবং অনুধ্যানে অমৃতত্ব লাভের কথা ঈশোপনিষদে কথিত হয়েছে। পরমপুরুষের সামীপ্য এবং সাযুজ্য লাভ ঘটলে ভোজ্য এবং ভোক্তা এরা একাত্ম হয়ে যায়। ভোক্তার আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। প্রকৃতির সৌন্দর্য-ঐশ্বর্য ঐ পরমপুরুষকে আবৃত করে রাখে। সুন্দরের আবরণের অন্তরালে পরমসুন্দর আত্মগোপন করে থাকে। তাই তো সুন্দরের পূজারী পরমভক্ত ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে বলে :—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥
…তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" ॥ । ঈশোপনিষৎ, ১৫, ১৬ ।

—'হে সূর্য, হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ। সত্যধর্ম আমি যাহাতে দেখিতে পারি এইজন্য আবরণ অপসারিত কর। আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ দেখিতেছি—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমি-ই'। রসিকসুজন রূপের মধ্যেই পরম রূপকারকে আবিষ্কার করেন। তাঁহার আবিষ্কারে তদ্দর্শনে সকল রূপের ইতি হয়। ভোক্তা পরমবিস্ময়ে ঐ পরম রূপকার এবং

আপনার মধ্যে একাত্মতা উপলব্ধি করে। নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার দ্বৈতভাব দূরীভূত হয়। দুই যে একের মধ্যেই বিধৃত আছে, সেই পরমজ্ঞানের সন্ধানটুকু রূপপিপাসু লাভ করে। তার মধ্যেই তার সকল রূপতৃষ্ণার সমাধি ঘটে। তার দেবদর্শন হয় এবং একই সাথে তার আত্ম-দর্শনও সংঘটিত হয়। ফরাসী দার্শনিক ব্রেমো বলেছিলেন, ভক্ত এবং রূপপূজারী সমগোত্রীয়। বহুদূর পর্যন্ত তাদের একত্র অভিসার। তারপরে ভক্ত ভগবানের দিকে ফেরে আর শিল্পী পরমসুন্দরের সান্নিধ্যলাভ করে। স্বামীজি বললেন যে সুন্দরের উপাসক এবং ভক্ত একই পথের পথিক। সুন্দরের উপাসক সুন্দরের মধ্যে যেমন পরম-সুন্দরকে দেখতে পান তাঁর সাধনার প্রান্তিক সীমায়, ঠিক তেমনি করে তাঁর আত্মসাক্ষাৎকারও ঘটে, কেননা আত্মাই তো ব্রহ্ম।

এই আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পেতে হলে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের পথে তা পাওয়া যায়। এই বৈরাগ্যের পথেও ব্রহ্মলাভ ঘটে। এই ব্রহ্মই তো পরমসুন্দর। স্বামীজির কথা উদ্ধৃত করি: 'একখানি চিত্র কে বেশী উপভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্রদ্রষ্টা? বিক্রেতা তাহার হিসাব-কিতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই মগ্ন। ঐ-সকল বিষয়ই তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন? তিনিই চিত্র সম্ভোগ করিতে পারেন, যাঁহার বেচা-কেনার কোনো মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন'।[১]

ছবি দেখে নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগের পথে যেমন লাভালাভের দৃষ্টিটুকু অন্তরায় হয়, ঠিক তেমনি ব্রহ্মানন্দলাভের পথে প্রধান বাধা

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৭২

হ'ল আমাদের বাসনাপঙ্কিল দৃষ্টিটুকু। নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ হ'ল ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। 'রসো বৈ স',—তিনি রসস্বরূপ। তাই তো নন্দনতাত্ত্বিক রসাস্বাদনের পথে ব্রহ্মলাভ ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। স্বামীজি সৌন্দর্য-দর্শনের রূপকল্প প্রয়োগ করলেন ব্রহ্মদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে। আবার তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই: 'এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্রস্বরূপ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই মানুষ জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকার-বোধ থাকিবে না। তখন ঋণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর চিত্রের মতো। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মতো সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই: তিনিই মহৎকবি, প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত এবং নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত। বাসনাত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ করিয়া সম্ভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে'।[২]

জীব মায়ামুক্ত হয়, বাসনা ত্যাগ করে; তার মুক্তি ঘটে এই বৈরাগ্যের পথে। স্বামীজি এই বৈরাগ্যকে নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন করে শিল্পের রস অলব্ধ থেকে যায় যদি না রসিকজনার নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যটুকু আয়ত্তে থাকে, ঠিক তেমনি আমাদের মায়াবন্ধনেরও মুক্তি ঘটে না যদি না আমরা বাসনা-বৈরাগ্যটুকু অর্জন করতে পারি। স্বামীজির পক্ষে এই উভয়বিধ বৈরাগ্যই সহজলভ্য। যিনি নির্বিকল্পসমাধির আনন্দ-হিল্লোলে অবগাহন করেছেন, তিনি নির্বিশেষ মর্ত্যলোকোত্তর অস্পষ্ট লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন আপন তপঃপ্রভাবলে, তিনি নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ বা রসের চরম উপলব্ধি লাভ করেছেন, এ কথা

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৭২

সহজেই অনুমেয়। বিশেষ হ'ল শিল্পের জগৎ; স্বামীজি যখন নির্বিশেষ লোকের আভাস পান তখন শিল্পলোক অতিক্রান্ত। আমাদের ব্যবহারিক জগৎ হ'ল নানারূপের জগৎ। শিল্পজগৎও তাই। রূপ সত্যকে আবৃতও করে, আবার তাকে ব্যঞ্জিতও করে। সত্যের ব্যঞ্জনা, তার আভাস রূপের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সত্যকে—পূর্ণ সত্যকে নন্দনতাত্ত্বিক পথে, রূপারাধনার পথে লাভ করা যায় না। রূপ অপগত না হলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে না। তাই পূর্ণ সত্যকে যে-লোকে লাভ করা যায় বা পূর্ণ সত্য হওয়া যায়, তা হ'ল অদ্বৈতের জগৎ। আর নন্দনতত্ত্বের জগৎ হ'ল দ্বৈত-আশ্রয়ী। রূপ-ভোক্তা এবং রূপ—এরা এ জগতের সমান অংশ-ভাগী। যখন এই রূপের জগৎ অতিক্রান্ত হয়, রূপরসিক পরম-রূপকে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁর আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তখন সুন্দরের জগৎ পরমসুন্দরের মধ্যে আপনার চরম-সার্থকতা খুঁজে পায়। এই পরম অভিজ্ঞতাটুকু ক্রমান্বিত। রূপের জগৎ থেকে অরূপলোকের দিকে ভক্তের অভিসার নিত্য চলে। রূপলোক-অতিক্রমণের অভিজ্ঞতা সহজলভ্য নয়। সাধারণতঃ মানুষেরা রূপ-লোকের সীমানায় আবদ্ধ। এর বাইরে যাওয়া অতীব দুরূহ। এই রূপলোককে অতিক্রম করেছিলেন স্বামীজি তাঁর অলৌকিক তপস্যার বলে আর শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায়। তার দেবদুর্লভ এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন :[৩]

'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর'॥

৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ২৬৭

পূর্ব-কথিত ঈশোপনিষদের শ্লোকে সূর্যদেবকে বলা হয়েছে তাঁর আলোক-আবরণ অপসারিত করার জন্য। সেই আলোক-আবরণ অপসারিত করলে তবেই সত্যের স্বরূপ দেখা যায়, তবেই আত্মোপলব্ধি ঘটে একথা বললেন উপনিষদের ঋষি। তাঁর সু-উচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে স্বামীজির অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এঁরা উভয়েই একই ভাবনার দ্বারা ভাবিত। স্বামীজি-দৃষ্ট এই অস্পষ্ট লোক জ্যোতিঃহারা, সূর্যবিহীন। সূর্যের আলোক-আবরণ অপসারিত হলে তবেই সত্যদর্শন ঘটে, এ কথা বললেন উপনিষদের ঋষি ; আর স্বামীজির অভিজ্ঞতায় আমরা সেই সত্যের আভাস পাই। স্বামীজি যে অবাঙ্‌মনসোগোচরমের কথা বলেছেন সেখানে সূর্য-চন্দ্র অস্তমিত, সে লোকে জ্যোতির্লেখা অলিখিত।

স্বামীজি-কথিত শিল্পমূল্য ও শিল্পব্যঞ্জিত মহামূল্যের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক জগৎ ও মানুষের চরম মুক্তির সন্ধান দেয়। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ পরমার্থিক পর্যায়কে যেমন স্বীকার করেছেন তেমনি আবার ব্যবহারিক স্তরকেও স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছেন। শিল্পের আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন তার চরম-মূল্যায়ন হলেও ব্যবহারিক সত্তার আলোকে তার মূল্যায়ন বাহুল্য নয়—একথা স্বামীজি মনেপ্রাণে আদেশ করেছেন। তাই দেখি তাঁর নানান লেখায়, বক্তৃতায় এবং আলোচনায় শিল্পের উল্লেখ। দেশ-বিদেশের শিল্প, গ্রীক শিল্প, ভারতীয় এবং এশিয়ার দেশগুলির শিল্প এবং রোমক শিল্পের উল্লেখ আমরা বহুবারই পেয়েছি। কখন কখন শিল্পের চরম আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন করেছেন তিনি। তার উল্লেখ পূর্বেই আমরা করেছি। আবার কখন বা বিশ্বপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শিল্পী বড় হয়ে উঠেছে। শিল্পকে অতিক্রম ক'রে শিল্পীর দাবিটা স্বামীজির কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি সানন্দে স্বীকৃতিটুকু দিয়েছেন। তিনি শ্রমের গুণগান করেছেন। শ্রমদানীদের প্রণাম

করেছেন।[৪] নির্বিকার নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্য তাঁর অনায়াসলভ্য ছিল ব'লে তিনি সহজেই যথার্থ শিল্পমূল্যায়নটুকু করতে পারতেন। ইউরোপীয় দেশগুলির শিল্প প্রচেষ্টার তুলনামূলক আলোচনা স্বামীজি করেছেন। আমরা সেটুকু উদ্ধৃত করে দিই: 'কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায় শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস; আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকায়, দিঙ্‌নাগ জার্মানির স্থূলহস্তাবলেপ। ...কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ জার্মানির রূপবিকাশচেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর'।[৫]

স্বামীজির পাশ্চাত্ত্য শিল্পপ্রকরণের মূল্যায়ন যে বহুলাংশে যাথার্থ্যের দাবি রাখে, একথা বিরূপ সমালোচকেরাও স্বীকার করবেন। ফরাসী শিল্পকলার সুকুমার সৌন্দর্য স্বামীজিকে আকৃষ্ট করেছিল। লুভার মিউজিয়ম দেখে তিনি গ্রীকশিল্প সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করলেন তা শিল্পরসিক মাত্রেরই অনুধাবন করা প্রয়োজন। বিদেশী শিল্পশাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্বামীজি লিখেছেন: 'মিউজিয়ম দেখে গ্রীক কলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম। প্রথম 'মিসেনি' [Mycenoean] দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক। ...এই 'মিসেনি' শিল্প প্রধানতঃ এশিয়া শিল্পের অনুকরণেই ব্যাপৃত ছিল। তারপর ৭৭৬ খৃঃ পূঃ কাল হ'তে ১৪৬ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত 'হেলেনিক' বা যথার্থ গ্রীক শিল্পের সময়।...ক্রমে এশিয়া-শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ চেষ্টা এখানকার শিল্পে জন্মে। গ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাত এই যে, গ্রীক শিল্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যাথাতথ্য জীবন্ত

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃঃ ১০৬
৫ ঐ ঐ পৃঃ ১২৬

ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছে'।[৬] তারপরে স্বামীজি 'আর্কেইক' ও ক্লাসিক গ্রীক শিল্পের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রীক শিল্পের মূল্যায়নপ্রসঙ্গে তিনি লিখলেন : 'কলাবিদ্যানিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিত লিখেছেন ; '[ক্লাসিক] গ্রীক শিল্প চরম-উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালীশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন কোনো দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা তদনুযায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ মূর্তিসমূহ যে কালে নির্মিত হইয়াছিল, কলাবিদ্যায় সমুজ্জ্বল সেই খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয় যে, বিধিনিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হইয়া উঠে'। এই 'ক্লাসিক' গ্রীক শিল্পের দুই সম্প্রদায়,—প্রথম আর্টিক, দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়েন।[৭] স্বামীজি আর্টিক শিল্পীগোষ্ঠির শিল্পকর্মে লক্ষ্য করলেন অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব ; যাহা কোনকালে মানব-মনে আপন অধিকার হারাইবে না। এছাড়াও তিনি আর্টিক শিল্পের অন্যতম প্রবৃত্তিটিকেও আবিষ্কার করেন। সেটা হ'ল শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত ক'রে কেবলমাত্র মানুষের জীবন-বিবরণে নিযুক্ত রাখা। অলৌকিক দেবমহিমা, একদিকে আর্টিক শিল্পের উপজীব্য ; অন্যপ্রান্তে মানুষ আপন মহিমায় এবং স্বরূপে শিল্পসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। আর্টিক শিল্পের এই দুটি ধারা স্বামাজিকে আকৃষ্ট করেছিল, কেননা স্বামীজি উভয়কেই পরমসত্য বলে স্বীকার করেছিলেন। মানুষের শ্রেয়বিধানের মধ্য দিয়েই তো ভগবানের সেবা করা যায়। তাই দেবভাব এবং মানব-মহিমা, স্বামীজির মতে আর্টিক শিশুকে অনন্যসাধারণ গৌরব দিয়েছিল। যিনি জীবের মধ্যে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন তিনি শিল্পে

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড , পৃঃ ১৪২—৪৩

৭ ঐ ঐ পৃঃ ১৫৩

দেবভাব এবং মানবভাব উভয়কেই স্বাগত জানাবেন, এ আর বিচিত্র কি ?

অন্যত্র জাপানী ছবি সম্বন্ধে স্বামীজি যে আলোচনা করেছেন তা কলারসিক এবং নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য। প্রশ্নকর্তা স্বামীজিকে বলছেন : 'আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হতে হবে। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, কারও নকল করবার জো নেই।'

স্বামীজি বললেন : 'ঠিক, ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic [এশিয়াবাসী]। আমাদের দেখছিস না সব গেছে, তবু যা আছে তা' অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে, আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ'। ৮ পাশ্চাত্ত্য দেশের সাধারণ মানুষের শিল্প-জীবনের সঙ্গে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শিল্পবোধের তুলনা করে স্বামীজি প্রসঙ্গান্তরে বললেন : 'কি জানিস, সাহেবদের utility [কার্যকারিতা] আমাদের art [শিল্প]। ওদের সমস্ত দ্রব্যই utility, আমাদের সর্বত্র আর্ট। এখন চাই art এবং utility-র combinatoin [সংযোগ]। গোঁড়া নন্দনতাত্ত্বিক হয়ত বলবেন যে, শিল্প এবং প্রয়োজনে এরা হ'ল পরস্পরবিরুদ্ধ। কেমন করে এদের প্রকৃতির যাথার্থ্যকে রক্ষা ক'রে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যায়, সে সম্পর্কে নানান কুটতর্কের অবতারণা হয়তো করা যেতে পারে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আর্টই ইণ্ডাস্ট্রীর প্রসার এবং ঐশ্বর্য স্বামীজির মতের সারবত্তায় আমাদের আস্থা স্থাপন করতে উৎসাহিত করে। আর এই সমন্বয় প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে জাপানে। স্বামীজি সেকথা আমাদের বলেছেন। আপাতবিরোধী নন্দনতত্ত্বাগত দু'টি আদর্শের সমন্বয় তিনি ঘটিয়ে দিয়েছেন তাঁর ঋষি-দৃষ্টির স্বচ্ছতার প্রসাদগুণে।

৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৯ম খণ্ড), পৃঃ ৪০৬

শিল্পে বাস্তবতা সম্পর্কে পণ্ডিতজন নানান ধরনের মত পোষণ করেছেন। শিল্পে প্রয়োজনের স্থান কতটুকু সে সম্বন্ধে স্বামীজির সুচিন্তিত মতের উল্লেখ আমরা করেছি। শিল্পের বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর মতামতও প্রণিধানযোগ্য। শিল্প কতটুকু বাস্তব-অনুসারী হবে, কতখানি সে বাস্তবকে অনুসরণ ক'রে তারপরে কল্পনার পাখায় ভর করবে, সে প্রশ্ন অতি দুরূহ। স্বামীজি এই দুরূহ প্রশ্নের সমাধানকল্পে শিষ্যকে বলেছেন : 'একটা ছবি আঁকলেই কি হ'ল? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent [প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ] করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে—যাদের স্কুলে লেখাপড়া হ'ল না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting [চিত্রবিদ্যা] শিখতে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা perfect drama [সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক] লেখা, একই কথা।'[৯] এই মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামীজি বললেন : 'শিল্পের বিষয়বস্তুর মুখ্যভাবটুকু শিল্পকর্মের মধ্য থেকে ফুটে বেরুনো চাই। শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর রূপায়ণে ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য-স্থৈর্যও চাই।' ভারতীয় ঐতিহাসিক শিল্পকর্মে স্বামীজি এই দু'টি গুণই প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতীয় শিল্প আপন গৌরবে ভাস্বর, কেননা এই দু'টি গুণই ভারতীয় শিল্পে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করেছে। তিনি অন্যত্র ভারতীয় নাটক এবং গ্রীক নাটকের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় নাটকের উক্ত দু'টি প্রসাদগুণই বরমাল্য দিয়েছে। তৎকালে প্রচলিত গ্রীক নাটকের দ্বারা ভারতীয় নাটকের প্রভাবিত হওয়ার কথাকে স্বামীজি অস্বীকার করেছেন। বিদ্বজ্জনসুলভ জ্ঞানের

৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), পৃঃ ৪১৪

আনুকূল্যে সূক্ষ্ম তর্কজালের বিস্তার ক'রে তিনি বললেন: 'আর্যনাটকের সাদৃশ্য গ্রীক নাটকে আদৌ তো নাই, বরং শেকস্‌পীয়র প্রণীত নাটকের সহিত ভুরি ভুরি সৌসাদৃশ্য আছে।'

শুধু নাটক কেন, আর্যভাস্কর্যেও গ্রীক প্রভাব তিনি অঙ্গীকার করলেন। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্ত্য শিল্পশাস্ত্রে স্বামীজির ব্যুৎপত্তি সন্দেহাতীত। বিশেষজ্ঞের সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম মননধর্ম স্বামীজির সকল আলোচনার বিষয়বস্তুর উপর অলোকসামান্য আলোকপাত করেছে, একথা নির্বিচারে বলা যায়। বিলাতী সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বামী শিব্যানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বললেন: 'বিলাতী সঙ্গীত খুব ভাল, harmony-র চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটেই নেই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতাম। সকল art-এরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার অন্ধি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না।'[১০]

বিলাতী সঙ্গীতের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে স্বামীজি শিল্পে অধিকারবাদের নীতিকে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এই অধিকার কুলগত নয়, এ অধিকার অর্জন-সাপেক্ষ।

পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে স্বামীজির আসক্তি জন্মেছিল ধীরে ধীরে, একথা স্বামীজির স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের পূর্ণ রূপ—সে রূপ দর্শন করা অভ্যাস ও আয়াস-সাধ্য। হার্মনি-প্রধান পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত স্বামীজিকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত করুণরস এবং বীররস, এই উভয়বিধ রসের প্রাধান্য লক্ষ্য ক'রে

---

১০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), পৃ: ৩৭৮-৭৯

বললেন যে, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে harmony'র অভাব ; আর এই অভাবটুকুর জন্য বীররসের প্রাধান্য বড় একটা ভারতীয় সঙ্গীতে দেখা যায় না। বীররস স্বামীজির মতো হার্মনি-আশ্রয়ী। 'সকল রাগই martial হয়, যদি harmony-তে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজানো যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি হয়।' মুসলমান বিজয়ের পরে এ-দেশে টপ্পা গানের বিশুদ্ধতা আর রইল না ব'লে স্বামীজি আক্ষেপ করেছেন। এ-দেশে এসে মুসলমান ওস্তাদেরা রাগ-রাগিণীগুলিকে আত্মস্থ করলেন ; এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা টপ্পা গানের রীতির উপরে আপনাদের মুন্সিয়ানা এমনভাবে প্রয়োগ করলেন যে, টপ্পা গানের নিজস্ব প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে গেল। স্বামীজির এই মত সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকলেও একথা বলা যায় যে, তাঁর শিল্পদৃষ্টি শিল্পের নিগূঢ় তত্ত্বাবলীর অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ করেছে। তাঁর কথা উদ্ধৃত করি : 'তোরা এটা বুঝতে পারিস না যে, একটা সুরের ওপর আর একটা সুর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সঙ্গীত-মাধুর্য [music] কিছুই থাকে না, উল্টে discordance [বে-সুর] জন্মায়। সাতটা পর্দার permutation, combination [পরিবর্তন ও সংযোগ] নিয়ে এক-একটা রাগ-রাগিণীর হয় তো ? এখন টপ্পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি করলে আবার তার ওপর গলায় জোয়ারী বলালে কি ক'রে আর তার রাগত্ব থাকবে ? আর টোকরা তানের এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব-ভাবটা তো একেবারে যায়। তবে আমাদের সঙ্গীতে cadence [মীড়-মূর্ছনা] বড় উৎকৃষ্ট জিনিস। ফরাসীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের music-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা ইওরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে।'[১১] উপরি-উদ্ধৃত উক্তি থেকে সঙ্গীত তথা শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজির আর

১১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (নবম খণ্ড), পৃঃ ৩৯৯-৪০০

একটি মত আমরা আবিষ্কার করতে পারি। তাঁর মতে সঙ্গীতের কবিত্বভাবটাকে বিসর্জন দিলে শিল্পের মূল্যখানি ঘটে। অর্থাৎ সঙ্গীত শুধুমাত্র সুরের বা রাগ-রাগিণীর খেলা নয়। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ দিয়ে যেন শিল্পের মূল্যায়ন না করা হয়। সুর একটা ভাব বহন করে; সেই ভাবটি সঙ্গীতের শিল্পমূল্য কতকাংশে নির্ধারিত করে। রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।' স্বামীজি ইঙ্গিত করবেন যে, 'শুধু সুর দিয়ে যেন কানকে আমরা না ভোলাই। মন ভোলাবার জন্য যেন কবিত্ব ভাবটিও অক্ষত এবং পূর্ণ থাকে।' শিল্পের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে এই তত্ত্বকে রূপ এবং ভাব [form and coutent]—এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ তত্ত্ব হিসেবে দেখা হয়েছে। শিল্পে রূপ বা ফার্মের প্রাধান্য হবে, না ভাব বা কণ্টেণ্টের প্রাধান্য ঘটবে?—এ অতি জটিল প্রশ্ন। স্বামীজির মত হ'ল, আরিস্ততলীয় মধ্যপন্থা-আশ্রয়ী। সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী এবং তার কবিত্বভাব, এর উভয়ই প্রয়োজনীয়। সঙ্গীতকে পূর্ণাঙ্গ শিল্প হতে হলে, এই রাগ-রাগিণী এবং কবিত্বভাবকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে স্বামীজির এই মত সর্বশাস্ত্র-অনুমোদনসম্মত।

স্বামীজির সঙ্গীতবিজ্ঞানে পারঙ্গমতার কথা বহুজনবিদিত। আমাদের সঙ্গীতে হার্মনির অভাব যেমন তাঁকে পীড়া দিয়েছে, ঠিক তেমনি ওদেশের কাব্যে অমিত্রাক্ষরছন্দের আধিক্য তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি বললেন: 'শুধু ছন্দের মিল ঘটানো কিছু নয়। ছন্দের মিলই সর্বাপেক্ষা উন্নত রুচির বস্তু নয়।' এ ঘোষণা তিনি করলেন স্যানফ্র্যান্সিস্কো শহরে অবস্থিত ওয়েণ্ড সভাগৃহে। তাঁর কণ্ঠে সেদিন বিষাদের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ভারতের শিল্পকে, তার শিল্প-দর্শনকে তিনি আবার ফিরে পেতে চাইলেন। তিনি বললেন: 'বর্তমান ভারতবর্ষকে, তার ব্যক্তি এবং ব্যষ্টিজীবনকে শিল্প-আশ্রয়ী হ'তে হবে। আর সেই দিকে সে কতখানি অগ্রসর হতে পারবে তার উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।' সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে সেদিন

এই কথাই ধ্বনিত হল : ভারতবর্ষে বহুযুগ পূর্বে সঙ্গীত পূর্ণ সপ্ত-সুরে এমন কি, অর্ধ ও চতুর্থাংশ সুরে বিকশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ অতীতে সঙ্গীতে, নাটকে ও ভাস্কর্যে অগ্রণী ছিল। বর্তমানে যাহা কিছু করা হইতেছে, সবই অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের প্রয়োজন কত অল্প—এই প্রশ্নের উপরই বর্তমান ভারতের সব কিছু নির্ভর করে।'[১২]

নব্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তার সৃষ্টিধর্মী শিল্প-প্রচেষ্টার স্পর্শধন্য হ'য়ে স্বামীজির কল্পিত মূর্তি রূপ পরিগ্রহ করুক। তাঁর আবির্ভাব শতবর্ষ-পূর্তি দেশের শিল্পীদের এই মহান দায়িত্বপালনে প্রণোদিত করুক. আমাদের এইটুকু প্রার্থনা।

———

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড), পৃঃ ৪২৫.